গৃহ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

শেফালী নন্দী



ওরিয়েন্ট লংম্যান

গৃহ বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[নবম শ্রেণী]

শেফালী নন্দী, বি এ (অনার্স),
ডিপ্লোম-ইন-ডোমেস্টিক সায়েন্স এণ্ড ডায়েটেটিক্স,
পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, হোম সায়েন্স,
শিক্ষিকা : বালী বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয়

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫০ সুন্দর নগর, নয়াদিল্লী ৩
আঞ্চলিক অফিস :
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ১
১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩
৩৬এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ ২
৩।৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭১

মুদ্রক : শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ, রিজিওন্যাল ম্যানেজার,
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ১৩

ভূমিকা

গৃহ-বিজ্ঞান ছাত্রীদের গৃহ-পরিচালনা শিক্ষা দেয়। গৃহজীবনে এই শিক্ষা পাইলে তাহারা সংসারের সকল সম্পদ সঠিক ব্যবহার করিয়া গৃহিণীপদবাচ্য হইতে এবং পরিবারের কাম্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিতে পারে, খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় গৃহবিন্যাস প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার সহিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে পারে। ফলে গৃহে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিরাজ করে। গৃহ-বিজ্ঞান শিশুপালন ও শিশু-মনস্তত্ত্ব শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মেয়েরা সুস্থ সবল শিশু গড়িয়া তুলিতে পারে। তাহারাই রাষ্ট্রের সুনাগরিক হয় এবং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করে। গৃহ-বিজ্ঞান নারীজাতির মনকে গৃহমুখী করে ; সকলের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে এবং গৃহ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হইতে শিক্ষা দেয়। তাই এই শিক্ষা পাইলে সুখী পরিবার ও উন্নত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহারা অগ্রণী হইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার গৃহকর্ম, যেমন—রন্ধন, পোশাক প্রস্তুত, রোগীর সেবা প্রভৃতি সঠিক পদ্ধতিতে করিতে শিক্ষালাভ করে বলিয়া জীবনযাত্রা সহজ ও সরল হয়। সময় ও অর্থের ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে হয়, অবসর সময় কত ভালভাবে যাপন করা যায়, তাহাও গৃহ-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সদভ্যাস গঠন ও বদ অভ্যাস ত্যাগের উপায়গুলিও ছাত্রীদের জানিতে হয়। ইহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, জীবন আনন্দময় হয়।

এই শিক্ষা কেবল গৃহজীবনকেই সুন্দর করিয়া তুলে না, জাতীয় জীবনেরও উন্নতির সূচনা করে।

সূচীপত্র

নবম শ্রেণী

প্রথম পত্র—বিভাগ 'ক' (Group 'A')

প্রথম পত্র—বিভাগ 'খ' (Group 'B')

দ্বিতীয় পত্র—বিভাগ 'ক' (Group 'A')

দ্বিতীয় পত্র—বিভাগ 'খ' (Group 'B')

গৃহ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

(Hygiene)

গ্রীসদেশে স্বাস্থ্যের দেবীকে বলা হয় 'Hygiene'। তাহা হইতে ইংরেজীতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নাম হইয়াছে 'Hygiene'; বাংলায় ইহাকে আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলি।

সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষমভাবে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিবার নিয়মাবলী লইয়া যে-বিজ্ঞান আলোচনা করে, তাহাকেই বলা হয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং তাহার তত্ত্বকে বলা যায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

ইংরেজি Health কথাটির শব্দগত অর্থ অবশ্য পরিপূর্ণতা (fullness)। স্বাস্থ্যবান হওয়ার অর্থ পূর্ণতা লাভ করা। শারীরিক পূর্ণতা বলিতে বোঝায় দেহযন্ত্রগুলির পরিপূর্ণ সক্রিয়তা, দেহের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ কর্মতৎপরতা, শারীরিক সুস্থতা ও জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সবল সাহসী জীবন।

স্বাস্থ্যতত্ত্বের দুইটি অংশ :—১। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব (personal hygiene), ২। সমাজ-স্বাস্থ্যতত্ত্ব (community hygiene)।

(১) **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব**—একজন ব্যক্তি কেমন করিয়া পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে সেই তত্ত্ব পরিবেশন করাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিষয়বস্তু। ইহার এলাকাভুক্ত হইল ব্যক্তির পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য, শ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, সদভ্যাস ইত্যাদি।

(২) **সমাজ-স্বাস্থ্যতত্ত্ব**—গোষ্ঠী বা সমাজের সকল মানুষ কেমন করিয়া সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে সেই তত্ত্ব পরিবেশন করাই সমাজ-স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিষয়বস্তু। সমাজ স্বাস্থ্যতত্ত্বের আওতায় পড়িবে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও অনাময় ব্যবস্থা। তাই সমাজ-স্বাস্থ্যের আলোচ্য বিষয় হইল—জল, বায়ু, মাটির পরিচ্ছন্নতা, রোগ সংক্রমণ ও নিবারণের উপায়, খাদ্য ও পানীয় বণ্টন-কেন্দ্রগুলির অনাময় ব্যবস্থা, মহামারীর কারণ ও নিবারণ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ও সমাজ-স্বাস্থ্যতত্ত্ব—উভয়ই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ

দেহের বিভিন্ন অংশ	স্বাস্থ্যের লক্ষণ	অস্বাস্থ্যের লক্ষণ
১। চুল	পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মসৃণ।	রুক্ষ, অনুজ্জ্বল, মরা-মাসপূর্ণ।
২। চোখ	পরিষ্কার, পিঁচুটি বা স্রাবমুক্ত স্বচ্ছ এবং চশমাহীন।	ফোলা, পিঁচুটিপূর্ণ অস্বচ্ছ, রক্তাভ অথবা হরিদ্রাভ।
৩। চর্ম	পরিষ্কার, মসৃণ, টানটান, অক্ষত।	লালচে, ফুসকুড়ি ও ক্ষতযুক্ত।
৪। নাক	সর্দি ও শ্লেষ্মাহীন, পরিচ্ছন্ন, বাধামুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।	সর্দিপূর্ণ, অপরিষ্কার, বাধাযুক্ত শ্বাস।
৫। মুখগহ্বর ও ওষ্ঠাধর :	মসৃণ, রক্তাভ (গোলাপী) সুসিক্ত, অকুঞ্চিত, সহজ ও স্বাভাবিক মুখভাব।	বিবর্ণ ওষ্ঠাধর, শুষ্ক মুখগহ্বর, ক্ষতযুক্ত জিহ্বা, দন্তক্ষত, মাড়িফোলা, সামান্য চাপে মাড়ি হইতে রক্তপাত ও ব্যথা ইত্যাদি।
দাঁত ও মাড়ি	দন্ত ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্র, দৃঢ়, অক্ষত ও সমান ; মাড়ি লালচে, মসৃণ ও অক্ষত।	
৬। গলা	পরিষ্কার, সিক্ত, বেদনাহীন, সুস্থ, টনসিলমুক্ত।	সাদা দাগযুক্ত, অধিক লাল এবং ফোলা টনসিলযুক্ত।
৭। হস্ত	চেটো পরিষ্কার ও মসৃণ, নখগুলি উজ্জ্বল, রক্তাভ শুভ্র এবং পরিষ্কার।	চেটো রুক্ষ ও খসখসে ; অস্বাস্থ্যকর ও বড় অপরিষ্কার নখ।
৮। পদযুগল	পাতা দুইটি সুগঠিত, সমভাবে মাটিতে পড়ে, কোনরূপ ক্ষত বা বেদনাহীন।	ফোলা, ক্ষতযুক্ত, মাটিতে ঠিকমত না পড়ার জন্য চলা-ফেরার দোষযুক্ত ভঙ্গী।

দেহের বিভিন্ন অংশ	স্বাস্থ্যের লক্ষণ	অস্বাস্থ্যের লক্ষণ
৯। দেহ ভঙ্গী	ঋজু ও দৃঢ়, উন্নত গ্রীবা, দুই স্কন্ধ সমান, বাহু দুইটি সহজ ভঙ্গীতে দুই পার্শ্বে লম্বমান। উদর চর্বিহীন, পদযুগল সমান ও সমান্তরালভাবে দেহভার বহন করে।	কুব্জ পৃষ্ঠদেশ, বিশাল উদর, অসম স্কন্ধ, বাঁকা পদযুগল, অস্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যহীন ভঙ্গী।
১০। যৌন অঙ্গ	পরিষ্কার, স্রাবমুক্ত, অক্ষত, বেদনাহীন এবং অভ্যন্তর গোলাপী।	ক্ষতযুক্ত, অত্যধিক রক্তবর্ণ, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং স্রাবযুক্ত।
১১। হৃৎপিণ্ড	নিয়মিত—নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৬০ হইতে ৮০।	অনিয়মিত—কখনও দ্রুত, কখনও ধীর।
১২। ফুসফুস	নিয়মিত—নিশ্বাসের গতি প্রতি মিনিটে ১৮ হইতে ২৫ বার।	অনিয়মিত—কাসির সহিত গয়ের উঠা।
১৩। উদর	নমনীয়, নীচু, ব্যথা-বেদনাহীন।	শক্ত, বায়ুদোষযুক্ত, বেদনাপূর্ণ।
১৪। ক্ষুধা	নিয়মিত, স্বাভাবিক।	অক্ষুধা।
১৫। নিদ্রা	গভীর, শান্ত, বাধাহীন।	অনিদ্রা, বাধাযুক্ত নিদ্রা।
১৬। মলমূত্র	কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং নিয়মিত মূত্রত্যাগ।	কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা পেটের অসুখ; অনিয়মিত মূত্রত্যাগ।
১৭। দেহের তাপ	৯৭°F হইতে ৯৮·৪°F মধ্যে।	৯৮·৪°F অপেক্ষা অধিক অথবা ৯৭°F অপেক্ষা কম।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি স্বাস্থ্যবান হইতে গেলে শারীরিক পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। শারীরিক পূর্ণতার প্রধান লক্ষণগুলি হইল—

(১) দেহগঠন সম্পূর্ণ হইবে। দেহের কোন অঙ্গের বা কোন স্থানের কোন ত্রুটি থাকিবে না। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পেশী সৌষ্ঠবপূর্ণ হইবে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি অতি রোগা বা অতি মোটা হয় না। শরীরের ওজনের সহিত দৈর্ঘ্যের একটা সামঞ্জস্য থাকে। দেহ মজবুত হয়, হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির একটা সাবলীল ও সহজ ভঙ্গী থাকে এবং সমগ্র চেহারার ভিতর দিয়া স্বাস্থ্যের শ্রী ফুটিয়া উঠে।

(২) স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি নীরোগ হইবে। তাহাকে সহজে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারিবে না। রোগ হইলেও অতি দ্রুত রোগমুক্ত হইবার ক্ষমতা থাকিবে। ভিতরে রোগ থাকিলে কোন ব্যক্তি কখনই স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারে না। শরীরের ভিতর দেহযন্ত্রগুলির গঠনগত অথবা প্রক্রিয়াগত (structural or functional) কোন ত্রুটি থাকিলে তবেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। অতএব, নীরোগ হওয়া স্বাস্থ্যের একটি প্রধান শর্ত।

(৩) বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো দেহাভ্যন্তরের প্রতিটি যন্ত্রও সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম হওয়া প্রয়োজন। দেহযন্ত্রগুলি ত্রুটিপূর্ণ হইলে শারীরিক পূর্ণতায় ফাঁক থাকিয়া যায়। আবার যদি উহারা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, তাহা হইলে শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগের প্রবণতা বাড়িয়া যায়। এই কারণে দেহের বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, পেশী ইত্যাদি যেমন সুস্থ সুগঠিত হওয়া প্রয়োজন, দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি-গুলির গঠন এবং কর্মতৎপরতাও তেমনি ত্রুটিহীন হওয়া আবশ্যক। ইহার কোনটির ত্রুটি থাকিলেই শারীরিক সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হইবে।

(৪) স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির শারীরিক বৃদ্ধি বয়সের সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রসর হয় এবং এই বৃদ্ধি একটি নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। বয়স অনুযায়ী তাহার অস্থি, পেশী, রক্ত, মেদ, মজ্জা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। মানুষ দৈর্ঘ্যে যেমন বাড়ে, ওজনেও তেমনই বাড়ে। বৃদ্ধির গতি হইতেই বোঝা যায় দেহযন্ত্রগুলি ত্রুটিহীন এবং সুস্থ, সতেজ ও কর্মক্ষম কিনা।

(৫) সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি জীবনী-শক্তিতে পরিপূর্ণ। সে সহজে ক্লান্ত হয় না, অফুরন্ত কর্মশক্তি আর উৎসাহ লইয়া সে সকল কার্যে অগ্রসর হয়। সুস্থ শরীরে ক্ষুধার অভাব হয় না। তাহার পরিশ্রম করিতে যেমন ক্লান্তি আসে না, তেমনি শুইবামাত্র সে নিদ্রায় মগ্ন হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য বা অরুচিতে সে ভোগে না। তাহার দৈহিক ক্রিয়াগুলিও সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

(৬) যাহার শরীর সুস্থ তাহার মনও প্রফুল্ল থাকে। যে ব্যক্তির শরীর ভাল সে সদাপ্রফুল্ল ও সাহসী। কোন দুঃখ বা গ্লানি তাহার মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। খুশীতে ভরা মন লইয়া, অফুরন্ত সাহসের সহিত সে দীর্ঘজীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া চলে।

(৭) স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সাধারণতঃ দীর্ঘায়ু হয়। ব্যাধিই মানুষের জীবনী-শক্তি নষ্ট করে। শরীর নীরোগ হইলে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি কম হয় এবং দেহ-যন্ত্রগুলি বহুদিন পর্যন্ত সুস্থ ও সক্ষম থাকে।

(৮) শরীর সুস্থ থাকিলে মনের স্বাস্থ্যও ভাল হয়। সকল কাজে উৎসাহ থাকে। এরূপ ব্যক্তি সদাপ্রফুল্ল, দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী হইয়া থাকে।

এইগুলিই হইল ভাল স্বাস্থ্যের এবং শারীরিক সম্পূর্ণতার প্রধান লক্ষণ। ইহা একদিনে লাভ করা যায় না। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় স্বাস্থ্যও একটি সম্পদ। তাই দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও যত্ন দ্বারা এই অমূল্য সম্পদটি অর্জন করিতে হয়। অর্জন করিয়া অবহেলা করিলে উহা অকালে নষ্ট হয়। তাই স্বাস্থ্যবিধিগুলি সারাজীবন ধরিয়া পালন করিতে হয়। স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু হইল ব্যাধি। স্বাস্থ্যবিধিগুলি মানুষকে রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করে। রোগের প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং প্রথমেই শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। তারপর রোগজীবাণু, তাহাদের প্রসার ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

অনুশীলনী

E. ১৯৬১ (১) 'গৃহকর্ত্রীই পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী'—এই উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

সংকেত: গৃহিণীর হস্তেই গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব থাকে। এইজন্য গৃহিণী পরিবারের জন্য সুষম খাদ্য, পরিমিত শ্রম ও বিশ্রাম এবং গৃহের পরিচ্ছন্নতা বিধানের ব্যবস্থা

করিবেন। কারণ ঐ জিনিসগুলির উপরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে। [কি ভাবে এই কাজ গৃহিণী করিবেন তাহাও আলোচনা করিতে হইবে।]

E. ১৯৬০ (১) 'কেবল নীরোগ হইলেই কাহাকেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায় না'— স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে কোন্ কোন্ জিনিস প্রয়োজন তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

সংকেত: নীরোগ হওয়া নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, কিন্তু ইহাই সু-স্বাস্থ্যের একমাত্র শর্ত নহে। [স্বাস্থ্যের অন্যান্য লক্ষণগুলি আলোচনা করিতে হইবে।]

E. ১৯৬২ (১) ১৯৬৬ (২) সু-স্বাস্থ্য বলিতে কি বোঝ? স্বাস্থ্যবান হইতে হইলে কোন্ কোন্ জিনিস প্রয়োজন তাহা বল।

E. ১৯৬৩ (১) কখন তুমি বলিতে পার ব্যক্তিটি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী? স্বাস্থ্যের উপর পরিচ্ছন্নতা ও নির্মল বায়ুর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

সংকেত: [স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা এবং লক্ষণগুলি লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।]

১৯৬৩ সালের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর যথাক্রমে 'পরিচ্ছন্নতা' ও 'স্বাস্থ্যের উপর বায়ুর প্রভাব' নামক অধ্যায়ের আলোচনাংশ দেখ।

E. ১৯৬৭ (৬) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—(খ) সু-স্বাস্থ্য।

উত্তরের সংকেত: [স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য
(Personal Hygiene)

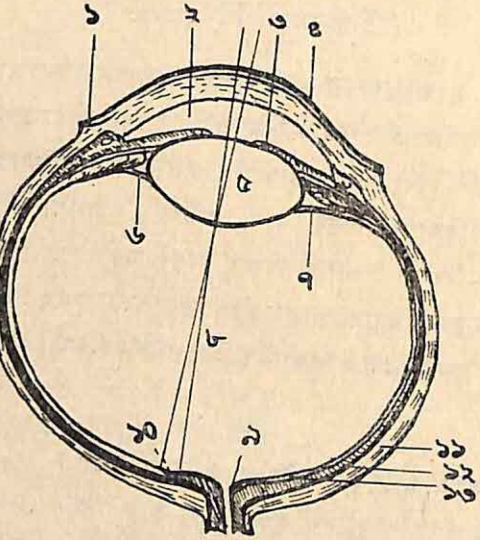
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন ও পরিচ্ছন্নতা—শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং উহাদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। পোশাক-পরিচ্ছদ, শ্রম, বিশ্রাম, আহার-বিহার ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যসম্মত সদভ্যাসগুলি গঠন এবং সর্ব বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা বিধান প্রত্যেকেরই সবিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

চক্ষু

চক্ষু দুইটি হইল মানুষের শরীরের জানালা স্বরূপ। এই জানালাপথেই বাহিরের রূপময় জগৎ আমাদের অন্তরে ধরা পড়ে। তাই কোন কারণে যদি ইহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ আলোকের জগৎ হইতে চির-অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত হয়। সুতরাং চক্ষুরত্নকে সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

চোখের যত্ন—অতিরিক্ত তীব্র আলোকে বা অল্প আলোকে চোখের কাজ করিলে উহারা পীড়িত হয়। দীর্ঘদিন এরূপ করিলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে। যে সকল খাদ্যপুষ্টি চোখের দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখিতে সাহায্য করে, সেই সকল খাদ্য না খাইলে চক্ষুপীড়া দেখা দেয়। যেমন খাদ্যে ভিটামিন 'A'-র অভাব হইলে রাত্র্যন্ধতা, জেরেপথ্যালমিয়া, জেরোসিস প্রভৃতি অভাবজনিত ব্যাধিগুলি হইয়া থাকে। চোখ অপরিষ্কার রাখিলেও চোখের পাতায় ঘা হয়। তাই প্রত্যহ শীতল জলে চোখ দুইটি ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। যথেষ্ট আলোতে পড়াশুনা এবং অন্যান্য চোখের কাজ করিতে হয়। আলোক-রশ্মি সোজাসুজি চোখের উপর আসিয়া পড়িলে চোখ পীড়িত হয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হয়, যদি আলোক-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসে। ঘরের বৈদ্যুতিক বাতির ছায়াগুলি (shade) এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে আলোক-রশ্মি ছাদে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়ে।

পড়িবার সময় বা সেলাই করিবার সময় আলোর অবস্থান এমন হইবে যে আলোক-রশ্মি বাম কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া বইয়ের পাতায়



চিত্র : ১। চক্ষুর গঠন

(১) সিলিয়ারী পেশী (Ciliary muscle) (২) একোয়াস হিউমার (Aqueous humour) (৩) কনীনিকা (Iris) (৪) অচ্ছোদ পটল (Cornea) (৫) পুতুল ও অক্ষিমুকুর (Pupils & Lens) (৬) সাসপেনসারি লিগামেন্ট (Suspensory Ligament) (৭) সিলিয়ারি প্রসেস (Ciliary Process) (৮) ভাইব্রাস বডি (Vibrous Body) (৯) অপটিক ডিসক (Optic disc) (১০) ইয়েলো স্পট (Yellow spot) (১১) স্ক্লেরা (sclera) (১২) কোরয়েড (Choroid) (১৩) অক্ষিপট (Retina)।

পড়িবে। ১০০ ওয়াট্ বাল্ব-এর আলোকে কাজ করিলেই সব কিছু ভালভাবে দেখা যায়। ইহার অধিক আলোকে কাজ না করাই ভাল। তবে ৭৫ ওয়াট্ বাল্বের কমে চোখের কাজ করা উচিত নয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে দিনের আলোক থাকিতে থাকিতে চোখের কাজ সারিয়া ফেলা। সন্ধ্যার সময় অল্প আলোকে পড়াশুনা করা কখনই উচিত নহে। জানালা দরজা প্রচুর আছে এরূপ ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করা উচিত। জানালা-দরজায় পর্দা দিয়া আলো-আঁধার সৃষ্টি করিয়া কখনও চোখের কাজ করিতে নাই। যে ঘরে আলো কম আসে সে-ঘরের দেওয়াল ও মেঝের রং এমন করা উচিত যাহাতে অল্প আলোকেই ঘরটি আলোকিত হয়। বই

পড়িবার সময় অথবা সেলাই, বোনার কাজ প্রভৃতি করিবার সময় বইটি বা সেলাইটি চোখের খুব কাছে লইয়া করা উচিত নহে। ন্যূনপক্ষে সেলাইটি ১২" ইঞ্চি দূরে থাকিবে। অতি ছোট অক্ষরে বা অপরিষ্কার ছাপা কিছু পড়িলে চক্ষু পীড়িত হয়। কিছুক্ষণ চোখের কাজ করার পর মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করিলে কিংবা সবুজ মাঠ ও গাছের দিকে চাহিলে চোখের স্নায়ুগুলি বিশ্রাম পায়। চোখ বন্ধ করিয়া চোখের পাতার উপর দিয়া ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিলে চোখের পেশীগুলিতে রক্তসঞ্চালন ভাল হয়। কোন কারণে চক্ষুপীড়া দেখা দিলে বা দৃষ্টি-শক্তি কমিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

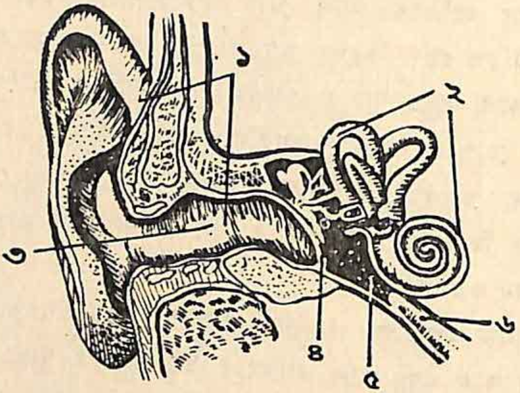
দেহের একটি অঙ্গ চক্ষু। শরীরের সাধারণ পুষ্টির উপরও ইহার স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তাই চক্ষু ভাল রাখিবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় প্রোটিন ও ভিটামিন A-বহুল খাদ্য। দুধ, ডিম, সবুজ শাকপাতা, গাজর, কডলিভার অয়েল, ঘি প্রভৃতি নিয়মিত খাইলে রাত্র্যন্ধতা, জেরেপথ্যালমিয়া প্রভৃতি ব্যাধির হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

কর্ণ

দৃশ্যময় জগৎ যেমন চক্ষু-পথে উদ্ভাসিত হয়, শব্দময় পৃথিবীও তেমনি কর্ণ দ্বারা পরিচিত হয়। জন্মাবধি যে বধির, সে মূক। পৃথিবীর কোন শব্দ-জ্ঞানই তাহার হওয়া সম্ভব নহে। কেবল তাহাই নহে, কর্ণের সহিত চক্ষু, নাসিকা এবং গলবিলের অতি নিকট সম্পর্ক। ইহা মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্তী অঙ্গ। তাই কর্ণের যত্ন লইতে হয়।

কর্ণের যত্ন—কর্ণের যত্ন না লইলে শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পাইতে পারে। কর্ণ-গহ্বরের গাত্র হইতে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া কর্ণের নালীপথকে মসৃণ রাখে। কিন্তু বায়ুর সহিত প্রচুর ধুলাবালি কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে। তৈলাক্ত পদার্থে আটকাইয়া ঐগুলি খইলে পরিণত হয়। খইল অতিরিক্ত জমিলে শব্দতরঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পায়। অত্যধিক তীব্রশব্দেও কর্ণপটহের ক্ষতি হইতে পারে। এমন কি, তীব্র শব্দ

হঠাৎ শুনিলে কর্ণপটহ ফাটিয়া, মানুষ জন্মের মতো বধির হইয়া যাইতেও পারে। জল ঢুকিয়া বা অনবরত সর্দি-কাশি হইয়া যদি কানে পূঁজ হয় এবং



চিত্র : ২। কর্ণের গঠন

(১) বহিঃকর্ণ বা কর্ণশঙ্কু (External Ear) (২) অন্তঃকর্ণ (Internal Ear) (৩) কর্ণপথ (Auditory Canal) (৪) কর্ণপটহ (Ear drum) (৫) মধ্যকর্ণ (Middle Ear) (৬) ইউস্টেশিয়ান টিউব (Eustachian Tube)

দীর্ঘদিন ধরিয়া উহা ভাল না হয় তাহা হইলেও কানের পর্দার ক্ষতি হয়। অনেক সময় টনসিল বা এডিনয়েড গ্রন্থি ফুলিয়া উঠিলে ইউস্টেশিয়ান নালীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার জন্য শ্রবণ-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কিংবা কোন মারাত্মক ব্যাধির জীবাণুর আক্রমণে শ্রবণ-স্নায়ু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। একবার শ্রবণ-স্নায়ু নষ্ট হইলে মানুষ চিরজীবনের জন্য বধির হইয়া যায়।

শ্রবণ-শক্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে উক্ত বিপদগুলি সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কর্কশ শব্দ হইতে কর্ণকে রক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা অতি শৈশব হইতেই করা কর্তব্য। কান নিয়মিত পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কর্ণ-গহ্বরে খইল জমা মাত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। অবশ্য খইল খুব সাবধানে বাহির করা উচিত। অনেক মায়ের অভ্যাস আছে কাঁটা, কানখুশকি, বা সেফটিপিনের পিছন দিয়া শিশুদের কান খোঁচান। ইহা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ইহাতে কানে আঘাত লাগিতে পারে। গ্লিসারিন গরম করিয়া, কাঠিতে বোরিক তুলা জড়াইয়া ঐ গ্লিসারিনে ভিজাইয়া কান পরিষ্কার করা

উচিত। কানে পুঁজ হইলে উহা যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা করিয়া সারাইয়া ফেলিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া শ্রবণ-স্নায়ু সুস্থ রাখিতে হইবে।

কর্ণ, নাসিকা এবং গলবিল ইউস্টেশিয়ান নালী দ্বারা যুক্ত। তাই একটি অসুস্থ হইলে অপরগুলি আক্রান্ত হইতে পারে। নাক এবং গলার যে কোন ব্যাধি, যেমন সর্দি, কাশি, টনসিলাইটিস, সাইনুসাইটিস প্রভৃতি হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে কর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

নাসিকা ও গলবিল

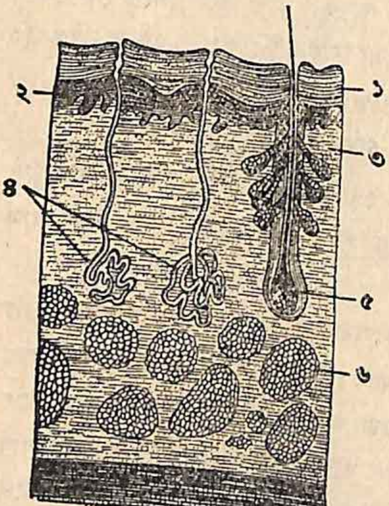
চক্ষু ও কর্ণের ন্যায় নাসিকাও দেহের একটি ইন্দ্রিয়। উহার সাহায্যে মানুষ গন্ধময় পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। তাই ইহার আর এক নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

নাসিকার যত্ন—নাসারন্ধ্র সকল সময় পরিষ্কার রাখা উচিত। নাক দিয়া টানিয়া জল মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিলে সমস্ত নাসাপথ পরিষ্কার থাকে। মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ইহাতে অশোধিত বায়ু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। নাকের সর্দি টানিয়া গিলিয়া ফেলা আর একটি মন্দ অভ্যাস। ইহাতেও শ্লেষ্মার সহিত রোগজীবাণু উদরে প্রবেশ করে। নস্য লওয়া এবং অনবরত নাক খোঁটার জন্য অনেককে খোনা হইয়া যাইতে দেখা যায়। অতিরিক্ত টাইট পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য নাক দিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হয়। ফলে বাধ্য হইয়া মুখ দিয়া শ্বাস লইতে হয়। গলার সহিত নাসিকা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই গলার কোন ব্যাধি হইলে নাসিকার ক্ষতি হইতে পারে।

গলবিলের যত্ন—গলার টন্‌সিল দুইটি জীবাণু ভক্ষণ করিয়া শ্বাস বায়ুকে যেমন বিশোধিত করে, তেমনি বার বার সর্দি-কাশির ফলে অথবা বার বার জীবাণুদের আক্রমণে যদি টন্‌সিল একবার সেপটিক হইয়া ফুলিয়া উঠে তখন ইহাই জীবাণু সংক্রমণের উৎসে পরিণত হয়। এই অবস্থা ঘটিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। যদি নিয়মিত নুন মিশাইয়া গরম জল দিয়া গলা ধোয়া হয়, যদি সর্দি-কাশি হওয়ামাত্র চিকিৎসা করান যায় এবং যাহাতে গলায় ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে টন্‌সিল দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। ভিটামিন 'A' ও 'C'-বহুল খাদ্য খাইলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

দেহত্বক

ত্বক মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয়। সকল প্রকার অনুভূতি ত্বক দ্বারাই অনুভূত হয় এবং দেহ-সঞ্চালন সম্ভব হয়।



চিত্র ঃ ৩। দেহত্বক
(১) বহিত্বক (Epidermis)
(২) ম্যালফিজিয়ান স্তর (Malfeighian Layer
(৩) অন্তত্বক (৪) ঘর্ম গ্রন্থি (৫) লোমকুপের বীজকোষ (Hairfollicle) (৬) মেদ গ্রন্থি (Sebaceous gland)

দেহত্বকের গঠন—দেহত্বকের গঠন নিম্নরূপ—দেহত্বক সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১) উপত্বক, (২) ত্বক। ত্বকের উপর থাকে উপত্বকের স্তর। উপত্বক সকল স্থানে সমান পুরু নহে। পায়ের তলা, হাতের চেটো এবং পিঠের চর্ম সর্বাপেক্ষা মোটা। ইহা স্বচ্ছ, দৃঢ় এবং জল অশোষক। ত্বককে রক্ষা করাই ইহার কাজ।

উপত্বকের গঠন ঃ উপত্বককে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। উপরের মৃত কোষসমূহ—এগুলি প্রত্যহ ঘর্ষণে উঠিয়া যায়। আর নিম্নের ম্যালফিজিয়ান স্তর—ঐ স্তরের উপরের কোষগুলি অনবরত বিভক্ত হইয়া নূতন কোষ সৃষ্টি করিয়া, ক্ষয়িত কোষগুলির স্থান পূরণ করে। ম্যালফিজিয়ান স্তরের নিম্নে যে কোষগুলি থাকে তাহার মধ্যে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ সূর্যালোকের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। তাহার ফলেই গাত্রবর্ণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই কোষগুলিকে তাই বর্ণকোষ বলে এবং রঞ্জক পদার্থকে 'পিগমেন্ট' বলা হয়। উপত্বকে কোন স্নায়ু বা রক্তবহা শিরা নাই। তাই ইহা অনুভূতিহীন এবং রক্তহীন। ইহার নিম্নে ঠিক ত্বক ও উপত্বকের সংযোগস্থলে একটি ঢেউ-খেলানো কোষস্তর দেখা যায়। স্তরটির উঁচু-নীচু ঢেউগুলিকে প্যাপেলি বলা হয়। প্যাপেলিগুলি অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং রক্তময় (vascular)।

ত্বকের গঠন ঃ প্রকৃত ত্বক উপত্বক অপেক্ষা অনেক পুরু। তিনপ্রকার তন্তু বা টিস্যু দ্বারা ইহা গঠিত ; যথা—ফাইব্রাস টিসু, কনেকটিং টিসু এবং ইলাস্টিক টিসু। ত্বকের অভ্যন্তরে স্নায়ু, শিরা, গ্রন্থিসমূহ এবং লোমের বা চুলের গোড়াগুলি অবস্থিত। গ্রন্থি দুই প্রকার—(১) ঘর্মগ্রন্থি। ইহার নালীগুলি উপত্বক ভেদ করিয়া চর্মের উপরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। (২) সিবেসাস গ্রন্থি বা তৈল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি চুলের গোড়ায় থাকে এবং ইহাদের নালীগুলি চুলের গোড়ার সহিত সংযুক্ত। তৈলাক্ত পদার্থ চুল বাহিয়া ত্বকের উপর আসে।

ত্বকের কাজ

ত্বকের কাজ নিম্নরূপ :—

(১) **রক্ষার কাজ** (Protective function) **:** দেহত্বক সমস্ত দেহটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়া দেহাভ্যন্তরের প্রয়োজনীয় স্নায়ু, শিরা এবং গ্রন্থিসমূহকে আঘাত, রোগজীবাণু এবং শীত, তাপ ও রৌদ্রের হাত হইতে রক্ষা করে।

(২) **অনুভূতির কাজ** (General sensation) **:** দেহচর্মেই স্নায়ুরজ্জুগুলির অগ্রভাগ আসিয়া শেষ হইয়াছে। তাই দেহত্বকই স্পর্শেন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করে। যে কোন আরামদায়ক অনুভূতি অথবা উত্তাপের অনুভূতি উহা গ্রহণ করে এবং স্নায়ুকেন্দ্রে পাঠাইয়া দেয়।

(৩) **দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ** (Regulation of heat) **:** পাঁচটি উপায়ে ত্বক ইহা করিয়া থাকে। যথা—(ক) সমস্ত দেহটি আবৃত করিয়া থাকে চর্ম। এই বিরাট ক্ষেত্র জুড়িয়া দেহতাপ পরিবহন, পরিচালন এবং বিচ্ছুরণের সাহায্যে দেহ হইতে সঞ্চালিত হইয়া দেহতাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই কারণেই যখন সকল অজৈব পদার্থের তাপ বহিঃপ্রকৃতির উত্তাপ উঠা-নামার সহিত কমিতে ও বাড়িতে থাকে তখন জীবদেহের তাপ সকল সময় একই রূপ থাকিয়া যায়। (খ) দেহচর্মের ঠিক নিম্নেই পুরু মেদের স্তর থাকে। ইহা দেহাভ্যন্তরের তাপ বিচ্ছুরণে বাধা দিয়া দেহতাপ একরূপ রাখিতে সাহায্য করে। (গ) ত্বকের মধ্যে যে সকল ঘর্মগ্রন্থি আছে সেগুলি বহিঃপ্রকৃতির তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্বেদ নির্গমন শুরু করিয়া দেয়। স্বেদের সহিত দেহতাপ অনেকখানি বাহির হইয়া যায়। (ঘ) চর্ম সংকুচিত ও সম্প্রসারিত

হইয়াও দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শীতকালে যখন বহিঃপ্রকৃতি শীতল তখন ইহা সংকুচিত হইয়া দেহতাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। আর গরমের সময় ইহা ঠিক বিপরীত কাজটি করিয়া থাকে। (ঙ) দেহলোমও দেহতাপ সঞ্চালনে বাধা দেয়। এইজন্যই শীতপ্রধান দেশের জীবজন্তুর গায়ে বেশী লোম থাকে।

(৪) **চর্মের বিশোষণ কার্য (Absorption function):** দেহচর্ম তৈলাক্ত পদার্থ শোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু জলীয় পদার্থ শোষণ করিতে পারে না।

(৫) **নিঃস্রবণ কর্ম (Secretary function):** ত্বকের গভীরে অসংখ্য সিবেসাস গ্রন্থি তৈল বাহির করিয়া চর্মটিকে তৈলাক্ত ও মসৃণ রাখে। ভিটামিন A-র অভাব হইলে গ্রন্থিগুলি শুকাইয়া যায় বলিয়া চর্ম শুকাইয়া টডস্কিন হয়। ম্যামারি গ্রন্থিগুলিও ঠিক ত্বকের নিম্নে অবস্থিত। এই গ্রন্থি হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

(৬) **রেচন কাজ (Excretary function):** ত্বক-অভ্যন্তরের ঘর্মগ্রন্থি হইতে ঘর্ম বাহির হইয়া ত্বকের উপর আসিয়া পড়ে। ঘর্মের সহিত দেহের বর্জ্য পদার্থগুলিও বাহির হইয়া যায়।

(৭) **দেহতরলের ভারসাম্য রক্ষার কাজ (Maintaining water-balance):** ঘর্মের সহিত কেবল রক্তের বর্জ্য পদার্থগুলিই বাহির হইয়া যায় না, বাড়তি জলীয়াংশও বাহির হইয়া যায়। তাহার ফলে দেহ-তরলের ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

(৮) **অম্লক্ষার ভারসাম্য রক্ষার কাজ (Acid-base equilibrium):** ঘর্মের সহিত বাড়তি অম্ল অনেকখানি বাহির হইয়া যায়। ইহার ফলে রক্তের ক্ষারত্ব রক্ষা পায়।

(৯) **সংশ্লেষণের কাজ (Synthetic function):** দেহত্বকের নিম্নে মেদস্তরের মধ্যে কোলেস্টেরল নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। তাহা সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন D সংশ্লেষিত (synthesise) করে।

(১০) **সঞ্চয়নের কাজ (Storage function):** মেদ, জল এবং বিভিন্ন লবণ, এমন কি কখনও কখনও গ্লুকোজ পর্যন্ত চর্মের নিম্নে সঞ্চিত থাকে।

(১১) **গ্যাস আদান-প্রদান** (Gaseous interchange) : শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রধানতঃ ফুসফুসের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। সামান্য পরিমাণে চর্মের মাধ্যমেও হয়। দেহচর্ম বায়ুর নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) বাহির করিয়া দেয়।

ত্বকের যত্ন—ত্বক সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যহ স্নান করা কর্তব্য। স্নান করিবার পূর্বে তৈলের সাহায্যে গাত্র মর্দন করিতে হইবে। ইহাতে দেহে রক্তসঞ্চালন ভাল হয়। তাহার পর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে হইবে। স্নান করিবার সময় হয় সাবান দিয়া অথবা তোয়ালে বা গামছা দিয়া গা রগড়াইয়া সমস্ত তেল-ময়লা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইভাবে ত্বক নিয়মিত পরিষ্কার না করিলে চর্মরোগ হইতে পারে। ঘর্মের সহিত অম্লাক্ত বর্জ্য পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। ঘর্মের জলীয়াংশ শুকাইয়া গেলেও ঐ সকল পদার্থ চর্মের উপর লাগিয়া থাকে। বায়ুর সহিত প্রচুর ধূলা-ময়লা আসিয়াও গায়ে লাগে। নিয়মিত পরিষ্কার না করিলে লোমকূপের মুখগুলি বন্ধ হইয়া গিয়া, ঘর্ম নির্গমনের পথ বন্ধ হইয়া যায়। দূষিত বর্জ্য পদার্থ বাহির হইতে পারে না। চর্ম-অভ্যন্তরে সঞ্চিত দূষিত মল চর্মরোগ ঘটায়। নির্মল বায়ু, সূর্যকিরণ ও অঙ্গ-সঞ্চালন দেহচর্মকে সুস্থ রাখিতে সাহায্য করে। নগ্নগাত্রে অথবা পাতলা সাদা পোশাক পরিধান করিয়া সকাল ও বিকালে উন্মুক্ত স্থানে প্রত্যহ কিছুক্ষণ বেড়াইলে চর্ম সুস্থ থাকে। সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আসিলে চর্মের নিম্নের 'কোলেস্টেরল' নামক পদার্থ হইতে ভিটামিন D প্রস্তুত হয়। সূর্যকিরণ এবং বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। তাছাড়া চর্মের মৃদু শ্বাসগ্রহণ ক্ষমতা আছে, তাই উহা কিছু পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। অঙ্গসঞ্চালন করিলে রক্ত চলাচল ভাল হয় এবং চর্মের অন্ত-কোষগুলি অক্সিজেন ও খাদ্যপুষ্টি অধিক পরিমাণে পাইয়া থাকে।

খাদ্যে ভিটামিন A, B_2, B_3, C এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডগুলির অভাব হইলেও চর্মরোগ হইতে পারে। তাই প্রচুর পরিমাণে তাজা শাক, সবজি, দুধ, ডিম, ফলমূল এবং আকাঁড়া শস্য (whole grain) জাতীয় খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। যে সকল উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ তৈল বা চর্বিতে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি (essential fatty acids) আছে তাহা

প্রত্যহ কিছু পরিমাণ খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত রৌদ্রে পুড়িলে অথবা অতিরিক্ত সাবান বা ক্ষার পদার্থ ব্যবহার করিলে চর্ম কর্কশ হইয়া যায়। এইজন্য সব কিছুই পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। মুখের ত্বক্ অতিশয় কোমল। খস্‌খসে তোয়ালে বা গামছা দিয়া নিয়মিত ঘষিলে মুখের ত্বক ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া যায়। ঠিক তেমনি অতিরিক্ত স্নো, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করিলেও ত্বকের তৈলাক্ত ভাব চলিয়া যায়। লোমকূপের মুখ বন্ধ হইয়া মল নিঃসরণের পথ বন্ধ হয়। ইহাতে ত্বক কেবল কুদৃশ্যই হয় না, মুখে ব্রণ বাহির হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, অতিরিক্ত টাইট কোমর-বন্ধনী ব্যবহার করিলেও ব্রণ হয়। প্রত্যহ রাত্রে শুইবার পূর্বে ঈষদুষ্ণ সাবান-জলে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করিয়া কোন জীবাণুনাশক ক্রিম বা তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়া শুইলে মুখের ত্বক নরম থাকে। প্রাতঃকালে পুনরায় গরম সাবান-জলে ধুইয়া ঐ তৈলাক্ত দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা না হইলে উহাতে ধূলা-বালি আটকাইয়া ত্বকের ক্ষতি করে। সর্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত।

কেশ ও তাহার পরিচ্ছন্নতা

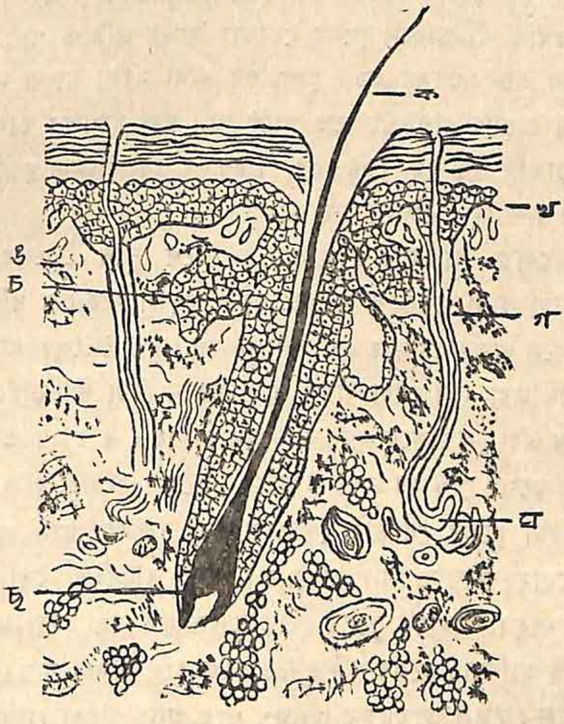
চুলের গঠন—চুলের দুইটি অংশ :—(১) বাহিরের দীর্ঘ অপেক্ষাকৃত মোটা অংশ, (২) মস্তকের ত্বকের মধ্যে প্রোথিত মূল।

প্রথম অংশই আমরা দেখিতে পাই। ইহা দীর্ঘ হয় এবং মস্তক আবৃত করে। দ্বিতীয় অংশ আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশেই মূল জিনিসগুলি থাকে।

(১) **বাহিরের অংশ :** কেশের বাহিরের অংশটিকে কেশদণ্ড বলে। ইহা কাহারও সরল, কাহারও বা কুঞ্চিত। কাহারও কালো, কাহারও বা বাদামী বা সোনালী।

(২) **মাথার ত্বকের মধ্যে প্রোথিত অংশ :** এই অংশে থাকে বহিস্ত্বক, অন্তস্ত্বক, তৈলগ্রন্থি, পেশী, স্নায়ু, রক্তকোষ এবং কেশের কোষগহ্বর ও প্যাপিলা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টবের আকৃতিবিশিষ্ট প্যাপিলার মধ্যে কেশের মূল প্রোথিত থাকে। এই স্থান হইতেই কেশ জন্মায়। কেশের মূলে প্যাপিলার গায়ে কেশের নিজস্ব স্নায়ু, পেশী এবং তৈলগ্রন্থি আছে। পেশীগুলিতে রক্ত

সঞ্চালনের জন্য অসংখ্য রক্তবাহী নালী উহার উপর দিয়া গিয়াছে। রক্তই কেশমূলে খাদ্যপুষ্টি সরবরাহ করে।



চিত্র : ৪। চুলের গঠন
(ক) কেশাগ্র (খ) অধস্ত্বক (গ) ঘর্মপথ (ঘ) ঘর্মগ্রন্থি (ঙ) অন্তস্ত্বক
(চ) স্বেদগ্রন্থি (ছ) কেশমূল।

কেশের যত্ন—কেশ দীর্ঘস্থায়ী নহে। একগাছি কেশ খুব বেশী হইলে দুই হইতে চারি বৎসর পর্যন্ত থাকে। তারপর উহা ঝরিয়া যায়। শূন্যস্থানে নূতন কেশ জন্মায়। নূতন গজান নির্ভর করে কেশমূলের সুস্থতার উপর। আর ঐ সুস্থতা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর—(১) পরিচ্ছন্নতা ও (২) কেশমূলে রক্ত সঞ্চালন। পরিচ্ছন্নতার অভাব হইলে উকুন, মরামাস, কেশ-দাদ প্রভৃতি হয়। আর রক্ত সঞ্চালন ভাল না হইলে কেশমূলে খাদ্যপুষ্টি সরবরাহ ঠিকমতো হয় না।

সুতরাং পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ত সঞ্চালন ভাল করিবার জন্য নিম্নোক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) চুল আঁচড়ান : চিরুনি এবং বুরুশের সাহায্যে নিয়মিত চুলগুলি দিনে কয়েকবার আঁচড়াইলে চুলের গোড়ায় ময়লা জমিতে পারে না এবং ঘর্ষণের ফলে রক্ত সঞ্চালন হয়। চুলগুলির মধ্যে ময়লা থাকে না বলিয়া সহজে উকুন প্রভৃতি বাসা বাঁধিতে পারে না। রক্ত সঞ্চালন ভাল হওয়ায় চুলের গোড়াগুলি শক্ত হয়, নূতন কেশ বাহির হয় এবং তৈলগ্রন্থিগুলি সতেজ হইয়া চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে।

(২) তৈলের ব্যবহার : আমাদের দেশে চুলে তৈলের ব্যবহার প্রচলিত। ইহা দ্বারা দুইটি লাভ হয়—(ক) অঙ্গুলি সাহায্যে ঘষিয়া তৈল প্রয়োগ করিলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হয়। (২) তৈলের দ্বারা মাথার ধুলা-ময়লা ভিজিয়া নরম হইয়া যায়। পরে চিরুনি দিয়া আঁচড়াইলে সহজে উঠিয়া আসে এবং চুলগুলিকে মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়। এ ছাড়া ভাল কেশ-তৈলগুলিতে চুলের পুষ্টি হয় এমন উপাদান থাকে। মাথার ত্বকে সেইগুলি শোষিত হইয়া চুলের গোড়ায় পৌঁছায় এবং নবকেশোদ্গম হয়। চুলের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু অতিরিক্ত তৈল ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহাতে চুলের গোড়ার রন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। ধূলা বালি উড়িয়া আসিয়া তৈলের সহিত চিট হইয়া চুলে বসিয়া যায়।

(৩) স্নান : তৈল প্রয়োগের অল্পক্ষণ পরে স্নান করিয়া ফেলা উচিত। স্নানের সময় জল পড়ায় ময়লাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া,যায় এবং আলগা ধূলা উঠিয়া আসে। পরে আঁচড়াইলে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়। স্নানের পর জল সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া রৌদ্রে এবং বায়ুতে চুলগুলি শুকাইয়া ফেলা দরকার। গোড়া ভিজা থাকিলে মাথায় গন্ধ হয়, চুলের গোড়া আলগা হইয়া যায়। তাছাড়া সূর্যালোক এবং বায়ু চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে, কোনরূপ রোগ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

(৪) মাথা ঘষা বা শ্যাম্পুর ব্যবহার : চুলে ময়লা জমিতে দেওয়া উচিত নহে। সপ্তাহে একদিন কোন ক্ষারবিহীন সাবান বা ভাল শ্যাম্পুর সাহায্যে মাথা ঘষা উচিত। ইহাতে চুলের ময়লা পরিষ্কার হয়, চুলের গোড়ার রন্ধ্রপথ মুক্ত হয়।

(৫) **সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম:** সুনিদ্রা, পরিমিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে সাধারণত স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং চুলগুলি ভাল হয় কিন্তু রক্তহীনতা, পেটের গণ্ডগোল, সাধারণ অপুষ্টি প্রভৃতি হইলে চুল উঠিয়া যায়।

কেশের ব্যাধি ও তাহা নিবারণ

উকুন, মরামাস এবং কেশ-দাদ চুলের ব্যাধি। শিশুদের কেশ-দাদ হয়। বয়স্কদের উকুন এবং মরামাস হইতে দেখা যায়।

উকুন—ইহা একপ্রকার কীট। কোনপ্রকারে একটি উকুন চুলে প্রবেশ করিলে ডিম পাড়িয়া সমস্ত চুল ছাইয়া ফেলে। ইহাতে চুল রুক্ষ হইয়া উঠে। উকুন হইলে প্রথমে সাবান দিয়া চুল ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ন্যাপথলিন, ডেটল, অ্যাটম ইত্যাদির ন্যায় জীবাণুনাশক (যাহা মস্তকচর্মের কোন ক্ষতি-সাধন করিবে না) ব্যবহার করিলে উকুন পলায়ন করে। কীট-নিবারক ব্যবহারের পূর্বে মাথায় সাবান দিতে হইবে। পরিষ্কার জলে ধুইবার সময় যাহাতে সমস্ত সাবান উঠিয়া যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ চুলের গোড়ায় সাবান লাগিয়া থাকিলে চুল আলগা হইয়া যায়।

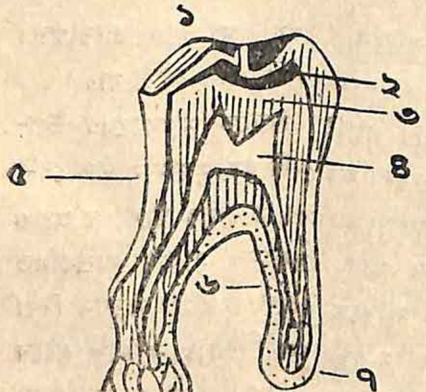
মরামাস—চুলের ইহা একপ্রকার ব্যাধি। ইহাতে মস্তকচর্মের উপ-ত্বকগুলি অনবরত উঠিয়া যায়। তেল-ময়লা যত বেশী হয়, মরামাস তত বেশী বাড়ে। ইহা ভিন্ন বদহজম, অনিদ্রা, অত্যধিক চিন্তা, মানসিক উদ্বেগের জন্যও মরামাস হয়। একজনের মাথা হইতে আর একজনের মাথায় সংক্রামিত হইয়াও মরামাস আসে। মরামাস দূর করিতে হইলে নিয়মিত চিরুনি দিয়া মাথা আঁচড়াইতে হইবে। সাবান দিয়া মাথার চুল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব তেল কম ব্যবহার করিতে হইবে। অনেকে জমকালো বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া নানা প্রকার ঔষধ মরামাস দূর করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ইহাতে মরামাস তো ভাল হয়ই না, উপরন্তু চুল উঠিয়া মাথায় টাক পড়িতে শুরু করে। বরং যদি নিয়মিত অলিভ অয়েল গরম করিয়া চুলের গোড়ায় ঘষিয়া মাখা যায় এবং ২।৪ দিন অন্তর সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে মরামাস তাড়াতাড়ি ভাল হয়। গন্ধকের তেল এবং ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করিলেও মরামাস ভাল হয়। বড় চামচের দুই চামচ

নারিকেল তেলের সহিত চায়ের চামচের ½ চামচ গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া ফুটাইয়া গন্ধকের তেল তৈয়ারী করা যায়। বড় তিন চামচ জল, তিন চামচ অ্যালকোহল এবং চায়ের চামচের এক চামচ রিফাইন্‌ড্‌ ক্যাস্‌টর অয়েল মিশাইয়া দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হয়। গন্ধকের তেল বা ক্যাস্‌টর অয়েল দ্রবণ প্রতিদিন অথবা ১ দিন অন্তর ঘষিয়া মাথার চুলের গোড়ায় লাগাইতে হয়। প্রতি ২।৪ দিন অন্তর সাবান, গরমজল দিয়া মাথাটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়।

দন্ত

দন্ত কেবল মানুষের মুখমণ্ডলেরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, ইহা খাদ্যদ্রব্য চর্বণ ও পরিপাকেরও সাহায্য করে। মুখমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থিত খাদ্য-দ্রব্যের সহিত ইহার প্রতিনিয়ত সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে। তাই দন্তের পরিচ্ছন্নতার উপর সাধারণ স্বাস্থ্য ও দেহের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা নির্ভর করে। এই জন্য দাঁতের যত্ন লওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য।

দন্তের গঠন—যে কোন একটি দন্তের উপর হইতে নীচে দেখিতে গেলে দন্তের তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। (১) অগ্রভাগ বা 'ক্রাউন' ('Crown')—মাড়ির উপর যে কঠিন দন্ত দেখা যায় তাহাই ক্রাউন। ইহার সাহায্যেই খাদ্যদ্রব্য চিবান হয়।(২) দন্তমূল—মাড়ির নীচে দন্তের যে অংশ থাকে তাহাকেই দন্তমূল বলা হয়। অধিকাংশ দন্তেরই তিন ভাগের এক ভাগ মাড়ির উপরে থাকে এবং দুই ভাগ মাড়ির নীচে থাকে। (৩) দন্তবৃন্ত—দন্তমূল এবং দন্তাগ্রের মধ্যে থাকে দন্তবৃন্ত বা 'neck'। ঠিক যে স্থান হইতে দাঁত মাড়ির উপর দেখা যায় সেই সংযোগ-স্থলকেই 'neck' বলা হয়।



চিত্র : ৫। দন্তের গঠন
(১) দন্তাগ্রভাগ (২) এনামেল (৩) ডেনটিন
(৪) দন্তমজ্জা (৫) দন্তবৃন্ত (৬) দন্তমূল
(৭) সিমেন্টের আস্তরণ।

এখন একটি দন্তকে যদি আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে বাহির হইতে ভিতরে তিনটি স্তর আছে।

(১) প্রথমেই কঠিন উজ্জ্বল এনামেলের স্তর। দন্তাগ্রভাগ হইতে 'neck' বা দন্তবৃন্ত পর্যন্ত ইহা দাঁতটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত কঠিন, সহজে ক্ষয় হয় না। তবে অতিরিক্ত অম্ল পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ক্ষয় হয়।

(২) ইহার ঠিক নীচেই থাকে প্রকৃত দন্ত বা 'ডেনটিন্'। ইহা দৃঢ় জমাট ক্যালশিয়াম লবণ দ্বারা প্রস্তুত।

(৩) দন্তাস্থির অভ্যন্তরে থাকে দন্তমজ্জা। মজ্জার মধ্যে ধমনী, জালক এবং স্নায়ু বর্তমান। মাড়ির অভ্যন্তরে দন্তের যে অংশটি থাকে দন্তমজ্জার পরিমাণ সেই অংশেই অধিক। দন্তমজ্জার ভিতরেই মাড়ি হইতে রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন দন্তমূলকে আচ্ছাদিত করিয়া আর একটি হরিদ্রাভ কঠিন শুভ্র আবরণ থাকে।

দন্তের যত্ন—দন্তের সুস্থতা দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে, যথা (১) পরিচ্ছন্নতা, (২) দন্তমূলে রক্ত সঞ্চালন ও খাদ্যপুষ্টি সরবরাহ।

(১) পরিচ্ছন্নতা : খাদ্যদ্রব্য চর্বণের সময় খাদ্যকণা দাঁতের গোড়ায় লাগিয়া থাকে। এইগুলি ভালভাবে পরিষ্কার না করিলে দাঁতের ফাঁকে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য পচিয়া অম্লরস সৃষ্টি করে। ঐ অম্লরস দন্তের দুইটি ক্ষতি করে—(ক) দন্তের এনামেল নষ্ট করিয়া দেয়, ডেন্টিন আক্রান্ত হয় ও দন্তে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। (খ) দাঁতের গোড়ায় কালো শক্ত পাথর চটা বা 'টার্টার' তৈয়ারী করে। উহার ফলে দাঁতের গোড়া মাড়ি হইতে আলগা হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ দন্তমূল বাহির হইয়া পড়িতে থাকে। ইহার ফলে দাঁত আলগা হইয়া যায়। পাথর চটা জমিয়া থাকার ফলে দাঁতের মাড়ি ফাঁক হইয়া দাঁত ও মাড়ির মাঝে খাদ্যকণা ঢুকিয়া পচিতে থাকে, ক্রমশঃ এখানে ক্ষত দেখা দেয় এবং জীবাণু সংক্রমণের (secondary infection) ফলে ক্ষত বৃদ্ধি পায়, পুঁজ জমা হয়। তখন এই অবস্থাকে বলা হয় পাইওরিয়া। মাড়ি টিপিলেই পূঁজ ও রক্ত বাহির হয়। এই দূষিত রক্ত পুঁজ খাদ্যের সহিত পেটে গিয়া পৌঁছিলে যে কোন কঠিন ব্যাধির উদ্ভব হইতে পারে।

এই সকল ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দাঁতগুলি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রত্যহ খাইবার পর দুইবেলা দাঁত মাজিতে এবং যে কোন

খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের পর জল দিয়া কুলকুচা করিতে হইবে। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বেও দাঁত মাজিতে হইবে। রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে ঈষৎ ক্ষার বা লবণ জলে মুখ ধোয়া খুব ভাল অভ্যাস। এক গ্লাস জলে চায়ের চামচের ২টি দানা পটাশ পারমাঙ্গানেট অথবা কয়েক ফোঁটা ডেটল দিয়া যদি কুলকুচা করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে অম্ল পদার্থ সৃষ্টি হইতে পারে না। খাইবার পর কয়েক খণ্ড হরীতকী মুখে ফেলিয়া রাখিলেও দাঁতের গোড়ার অম্ল পদার্থ নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন দাঁত মাজিবার বুরুশ ও মাজনের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। আজকাল অধিকাংশ শহরের মানুষই বুরুশ দিয়া দাঁত মাজেন। বুরুশ দিয়া দাঁত মাজা ভাল। ইহাতে দাঁতের ফাঁকের ময়লাগুলি পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে একটি বিপদও আছে। বুরুশটি যদি মাঝে মাঝে বিশোধন করা না হয় তাহা হইলে বুরুশের গোড়ায় ময়লা জমিয়া থাকে। ঐ ময়লা পচিয়া দাঁতের গোড়ায় রোগ সংক্রামণ ঘটায়। তাই দাঁত মাজিবার পর খুব ভাল করিয়া বুরুশটি পরিষ্কার করিতে হয়। দাঁত মাজিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে বুরুশটি যেন শক্ত (hard brush) না হয়। তাহা হইলে মাড়ি ছড়িয়া যাইতে পারে।

বুরুশের সাহায্যে দাঁত মাজিবার নিয়ম—বুরুশটি আড় করিয়া ধরিয়া ছোট ছোট বৃত্ত তৈয়ারী করিয়া দাঁতের উপর চালাইতে হয়। দাঁতের উপর ও ভিতর পিঠ দুই-ই এইভাবে মাজিতে হয়।

দাঁতের মাজন—সস্তা বাজে দাঁতের মাজন ব্যবহার করিলে দাঁতের ক্ষতি হয়। হয় ভাল প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মাজন ব্যবহার করিতে হয় অথবা বাড়ীতে মাজন প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। হরীতকী, দারুচিনি, কর্পূর ও সামান্য খড়ির খুব মিহি গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া দাঁতের মাজন তৈয়ারী করা যায়। ঐ গুঁড়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া নেওয়া উচিত। মাজন মিহি না হইলে ঘর্ষণের ফলে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়। ঘুঁটের ছাই, কাঠ কয়লা, তামাক পোড়া ছাই প্রভৃতি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করাই ভাল।

(২) দন্তমূলে রক্তসঞ্চালন ও খাদ্য পুষ্টি সরবরাহ : দন্তের মজ্জাগুলির ভিতর যাহাতে ভালভাবে রক্ত সঞ্চালন হয় সেজন্য প্রত্যহ দাঁত মাজিবার সময় দুইটি আঙ্গুলের সাহায্যে মাড়ি চাপিয়া ধরিয়া রগড়াইতে হয়। ইহার ফলে মাড়িতে রক্ত সঞ্চালন হয় ও দাঁতের গোড়ায় খাদ্যপুষ্টি সরবরাহ ভাল

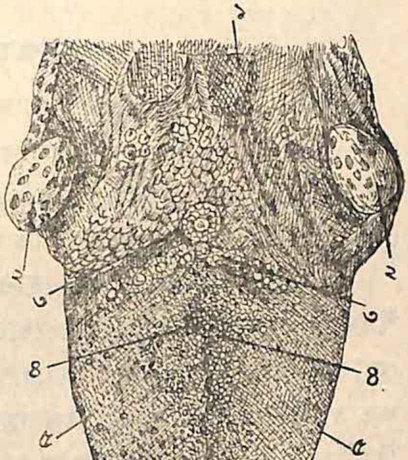
হয়। ইহা ভিন্ন প্রত্যহ দাঁতন করিলে অথবা কোন শক্ত খাদ্য চিবাইয়া খাইলেও দাঁতের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হয়। যেমন আখ, নারিকেল, ছোলা ভাজা, কড়াই ভাজা ইত্যাদি। প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন A, C এবং D-বহুল খাদ্য ভক্ষণ করিলে দাঁতগুলি দৃঢ় ও সুপুষ্ট হয়।

অনিদ্রা, অজীর্ণ ইত্যাদি ব্যাধিতেও দাঁত নষ্ট হয়। তাই বদহজম, অম্বল ও পেট গরম না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম ও বিশ্রাম করিলে সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং দাঁতও ভাল থাকে।

স্বাদেন্দ্রিয় বা জিহ্বা

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং চর্মের পর জিহ্বা আমাদের শরীরের আর একটি ইন্দ্রিয়। ইহা আমাদের স্বাদ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে।

জিহ্বার গঠন—জিহ্বার মধ্যাংশ বাদ দিয়া আর সকল দিকে উঁচু দানা বা ফুসকুড়ির মতো যে জিনিসগুলি থাকে সেইগুলির মধ্যেই থাকে আস্বাদ কোরক এবং আস্বাদকোষ। বিভিন্ন প্রকার স্বাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোরক আছে। মিষ্টস্বাদ লইবার কোরকগুলি থাকে জিহ্বার ডগায়। জিহ্বার দুই পার্শ্বে লবণ স্বাদ গ্রহণ করিবার কোরক, পার্শ্বের পশ্চাতে থাকে টক বা অম্লস্বাদের কোরক। আর জিহ্বার একেবারে পশ্চাতে বড় দানাগুলি তিক্ত স্বাদ লইবার কোরক।



চিত্র : ৬। জিহ্বার গঠন
(১) আলজিভ (২) টনসিল (৩) ঝাল ও তিক্ত স্বাদ গ্রহণের প্যাপিলি (৪) মিষ্টি স্বাদগ্রহণের প্যাপিলি (৫) লবণ স্বাদগ্রহণের প্যাপিলি

স্বাদ গ্রহণ—লালাদ্বারা খাদ্যবস্তু সিক্ত হইয়া উহার অণুগুলি আস্বাদ কোরকে লাগিলে ঐ স্থানের স্নায়ু উত্তেজিত হয়। এই

উত্তেজনা বহন করিয়া অনুভূতি-স্নায়ু (sensory nerve) মস্তিষ্কের স্বাদ কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি খাদ্যের স্বাদ কিরূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যে কোরক যে স্বাদের জন্য নির্দিষ্ট তাহারা সেই স্বাদ গ্রহণ করে, অন্যগুলি ঐ স্বাদ গ্রহণ করে না। সুতরাং বিভিন্ন কোরক বিভিন্ন স্বাদের সংবাদ স্বতন্ত্রভাবে মস্তিষ্কে পাঠায়, আমরাও সেই সেই স্বাদ সম্বন্ধে সচেতন হই।

জিহ্বার যত্ন লওয়া—জিহ্বার মাঝখানে সাদা ময়লা পুরু হইয়া জমিতে দেখা যায়। উহা নিয়মিত নরম জিব-ছোলার সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলা প্রয়োজন। ছোট শিশুদের গ্লিসারিনে তুলা ভিজাইয়া জিহ্বা পরিষ্কার করাইয়া দিতে হয়। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইলে স্বাদ কোরক-গুলি অনুভূতি হারায়। তাই এই সকল জিনিস বেশী খাওয়া উচিত নহে।

স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক

পোশাক স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন। পোশাক মানব-শরীরকে শীত, তাপ, রোগজীবাণুর আক্রমণ, কীটাদির দংশন, আঘাত, প্রখর রৌদ্র এবং বৃষ্টি-বাদল হইতে রক্ষা করে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করে যে পোশাক, সেই পোশাককেই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক বলা যাইতে পারে।

পোশাকের উদ্দেশ্য ও উহার যথাযথ ব্যবহার—(১) দেহের শীততাপের ভারসাম্য রক্ষা করা পোশাকের অন্যতম কাজ। শরীরের উত্তাপ মোটামুটি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদিতে সমান থাকে। কিন্তু জড়প্রকৃতি শীতে অত্যন্ত শীতল, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠে। স্বাভাবিক ভাবেই শীতের হিমশীতল বায়ু শরীরের উত্তাপ হরণ করিবার চেষ্টা করে, গ্রীষ্ম দেহকে উত্তপ্ত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু শরীরের মধ্যে তাপসাম্য রক্ষার যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে তাহা সদা সক্রিয় থাকায় শরীরের উত্তাপের বিশেষ পার্থক্য হয় না। পোশাক ইহাতে সাহায্য করে। রেশম, নাইলন, পশম ইত্যাদির পোশাক শরীরের তাপ বিচ্ছুরণে বাধা দিয়া শরীরের তাপ হরণ প্রতিরোধ করে। তাই শীতের সময় উক্ত তাপ সংরক্ষণকারী ও তাপ-কুপরিবাহী তন্তুগুলির পোশাক স্বাস্থ্যসম্মত।

আবার গরমের সময় কার্পাস ও লিনেনের পোশাক বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহারা তাপের সুপরিবাহী এবং ভাল জল-শোষক ; তাই শরীরের তাপ বিচ্ছুরণেও সাহায্য করে, আবার ঘাম শোষণ করিয়া দেহকে শীতল ও সুস্থ রাখে।

(২) পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। কারণ উহা দেহ-চর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে এবং রোগজীবাণুর হাত হইতে শরীরকে রক্ষা করে। ঘর্মের সহিত শরীর হইতে ক্লেদ নিঃসৃত হয়। ধূলা ও ধোঁয়ার সহিত অসংখ্য রোগজীবাণু পোশাকে লাগে। তাহাতে পোশাক অপরিষ্কার হয় এবং জীবাণুদুষ্ট হয়। এইরূপ পোশাক শরীরকে রোগের হাত হইতে রক্ষার পরিবর্তে দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটাইয়া থাকে। অতএব পোশাক-পরিচ্ছদ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহা নিয়মিত পরিষ্কার করা যাইবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকই স্বাস্থ্যসম্মত।

(৩) জুতা, টুপি, মোটা উলের পোশাক শরীরকে অনেক সময় আঘাত এবং কীট-পতঙ্গের দংশন হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে প্রয়োজনমতো জুতা, টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

(৪) বর্ষার দিনে বর্ষার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে বর্ষাতি, গাম্‌বুট ইত্যাদির ব্যবহার করা উচিত। নতুবা বৃষ্টিতে ভিজিলে অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

(৫) পোশাক-পরিচ্ছদ অতিরিক্ত আঁটোসাঁটো বা টাইট হইবে না। কোমর-বন্ধনী, মোজার বন্ধনী, মোজার ইলাস্টিক্‌, ব্রেসিয়ার ইত্যাদি এমন টাইট হইবে না যাহাতে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি হয়।

(৬) পোশাক সর্বদা যথাযথ বা ফিটমাপের হইবে। ইহার কাট-ছাঁট দেহের ত্রুটিগুলি ঢাকিয়া স্বাভাবিক গুণগুলি প্রকাশ করিবে। তবেই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিবে।

(৭) পোশাকের একটি সামাজিক দিকও আছে। উহা সর্বদা সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। ইহা যেন শালীনতা রক্ষা করিয়াও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৮) বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পোশাক বিভিন্ন রূপ হওয়া উচিত। যেমন, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম, কাজের সময়ের পোশাক, উৎসবের পোশাক এবং

শয়নের পোশাক ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যে কাজ যখন করা হইবে সেই কাজের উপযোগী পোশাক না হইলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়।

(৯) পোশাকের রং ঋতু এবং দিন-রাত্রি ও আলো-অন্ধকার প্রভৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। উজ্জ্বল রং উত্তাপ ধরিয়া রাখে, হালকা রং উত্তাপ বিচ্ছুরণে সহায়তা করে। উজ্জ্বল রং মনে উৎসাহ আনে। শীতের দিনে উজ্জ্বল রং-এর পোশাক, গ্রীষ্মে সাদা বা হালকা রং-এর পোশাক এবং দিনের বেলা উজ্জ্বল ও রাত্রে অনুজ্জ্বল রঙের পোশাক পরিধান করা উচিত। বর্ষা ঋতুতে মৃদু রং, শীতে উজ্জ্বল এবং গ্রীষ্মে শ্বেতশুভ্র পোশাক পরিধান করিলে পোশাকের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়। এমন রং ব্যবহার করা উচিত নহে যাহা ঘাম লাগিয়া উঠিয়া যায় এবং চর্মের ক্ষতি করে।

(১০) মসৃণতা বস্ত্রের একটি বিশেষ গুণ। যে বস্ত্র যত মসৃণ, সেই বস্ত্র পরিধান করিলে তত আরাম বোধ হয়। গ্রীষ্মকালে মসৃণ বস্ত্র পরিধান করাই উচিত।

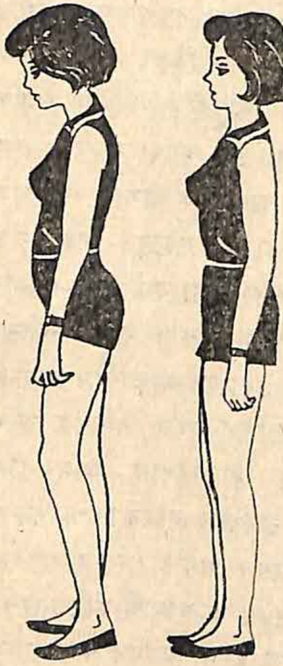
দেহভঙ্গি

দেহভঙ্গি সঠিক হইলে দেহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ভঙ্গি বিকৃত হইলে অতীব সুন্দর চেহারাও সৌষ্ঠবহীন দেখায়। কেবল তাহাই নহে, ভুল ভঙ্গির ফলে দেহের অংশবিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যও নির্ভুল ভঙ্গিতে হাঁটা ও চলা-ফেরা প্রয়োজন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'smart'। বাংলায় ইহার প্রতিশব্দ পাওয়া মুশকিল। smart ব্যক্তির সমস্ত চলাফেরা, কথা বলিবার মধ্য দিয়া একটা চট্‌পটে, ছিমছাম ভাব প্রকাশ পায়। এই সকল ব্যক্তি অতি সহজে অন্যের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্ভুল দেহভঙ্গি 'smartness'-এর একটি বড় দিক। কুঁজো বা বিকৃত-ভঙ্গির মানুষ কখনও 'smart' হইতে পারে না। এইজন্য অতি শৈশব হইতেই সুষ্ঠু ও সুন্দর ভঙ্গি গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত।

বিকৃত দেহভঙ্গির কারণ—শৈশবে দেহের অস্থিগুলি অত্যন্ত নমনীয় থাকে। পেশীগুলি থাকে কোমল। শিশু একটির পর একটি পেশী আন্দোলন বা movement আয়ত্ত করে মাত্র। এই সময় যদি কুঁজো হইয়া বসা, দাঁড়ান

বা বাঁকিয়া হাঁটা, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ান, কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়ান, ঘাড় বাঁকাইয়া কথা বলা বা অতিরিক্ত হাত-পা নাড়া অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ স্বভাবে পরিণত হয়। এই সময়ে অস্থি ও পেশী নমনীয় থাকে বলিয়া উহারা স্থায়ী ভাবে বাঁকিয়া যায়, ফলে দেহভঙ্গি বিকৃত হয়। যেমন, কেহ যদি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়ায় এবং পিঠ কুঁজা করিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া হাঁটে, তাহা হইলে বক্ষের পেশী ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া যাইবে এবং নমনীয়তা হারাইবে। অপরদিকে পৃষ্ঠের পেশী অত্যধিক প্রসারণের ফলে ক্রমশঃ দুর্বল হইবে এবং উহার সংকোচনশীলতা নষ্ট হইবে। শিরদাঁড়ার অস্থিসন্ধিগুলিতে একদিকে হেলিয়া থাকার প্রবণতা দেখা যাইবে। একবার স্থায়ী ভাবে বিকৃত-ভঙ্গি হইয়া গেলে তাহা দূর করা খুবই কঠিন। বিকৃত-ভঙ্গির ফলে অস্থিসন্ধিগুলিরও ক্ষতি হয়। উহাদের স্বাভাবিক সচলতা নষ্ট হয়। অনবরত সংকুচিত বা অনবরত প্রসারিত হইয়া থাকার ফলে পেশীগুলির সংকোচনশীলতা কমিয়া যাইবে। দাঁড়াইবার ভঙ্গি ঠিক রাখিতে হইলে পা এবং বুক-পিঠের ভঙ্গি ঠিক রাখিতে হইবে। পা ফেলা ঠিক না হইলে পায়ের পাতা চ্যাপ্টা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ পায়ের পাতার যে অংশ মাটিতে থাকে তাহার ভিতরের দিকের বাঁক মাটি হইতে একটু উপরে থাকে। যদি ছোট হইতে পা থ্যাবড়াইয়া হাঁটা অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে ঐ অংশ মাটির সহিত সমান্তরাল হইয়া যায়। এইরূপ 'পা' দেখিতে কদাকার এবং ঐরূপ হাঁটাও দৃষ্টিকটু। হাঁটিবার সময় সম্মুখে মাথা ঝুঁকাইয়া হাঁটিলে ক্রমশঃ পিঠ কুঁজো হইয়া যায়। তাই ঘাড় সোজা রাখিয়া, বুক ও পিঠ পরস্পরের সমান্তরাল রাখিয়া হাঁটা উচিত। দাঁড়াইবার সময় পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলে অথবা কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইলে কিম্বা হাঁটার সময় কোমর বাঁকাইয়া হাঁটিলে দেখিতে অতি কদাকার লাগে। পা দুটির দূরত্ব এমন থাকিবে যাহাতে উহারা পরস্পর ঠিক সমান্তরাল থাকে। কোমর সোজা করিয়া দুই দিকে দুই হাত ঝুলাইয়া দেখিতে হইবে, কোমর দুই বাহুর ঠিক একই স্থানে ঠেকিতেছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকের দাঁড়াইবার বা হাঁটিবার সময় শরীরের একটা দিক অধিক বাঁকিয়া থাকে। এইরূপ হইতে থাকিলে কাঁধটি বাঁকিয়া যাইতে পারে। উন্নত বক্ষে দুই কাঁধ সমান রাখিয়া দাঁড়ানোর অভ্যাস করিলে তবেই কাঁধ সমান ও সুগঠিত হয়।

তাই বলিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ান খুবই খারাপ। দেহভঙ্গি যত সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হইবে ততই দেখিতে ভাল লাগিবে।



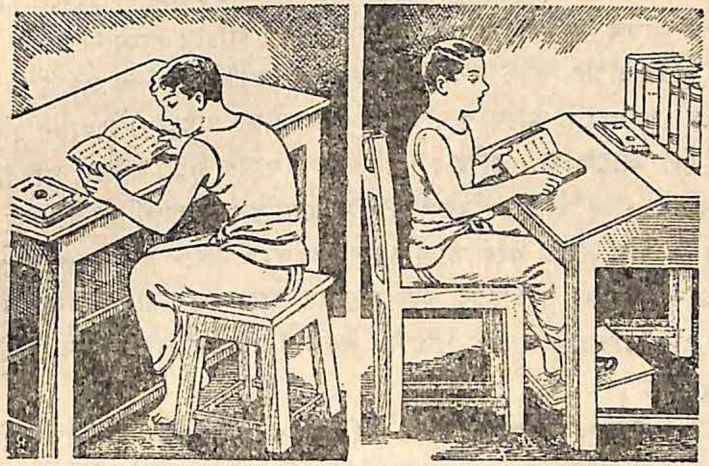
ভুল ভঙ্গি   সঠিক ভঙ্গি

চিত্র ঃ ৭। দাঁড়াইবার ভঙ্গি

দাঁড়াইবার ভঙ্গি—দেহভার যতদূর সম্ভব পায়ের গোড়ালির ও পদপল্লবের অগ্রভাগের উপর ন্যস্ত করিয়া, নিম্নাঙ্গ ঋজু রাখিয়া উন্নত বক্ষে সোজা হইয়া স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

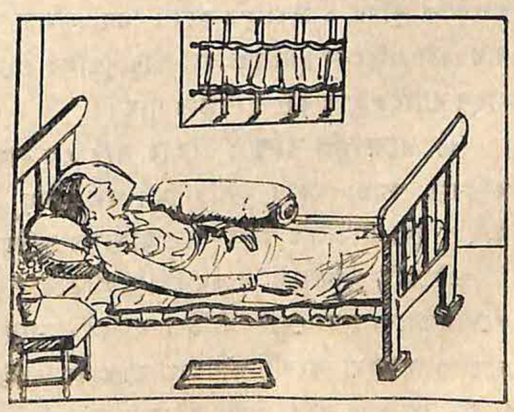
বসিবার ভঙ্গি—ঋষিদের যোগাসনের যে ছবি দেখা যায় তাহাই বসিবার প্রকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যসম্মত ভঙ্গি। ইহার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সর্বাপেক্ষা ভালভাবে হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বা পরিপাক যন্ত্রের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। এইভাবে না বসিয়া শিথিলভাবে থ্যাবড়াইয়া বসিলে তলপেটের পেশী গুটাইয়া থাকে। আবার মাটিতে বসিয়া বই পড়িবার সময় অনেকেই কনুই-এর উপর শরীরের ভর রাখিয়া উপুড় হইয়া আধশোয়া অবস্থায় বসে। ইহাতে পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায়, উদর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ঠিকভাবে হইতে পারে না। যকৃতে এবং পেটের অন্য অংশে পেশী একভাবে জড় হইয়া থাকে। তাহাতে অতি অল্প সময়ে ক্লান্তি আসে, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি দেখা দেয়। তাই সর্বদা সঠিক ভঙ্গিতে বসা উচিত। মাটিতে বসিয়া পড়িবার সময় ঋজু ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া কাঁধ দুটি সোজা করিয়া, ঘাড় সোজা করিয়া, বই হাতে তুলিয়া চোখের সামনে রাখিয়া পড়িতে হইবে। অথবা একটি ডেস্কের উপর বই রাখিয়া সোজা হইয়া বসিতে হইবে। চেয়ার-টেবিলে পড়িবার সময় হাঁটু চেয়ারের উপর থাকিবে, নীচে ঝুলিয়া থাকিবে না। পায়ের পাতা মাটিকে স্পর্শ করিবে,

আশ্রয়চ্যুত হইয়া ঝুলিবে না। পিঠ চেয়ারের পিঠের সহিত সমান্তরালভাবে থাকিবে। লিখিবার সময়ও যতদূর সম্ভব এই ভঙ্গিতে বসিয়া লিখিতে হইবে।



ভুল ভঙ্গি সঠিক ভঙ্গি
চিত্র : ৮। বসিবার ভঙ্গি

শুইবার ভঙ্গি—ঝুলিয়া পড়া খাটিয়া বা অতিরিক্ত নরম শয্যা, যাহাতে শরীরের মধ্যাংশ ঢুকিয়া যাইবে, সেইরূপ শয্যায় শয়ন করিলে আপনা হইতে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়। ঠিক তেমনি কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া, জড়সড় হইয়া শুইলে বা উপুড় হইয়া শুইলে শ্বাসক্রিয়া এবং রক্ত চলাচলে বাধা স্থষ্টি হয়। শিরদাঁড়া সোজা রাখিয়া হাত-পা শিথিল করিয়া চিৎ হইয়া বা এক পাশে ফিরিয়া নিদ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত।



চিত্র : ৯। শুইবার সঠিক ভঙ্গি

স্বাস্থ্যের উপর সূর্যালোকের প্রভাব

জীব-জগতের উপর সূর্যালোকের প্রভাব অপরিমিত। ইহা প্রাণশক্তিদায়ক। তাই সূর্যরশ্মিকে শক্তিরশ্মি বলা হয়। সূর্যালোক না পাইলে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপাখী, বৃক্ষলতা কিছুই বাঁচিতে পারে না।

সূর্যের রশ্মির তিনটি দিক আছে এবং ঐ তিনটিই জীব-জগতের উপকারে লাগে। যথা—(১) আলোক রশ্মি, (২) উত্তাপদায়ক রশ্মি, (৩) রঙ্গোত্তর রশ্মি।

(১) আলোক রশ্মি: পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিয়া পৃথিবীতে জীবনের সাড়া জাগায়। বৃক্ষলতাদি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসিলে বৃক্ষের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করে তাহা মানব-জগতেরও প্রধান খাদ্য। ঐ শ্বেতসার খাদ্য না খাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া আলোক রশ্মির প্রভাবেই পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয় এবং মানুষ কর্মমুখর হইয়া উঠে।

(২) উত্তাপ রশ্মি: প্রখর সূর্যালোকে মাটি শুকাইয়া যায়। সমস্ত আবর্জনা শুকাইয়া যাওয়ায় রোগজীবাণুগুলিও শুকাইয়া মরিয়া যায়। সূর্যালোক না থাকিলে কীট-পতঙ্গ এবং জীবাণু সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া যায়। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ষাকালে। বর্ষাকালে সূর্যতাপ কম থাকে বলিয়া যেমন কীট-পতঙ্গের উৎপাত বাড়ে তেমনই বাড়ে জীবাণুদের সংখ্যা। দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া যায়। বর্ষার শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইলে পর্যাপ্ত সূর্যের আলোক ভূমির আর্দ্রতা দূর করে। পচা, গলিত পদার্থগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় এবং পরিবেশ দুর্গন্ধমুক্ত হয়, জীবাণুগুলির প্রকোপ কমিয়া যায়। ক্রমশঃ মানুষ ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পায়।

(৩) রঙ্গোত্তর রশ্মি: ইহার আর এক নাম স্বাস্থ্যরশ্মি। জীবাণু নাশ করিবার ক্ষমতা ইহার অপরিসীম। জল, বায়ু এবং মাটির জীবাণু নাশ করিয়া ইহা আমাদের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে।

এই রশ্মি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় এবং পরোক্ষভাবে সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে। ইহা দৈহিক গঠনেও সাহায্য করে। ক্ষীণকায় ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিরা যদি নিয়মিত প্রভাত সূর্যালোকে ভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

সুস্থ, সবল মানুষ যদি খানিকক্ষণ করিয়া সূর্যালোক সেবন করে তাহা

হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সর্দি, কাশি, স্নায়ুরোগ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের পক্ষে সূর্যালোকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রাচীন কালে সূর্য-চিকিৎসার প্রচলন ছিল। কুষ্ঠ রোগ পর্যন্ত সূর্য চিকিৎসায় আরাম হইত।

রঙ্গোত্তর রশ্মির প্রভাবে আমাদের দেহচর্মের নিম্নে মেদস্তরে ভিটামিন D প্রস্তুত হয়। দেহমেদে কোলেস্টেরল থাকে। রঙ্গোত্তর রশ্মির প্রভাবে উহার রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া ভিটামিন D-এ পরিণত হয়। অস্থি প্রস্তুতের জন্য ইহা অপরিহার্য।

সূর্যরশ্মির প্রভাবে দেহচর্মের বর্ণকোষগুলির মধ্যে রঞ্জক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাই গাত্রবর্ণ সৃষ্টি করে। যে সকল দেশের মানুষ প্রচুর সূর্যালোক পায় না তাহাদের গাত্রবর্ণে বৈচিত্র্য নাই।

অধিক সূর্যতাপের কুফল—(১) সূর্যতাপ উপকারী, কিন্তু ইহা অতিরিক্ত লাগাইলে দেহচর্ম রুক্ষ ও খসখসে হইয়া যায়। (২) প্রখর সূর্যালোকে চক্ষুমণির রড্স নামক কোষগুলি ঝলসাইয়া যায়। অন্ধকারে উহা পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ লাগাইলে ক্ষতি অপূরণীয় হইয়া উঠে। এই কারণেই সূর্যালোকে চাহিবার পর অন্যদিকে চাহিলে অন্ধকার লাগে। রৌদ্রে বেশীক্ষণ থাকিতে হইলে রঙ্গিন চশমা ব্যবহার করা উচিত। ৩। অধিক রৌদ্রে অতিরিক্ত উত্তাপে 'সান্স্ট্রোক' (sun stroke) বা সর্দিগর্মি হইতে পারে।

সকাল ও বিকালের রৌদ্রে বেড়ানই ভাল। ঐ সময়ের রৌদ্রেই রঙ্গোত্তর রশ্মি থাকে।

নির্মল বায়ুর প্রয়োজন

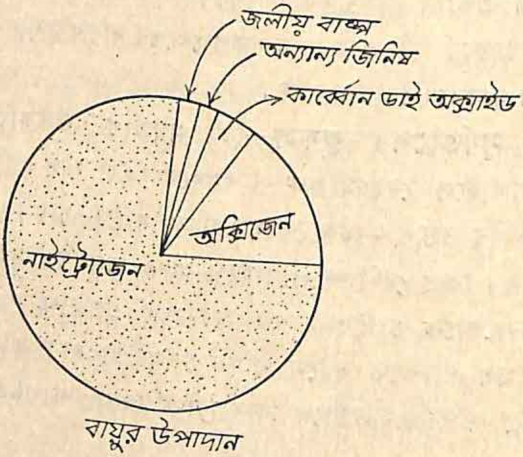
(Importance of fresh air)

মানুষ বায়ু-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছে। পৃথিবীর উপর ২০০ মাইল পর্যন্ত ঘন বায়ুর স্তর বর্তমান। আর এই বায়ুস্তরের মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রাণী, বৃক্ষলতাদি ও মানুষ জীবিত আছে। বায়ু আছে বলিয়াই মানুষ বাঁচিয়া আছে। বায়ুই মানুষের প্রাণ, কারণ ইহা না থাকিলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সম্ভব হইত না। তাই বায়ুকে প্রাণবায়ু বলিলে ভুল হয় না।

বায়ুর উপাদান—অক্সিজেন (O_2) এবং নাইট্রোজেন (N_2) নামক

দুইটি গ্যাসই বায়ুর প্রধান উপাদান। ইহা ভিন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাসও বায়ুতে বর্তমান। এই সকল গ্যাস হইল বায়ুর সাংগঠনিক বা রাসায়নিক উপাদান। এইগুলি ছাড়াও বায়ুর কতকগুলি ভৌত উপাদান আছে—যেমন জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, নানাপ্রকার জীবাণু প্রভৃতি। এইগুলি বাতাসের সহিত উড়িয়া বেড়ায়।

উন্মুক্ত স্থানের বায়ুর উপাদান



চিত্র : ১০। বায়ুর উপাদান

অক্সিজেন—২০·৬০
নাইট্রোজেন—৭৭·১৬
কার্বন ডাই-অক্সাইড—·০৪

জলীয় বাষ্প—১·৪০
উত্তাপ—৬৫° ফারেনহাইট
নিষ্ক্রিয় গ্যাস—·৮০ ভাগ

এছাড়া রোগজীবাণু থাকে না এবং ধূলিকণা সামান্য থাকে।

দূষিত বায়ু—বায়ুর উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন (O_2) আমাদের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বায়ু দূষিত হইলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বর্ধিত হয়। রোগ জীবাণু, জলীয় বাষ্প এবং উত্তাপ বাড়ে। এইরূপ বায়ু প্রাণরক্ষার পরিবর্তে প্রাণনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বায়ু দূষিত হইবার কারণ—বায়ু দূষিত নানা কারণে হইতে পারে। যেমন—(১) নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস দ্বারা, (২) বৃক্ষলতাদির দ্বারা, (৩) ধূলিকণার দ্বারা, (৪) জৈব এবং অজৈব পদার্থের চূর্ণ দ্বারা, (৫) ধূম্র দ্বারা, (৬) দূষিত গ্যাস দ্বারা ও (৭) আগুন দ্বারা।

(১) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা :—প্রশ্বাস বায়ুর O_2 গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাস বায়ুতে CO_2 ও জলীয় বাষ্প এবং অন্য বর্জ্য পদার্থ প্রদান করে। তাই বদ্ধ ঘরে ক্রমশঃ অক্সিজেনের মাত্রা কমিতে থাকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও আর্দ্রতা বাড়িতে থাকে। রোগ জীবাণুর পরিমাণও বাড়ে। অক্সিজেনের পরিমাণ ৭%-এ নামিলে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৩০% হইলে ঐ বায়ু মানুষের প্রাণঘাতী হয়। তবে উপাদানের এইরূপ পরিবর্তন সহজে হয় না। অক্সিজেনের মাত্রা ১২% নামিলেই উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

ক্রমান্বয়ে দূষিত বায়ু সেবন করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বদ্ধ ঘরে অধিকক্ষণ থাকিলে মানুষের শ্রান্তি আসে ; কর্মক্ষমতা কমিয়া যায়।

(২) বৃক্ষলতাদি দ্বারা :—গাছপালাগুলি রাত্রে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ফলে বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৩) ধূলিকণার দ্বারা :—বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় অসংখ্য ধূলিকণা থাকে। উহার সহিত রোগজীবাণু থাকে। তাই বায়ু দূষিত হয়।

(৪) জৈব ও অজৈব পদার্থের চূর্ণ দ্বারা :—গয়ের, থুথু, মলমূত্র, পশুপাখী, কীটপতঙ্গাদির মৃতদেহ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। ইহাদের মধ্যেও অসংখ্য রোগজীবাণু থাকিতে পারে।

(৫) ধূম্র দ্বারা :—ধূম্রের সহিত ধাতব রেণু, উদ্ভিজ্জ পদার্থের আঁস প্রভৃতি থাকে। ধূম্র বায়ুতে মিশিলে বায়ু দূষিত হয়।

(৬) দূষিত গ্যাস দ্বারা :—নরদমা, সুয়ার, ভাগাড় প্রভৃতি হইতে দূষিত গ্যাস বাহির হয়, উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং প্রাণী-দেহ পচিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়, কারখানা-অঞ্চলের বায়ুতে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে—এই সবগুলিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং বায়ুর সহিত এই গ্যাসগুলি মিশিলেই বায়ু দূষিত হয়।

(৭) আগুন দ্বারা :—আগুন জ্বলিলে সেই স্থানের বায়ুর অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই উনুন বা ফার্নেসের নিকটস্থ বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে।

বায়ুবাহিত ব্যাধি—নির্মল বায়ু যেমন প্রাণস্বরূপ, দূষিত বায়ু তেমনই প্রাণনাশী। দূষিত বায়ু রোগজীবাণু বহন করে এবং রোগ বিস্তার ঘটায়। সর্দিকাশি, ডিপথিরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত, পোলিও প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণুগুলি বায়ু দ্বারা সংক্রামিত হয়।

বায়ু বিশোধন—বদ্ধ বায়ু দূষিত। উন্মুক্ত স্থানের প্রবহমান বায়ু কখনও দূষিত হইতে পারে না। সুতরাং বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক কারণেও বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। দুই উপায়ে বায়ু বিশুদ্ধ হয়—(১) স্বাভাবিক এবং (২) কৃত্রিম উপায়ে।

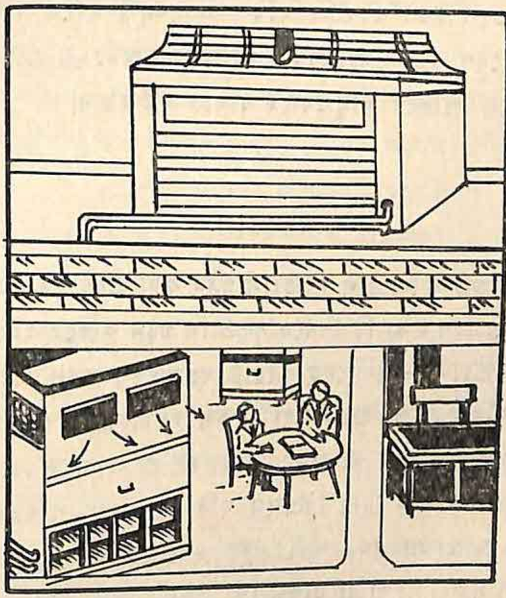
স্বাভাবিক উপায়ে বায়ু বিশোধন :—ঝড় হইলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, বদ্ধ দূষিত বায়ু নির্মল হয়, বায়ুর উত্তাপ হ্রাস পায়। বৃষ্টি হইলে বায়ুতে ভাসমান কঠিন চূর্ণ পদার্থ জলে ভিজিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। দিনের বেলা বৃক্ষলতাদি বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে বায়ুস্থ রোগজীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃক্ষলতাদি—যেমন নিম, নিশিন্দা, তুলসী প্রভৃতিও বায়ুর রোগজীবাণু ধ্বংস করে। বজ্রপাত হইলে বিশুদ্ধ ওজন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহা বায়ুর সর্বপ্রকার জৈব পদার্থ ধ্বংস করে এবং দুর্গন্ধ দূর করে।

কৃত্রিম উপায়ে বায়ু বিশোধন :—বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া এবং কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য লইয়া কৃত্রিম উপায়ে বায়ু নির্মল করিতে পারা যায়।

বায়ু-সঞ্চালন—রুদ্ধ স্থানের দূষিত বায়ুকে কৃত্রিম উপায়ে প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থাকে বায়ু-সঞ্চালন বলা হয়। এই দিক দিয়া কেবলমাত্র রুদ্ধ কক্ষের বা স্থানের ক্ষেত্রেই বায়ু-সঞ্চালন কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু বিস্তারিত অর্থে বাড়ীর বাহিরে যাহাতে অবাধ বায়ুপ্রবাহে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না হয় সেই ব্যবস্থাকেও বায়ু-সঞ্চালনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আভ্যন্তরীণ বায়ু-সঞ্চালন :—যে কোন কক্ষে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে হইলে ঐ কক্ষে বড় বড় রুজু রুজু জানালা রাখিতে হইবে।

দেওয়ালের উপর দিকে হাওয়া-ঘুলঘুলি রাখিতে হইবে। কক্ষের উত্তপ্ত দূষিত বায়ু ঐ হাওয়া-ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আর বাহিরের শীতল বায়ু জানালা দিয়া প্রবেশ করিবে। বায়ুর আর্দ্রতা এবং উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে প্রবহমানতা হ্রাস পায়। বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে তখন বায়ুকে তাড়িত করিয়া বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করা যায়। যেখানে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা সম্ভব নহে সেখানে হাত-পাখা বা টানা-পাখারও ব্যবস্থা করা যায়। অতিরিক্ত জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বা সিনেমা হলে বায়ু-নিষ্কাশক পাখার সাহায্যে ভিতরের বদ্ধ উত্তপ্ত বায়ু বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দেওয়ালের নীচের দিকে বায়ু প্রবেশ করানর জন্য বড় বড় হাওয়া-ঘুলঘুলি বা গর্ত থাকে। এ ছাড়া 'air cooler' বা 'air conditioning' মেশিনের সাহায্যেও বায়ুর ভৌত



চিত্র নং : ১১
এয়ার কণ্ডিশানিং মেশিন

উপাদানগুলির পরিবর্তন করিয়া উহাকে শ্বাসগ্রহণের উপযোগী করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত দূষিত বায়ুকে শীতল জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া শীতল করা হয়। জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ধূলাবালি-সহ জীবাণু ভিজিয়া পড়িয়া যায়। তারপর একটি নলের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত

করিয়া বাড়তি আর্দ্রতা শুষিয়া লওয়া হয়। কক্ষের মেঝের নিকটে ঘুলঘুলি দিয়া ঐ বায়ু প্রবেশ করান হয়। বায়ু-নিষ্কাশক পাখার সাহায্যে ঘরের ভিতরের বায়ুকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

বাহিরের বায়ু-সঞ্চালন—আভ্যন্তরীণ বায়ু-সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে হইলে কক্ষে বায়ু প্রবেশে যাহাতে কোন বাধা স্থষ্টি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন, জানালার নিকট কোন গাছ বা বড় বাড়ী থাকিবে না। দুইটি বাড়ীর মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ হইতে ৩০০ মিটার (৮′ হইতে ১০′ ফুট) ফাঁকা জমি থাকিবে। কতকগুলি বাড়ী অতিরিক্ত উঁচু এবং কতকগুলি নীচু হইলে একতলা বাড়ীগুলিতে বায়ু-সঞ্চালন ভাল হয় না। রাস্তার উপর বাড়ীগুলি সমকোণ স্থষ্টি করিলে এবং সমান্তরাল হইলে বায়ু-সঞ্চালন ভাল হয়। ঘরগুলি দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হইলে বাহিরের মুক্ত-বায়ু অধিক প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি বাড়ীতে অন্ততঃ ১/৩ অংশ জমি ফাঁকা ফেলিয়া রাখিলে বাহিরে বায়ুপ্রবাহে বাধার স্থষ্টি হয় না।

সদভ্যাস

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি সদভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। শ্রম, ব্যায়াম, নিদ্রা, স্নান, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সদভ্যাস গঠন করিতে হইবে।

শ্রমের অভ্যাস—মানবদেহ বিরাট যন্ত্রস্বরূপ। অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যন্ত্রে মরিচা পড়ে, ক্রমে উহা বিকল হইয়া যায়। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি নিয়মিত সঞ্চালন করা না যায়, তাহা হইলে মানুষ অকালে কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। আবার বিনা বিশ্রামে যদি অহোরাত্র পরিশ্রম করা যায়, তাহা হইলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। শরীর সুস্থ ও সুন্দর রাখিতে হইলে শ্রম ও বিশ্রামের মধ্যে সমতা থাকা প্রয়োজন।

যে কোন প্রকার পেশী সঞ্চালনকে শ্রম বলা যাইতে পারে। আরও ভালভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে-কাজের জন্য কর্মশক্তি ক্ষয় হয় তাহাই শ্রম। চিন্তা, ভাবনা, আগ্রহ, মনোযোগ প্রভৃতি মানসিক কাজ-গুলির জন্য কোনরূপ ক্যালরি প্রয়োজন হয় না, তাই ইহাদের ঠিক দৈহিক শ্রমের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

জন্মের পর হইতে মানুষ পরিশ্রম করিতে শুরু করে। অতি শৈশবে হাত-পা নাড়া, খেলাধূলার মধ্য দিয়া পেশী সঞ্চালন হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতির মধ্য দিয়া পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে। বার্ধক্যে ক্রমশঃ শ্রমের পরিমাণ কমিয়া যায়।

ব্যায়াম—নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশী সঞ্চালনকে ব্যায়াম বলা হয়। সকলে পরিশ্রম করিলেও ব্যায়ামের সুযোগ সবাই পায় না। কিন্তু ব্যায়ামেরও প্রয়োজন আছে। যে সকল ব্যক্তি বসিয়া কাজ করে, তাহাদের শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয় না, তাহাদের ব্যায়াম করা প্রয়োজন। এছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার কাজ করে। যেমন—কেহ পাথর ভাঙে, কেহ সাইকেল-রিকসা চালায় প্রভৃতি। যে পাথর ভাঙে তাহার একটি হাতের ও এক দিকের কাঁধ ও এক দিকের বুক-পিঠের পেশী সঞ্চালিত হয়। আবার যে সাইকেল-রিকসা চালায়, তাহার পায়ের পেশীগুলি অধিক সঞ্চালিত হয়, দেহের অন্যান্য পেশীগুলির সঞ্চালন কম হয়। ব্যায়াম করিলে দেহের প্রত্যেকটি ছোট-বড় পেশী সমভাবে সঞ্চালিত হয়। তাই প্রাত্যহিক শ্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যায়ামের অভ্যাসও গঠন করা প্রয়োজন।

ব্যায়াম ও খেলাধূলার প্রয়োজন—

(১) ব্যায়াম অথবা খেলাধূলার মধ্য দিয়া নিয়মিত পেশী সঞ্চালনের ফলে পেশীগুলির সুষম বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেকটি পেশী সমভাবে দৃঢ় ও সবল হয়।

(২) দেহে বাড়তি মেদ জমিতে পারে না। শরীরটি সুন্দর, সৌষ্ঠবপূর্ণ এবং মজবুত হয়।

(৩) দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতা কাটিয়া যায় এবং হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে।

(৪) নিয়মিত ব্যায়াম অথবা খেলাধূলা করিলে কর্মশক্তি বাড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে সাবলীলতা আসে। মানুষ কর্মতৎপর হয়, সহজে ক্লান্ত হয় না।

(৫) ব্যায়ামের বা খেলাধূলার সময় রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয়। প্রত্যেকটি পেশীতে রক্তসঞ্চালন ভাল হয়, হৃৎপিণ্ড দৃঢ় হয়। ব্যায়ামের সময় শ্বাস-গতিও বাড়ে। নিয়মিত এইরূপ চলিতে থাকিলে দম বাড়ে এবং দেহ-যন্ত্রগুলিও সবল হইয়া উঠে।

(৬) দ্রুত রক্তসঞ্চালন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রত্যেকটি দেহকোষ অধিক পরিমাণে খাদ্যপুষ্টি ও অক্সিজেন পায়। তাহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

(৭) পরিশ্রম করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

(৮) কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ ত্রুটি থাকিলে ব্যায়াম করিলে তাহা ক্রমশঃ শোধরাইয়া যায়।

(৯) নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত খাটিবার ক্ষমতা থাকে।

(১০) ব্যায়াম করিলে চর্ম ও কিডনীর কাজ ভাল হয়। ঘর্ম ও প্রস্রাব অধিক নিঃসৃত হয় বলিয়া দেহের ক্লেদ নিঃসরণ ভাল হয়।

(১১) স্নায়ুর কাজ ভাল হয়। রাত্রে ভাল ঘুম হয় বলিয়াই স্নায়ুগুলি সতেজ ও স্নিগ্ধ থাকে। ব্যায়াম ও খেলায় কেবল শরীর নহে, মনেরও বিকাশ হয়। সুস্থ শরীরই সুস্থ মনের বাসস্থান। উপরন্তু সংগঠিত খেলাধূলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়; অনুকরণ, কল্পনাশক্তি, গঠন-প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। দলবদ্ধ, সংগঠিত খেলার সময় দলের সহিত সহযোগিতা এবং বিপক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। ইহার মধ্য দিয়া ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি সমাজ-বৃত্তির বিকাশ হয়। খেলাধূলার নিয়ম মানিতে গিয়া শিশু নিয়মানুবর্তী হয়। নেতৃত্ব করিবার এবং নেতৃত্ব মানিবার অভ্যাস হয়। সমাজ-জীবনে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার জন্য এই সকল গুণ বিশেষ প্রয়োজন।

ব্যায়াম করিবার নিয়ম—

(১) ব্যায়ামের মূল শর্তই হইল ইহা যেন চিত্তগ্রাহী হয়। যাহা ভাল লাগে না তাহা জোর করিয়া বেশী দিন করা যায় না। এইজন্য ব্যায়াম খেলাধুলার মধ্য দিয়া সংগঠিতভাবে হইলে ভাল হয়।

(২) ব্যায়ামের মাত্রা ও প্রকার স্থির করিতে হইবে যে-ব্যক্তি ব্যায়াম করিবে তাহার শারীরিক অপুষ্টি বা বিশেষ ত্রুটি, সাধারণ স্বাস্থ্য ও দৈনিক শ্রমের পরিমাণ বিচার করিয়া। ইহা স্থির করিবেন কোন ব্যায়ামবিদ্। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা জানিতে চাওয়া উচিত নহে।

(৩) ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিবার পর ধীরে ধীরে উহার মাত্রা বাড়াইতে হয়। হঠাৎ অধিক পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়।

(৪) ব্যায়ামের সহিত খাদ্য ও বিশ্রামের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য জোটে না তাহাদের অধিক পরিশ্রম করা উচিত নহে। আবার যাহাদের কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, বিশ্রামের অবকাশ কম, তাহাদের অধিক ব্যায়াম করা উচিত নহে। অপর পক্ষে যাঁহারা মাথার পরিশ্রম করেন এবং শারীরিক পরিশ্রম কম করেন, তাঁহাদের নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত।

(৫) ব্যায়াম পরিমিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সকল অঙ্গের ব্যায়াম করা উচিত। একটি অঙ্গের ব্যায়াম করিলে দেহের গঠন সামঞ্জস্য-হীন হয়। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলেও দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে।

(৬) ব্যায়াম নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে করা উচিত। তাহা হইলে সহজেই উহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়।

(৭) ব্যায়ামের সরঞ্জাম লইয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া পেশী গঠন করিবার পর দেহ যখন হালকা হইয়া যায়, তখন আর ঐরূপ ব্যায়াম না করিয়া টেনিস খেলা, দাঁড় টানা, সাঁতার কাটা, নৃত্য ও অন্যান্য খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর-চর্চা করা ভাল। ঐ অভ্যাস বহুদিন পর্যন্ত মানুষ রাখিতে পারে।

(৮) ব্যায়াম প্রাতঃকালে, আর না হয় সন্ধ্যায় করিতে হয়। ঐ সময় আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে, শ্রমে কষ্ট হয় না।

(৯) উন্মুক্ত স্থানে, হালকা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ব্যায়াম করিতে হয়। কারণ ব্যায়ামের সময় দ্রুত রক্তসঞ্চালন হয় এবং প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। উন্মুক্ত স্থানে অক্সিজেনের অভাব হয় না। সংক্ষিপ্ত পোশাক রক্তসঞ্চালনে বাধা দেয় না। ইহাতে অঙ্গ সঞ্চালনেরও সুবিধা হয়।

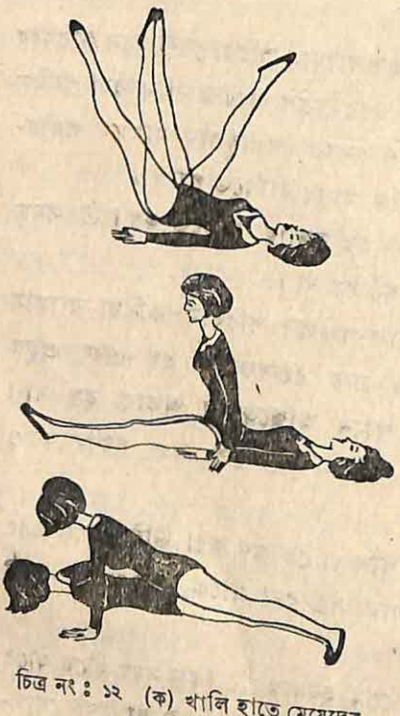
(১০) ব্যায়ামের পূর্ব মুহূর্তে কিছু পান বা ভোজন করা উচিত নহে এবং পর মুহূর্তে স্নান করিলে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। খাওয়ার পরেই বেশী পরিশ্রম করিলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

(১১) ব্যায়ামের এক-একটি ধাপ শেষ হইবার পর কিছু সময় ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে হয়। ইহাতে পেশীগুলি বিশ্রাম পায়। ঐ কারণেই যোগ-

ব্যায়ামে প্রত্যেকটি আসনের পর একবার করিয়া শবাসন করা হয়। শরীরের পেশীগুলি শিথিল করিয়া শুইয়া পড়িলে উহারা উপযুক্ত বিশ্রাম পায়।

অতি-ব্যায়ামের কুফল—প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে দেহের দ্রুত ক্ষয় হয় এবং সেই ক্ষয় পূরণ হইবার সুযোগ হয় না, দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। ঐ কারণেই ক্রীড়াবিদ ও ব্যায়ামবিদদের (athlete) স্বাস্থ্য অনেক সময় দ্রুত ভাঙিয়া যায়। তাঁহারা পেশী গঠনের জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করেন কিন্তু সেই অনুপাতে যথেষ্ট খাদ্য খাইতে পান না এবং ব্যায়ামের মাত্রাও বেশীদিন সমানভাবে চালাইতে পারেন না। ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

বয়সোপযোগী ব্যায়াম—সকল বয়সের পক্ষে সকল ব্যায়াম উপযুক্ত নহে। জন্মের পর হইতে প্রত্যেকটি পেশী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ও পরিণতি লাভ করে। পেশীগুলি তখন ক্রমশঃ কর্মক্ষম হইয়া উঠে। এই বৃদ্ধির ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যায়াম স্থির করিতে হইবে।



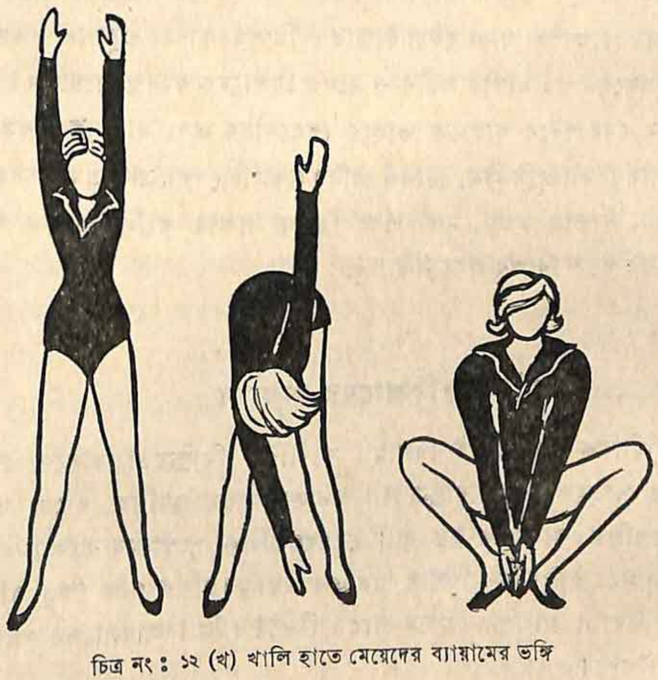
চিত্র নং : ১২ (ক) খালি হাতে মেয়েদের ব্যায়ামের ভঙ্গি

(১) শৈশব :—সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের খেলাই ব্যায়াম। উন্মুক্ত স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহারা যত খেলা করিবে, দেহ-মনের বিকাশ তত সুষ্ঠু হইবে।

(২) বাল্য :—সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের কিছু কিছু ব্যায়াম খেলার ছলে শেখানো উচিত। কারণ এই বয়স হইতে পেশীগুলির ছন্দোবদ্ধ সুষম বিকাশ হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমশঃ সুগঠিত হইয়া উঠে। সমবেত ড্রিল, ব্রতচারী বা অন্য কোন স্থানীয় লোকনৃত্য, দলবদ্ধ খেলা—এই বয়সের উপযোগী ব্যায়াম। কপাটি, চোর-পুলিশ, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা

এবং খালি হাতে ব্যায়াম (free hand exercise), বিভিন্ন প্রকার যোগাসন বালক-বালিকাদের শেখানো উচিত। সাঁতার কাটা, দোল খাওয়া ইত্যাদি বেশ উপযোগী ব্যায়াম। একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যতদূর সম্ভব দলবদ্ধভাবে বালক-বালিকাদের খেলাধূলা বা ব্যায়াম করিতে দিলে ভাল হয়, কারণ তাহাতে তাহাদের শুধু শরীরই সুগঠিত হয় না, মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিও বিকশিত হয়। বিশেষ করিয়া সমাজবৃত্তিগুলির বিকাশের বয়সও ইহাই। এই কারণেই ছেলেমেয়েরা এই বয়সে বড় দল করিয়া খেলিতে চায়। তাই দলগত খেলা ও ব্যায়াম তাহাদের অধিক আনন্দোৎপাদন করে।

(৩) কৈশোর :—পনের হইতে পঁচিশ বৎসরের কিশোর-কিশোরীদের ব্যায়ামের মাত্রা আরও বাড়িবে। ষোল-আঠারো বৎসর বয়স হইতে উহারা যন্ত্রপাতি লইয়া ব্যায়াম করিবে। ডন দেওয়া, বৈঠক দেওয়া, বারে উঠা, রিং



চিত্র নং : ১২ (খ) খালি হাতে মেয়েদের ব্যায়ামের ভঙ্গি

করা, ডাম্বেল ও গদা লইয়া ব্যায়াম করা ইত্যাদি এই বয়সের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এছাড়া ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা,

টেনিস, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাও এই বয়সের উপযোগী। এই বয়সেই মানুষের দেহের ও মনের চরম বিকাশ হইয়া থাকে। তাই এমনভাবে ব্যায়াম করিতে হয় যাহাতে সেই বিকাশ ঠিকমতো হইতে পারে। এইজন্য যে-সমস্ত খেলা মনের তৎপরতা বাড়ায়, মনে সাহসের সঞ্চার করে, আত্মবিশ্বাস আনিয়া দেয়, সেই সমস্ত খেলা করা উচিত। যেমন—লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসুর প্যাঁচ শেখা, কুস্তি লড়িতে শেখা ইত্যাদি। ঐ সকল ব্যায়াম সাধারণভাবে ছেলে ও মেয়ের উপযোগী হইলেও, সাধারণতঃ উহাদের মধ্যে যেগুলি কম পরিশ্রমের সেইগুলিই মেয়েদের করা উচিত। যন্ত্র লইয়া ব্যায়াম করা মেয়েদের উচিত নহে। তাহাতে মেয়েদের কমনীয়তা কমিয়া যায়, চেহারা পুরুষালী হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন মেয়েদের এই বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয়। তাহাদের মা হইতে হয়। তাই কঠিন শ্রমকারী খেলা বা যন্ত্র লইয়া ব্যায়াম করিলে তাহাদের শারীরিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুস্থ মাতৃত্বের পক্ষে ইহা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষ করিয়া ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণ এবং প্রসবের পর নারীর শরীর ও মনের বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। নারীর ব্যায়াম এমন হইবে যাহাতে তাহার দেহসৌষ্ঠব এবং নারীসুলভ কমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা, দ্রুত ভ্রমণ, পদচালনা, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, নৃত্য এবং বিভিন্ন প্রকার খালি হাতের ব্যায়াম নারীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশ্রামের অভ্যাস

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তাই বিশ্রাম। শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বলিতে বোঝায় দেহের বহিরঙ্গগুলির নিষ্ক্রিয়তা। যতক্ষণ মানুষ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ হয় না। দেহযন্ত্রগুলিও পূর্ণোদ্যমে চলে। একমাত্র নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়গুলি বিশ্রাম পায় এবং দেহযন্ত্রগুলির গতি কিছু পরিমাণে কমে, উহারা আংশিক বিশ্রাম পায়। নিদ্রাই হইল বিশ্রামলাভের সর্বাপেক্ষা ভাল উপায়।

বিশ্রামের প্রয়োজন—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন শ্রম ও ব্যায়ামের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আছে বিশ্রামেরও।

(১) শ্রমের সময় দেহে যে ক্ষয় হয় বিশ্রামের সময় তাহা পূরণ হয়। বিশ্রাম না লইলে স্বভাবতঃই দেহের পুনর্গঠন হইতে পারে না। ফলে পেশীগুলি হীনবল ও অপুষ্ট হয়।

(২) ব্যায়াম বা শ্রমের সহিত রক্তে যে অম্লাক্ত পদার্থের (পাইরুভিক অ্যাসিড) পরিমাণ বাড়ে বিশ্রামের সময় তাহা দূর হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উহার (অম্ল পদার্থের) যে বিপাকীয় ক্রিয়া হয় তাহার দ্বারা দেহে উত্তাপ উৎপন্ন হয় এবং কর্মশক্তি সৃষ্টি হয়। তাই বিশ্রামের দ্বারা শ্রমের ক্লান্তি দূর হইয়া নব কর্মোদ্যম সৃষ্টি হইতে পারে।

(৩) শ্রমের সময় প্রত্যেকটি দেহযন্ত্র দ্রুতগতিতে কাজ করে। নিদ্রার সময় ইহারা বিশ্রাম পায়। সুনিদ্রা না হইলে দেহযন্ত্রগুলি বিশ্রাম পায় না। অতি-শ্রমে উহারা অকালে শক্তি হারায়।

(৪) শ্রমের সময় স্নায়ুকোষগুলির লৌহ-উপাদান খরচ হইয়া যায়। বিশ্রামের সময় রক্ত হইতে কোষগুলি উহা পুনরায় আহরণ করে। বিশ্রাম না লইলে বা সুনিদ্রা না হইলে স্নায়ুকোষ পুনর্গঠিত হইতে পারে না। ফলে ক্লান্তি দূর হয় না।

(৫) নিদ্রার ফলে মনও বিশ্রাম পায়। নিদ্রার দ্বারা বহু দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, শোক-দুঃখের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

(৬) নিদ্রার দ্বারা মন সতেজ ও প্রফুল্ল হয়। দেহ ভারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটিও ভারমুক্ত মনে হয়।

বিশ্রামের নিয়ম

(১) নিদ্রাই হইল সর্বাপেক্ষা ভাল বিশ্রাম। ইহা ছাড়া শুইয়া বা বসিয়া থাকাও বিশ্রামের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্ক মানুষেরই দিনে ৭/৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে এই সময় ১০/১২ ঘণ্টা হইলে ভাল হয়।

(২) রাত্রের পূর্ণ বিশ্রাম বা নিদ্রা ছাড়া একটানা কাজের মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিলে কর্মক্ষমতা বাড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ৩/৪ ঘণ্টা কাজ করিবার পর বিশ্রাম লইলে যে-পরিমাণ কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার হয়, ১ হইতে ২ ঘণ্টা কাজ করার পর অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইলে তদপেক্ষা অনেক দ্রুত কর্মক্ষমতা ফিরিয়া আসে। তাই অনেকক্ষণ কাজ করিয়া বেশীক্ষণ বিশ্রাম লওয়া অপেক্ষা খানিকক্ষণ অন্তর অল্প বিরতি দেওয়া ভাল।

(৩) বিশ্রামের সময় শরীরের মতো মনটিকে সর্বপ্রকার উত্তেজনা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি দিতে হয়। ভারাক্রান্ত চিত্তে, দুশ্চিন্তা লইয়া নিদ্রা যাইলে সকালে উঠিয়া মনে হয় শরীর ক্লান্ত।

(৪) নিদ্রা যাইবার পূর্বে বিশ্রামের জন্য শরীর-মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। হাত, পা, ঘাড়, কান ইত্যাদিতে জল দিয়া, ঢিলা-ঢালা পোশাক পরিয়া, মনকে সমস্ত রকম ভাবনা চিন্তার হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার পরই নিদ্রার আয়োজন করিতে হয়।

(৫) শয্যা ও ঘরের পরিবেশ সুনিদ্রার উপযোগী হওয়া উচিত। বদ্ধ ঘরে কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ও খারাপ।

(৬) শুইবার ভঙ্গি সঠিক হওয়া প্রয়োজন। উপুড় হইয়া বা কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া শুইলে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যের অসুবিধা হয়। এক পাশ ফিরিয়া, সমস্ত হাত-পা এলাইয়া সোজা সহজ ভঙ্গিতে শুইতে হয়।

(৭) প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় নিদ্রা যাইতে হয়। নিদ্রা যাইবার পূর্বে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা, বা অতি হুল্লোড় করা কোন মতেই উচিত নয়, কোন রকম উত্তেজনাপূর্ণ বই পড়া নিষিদ্ধ। তাহাতে স্নায়ু উত্তেজিত হয়। সহজে ঘুম আসিতে চায় না।

বয়স অনুযায়ী নিদ্রার প্রয়োজন :—

	বয়স	ঘুমের সময়
১।	জন্ম হইতে এক মাস	২০-২২ ঘণ্টা
২।	১ মাস হইতে এক বৎসর	১৬-২০ "
৩।	দুই বৎসর হইতে তিন বৎসর	১৪-১৬ "
৪।	তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর	১৩-১৪ "
৫।	পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর	১২-১৩ "
৬।	দশ বৎসর হইতে পনেরো বৎসর	১০-১২ "
৭।	পনেরো বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর	৮-১০ "
৮।	পূর্ণবয়স্ক	৮-৯ "
৯।	বৃদ্ধ	৭-৮ "

দেহের মতো মনেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা মানুষ বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারে না। সুখকর চিন্তা, শখের কাজ প্রভৃতির মধ্যেও সে আনন্দ লাভ করে। সুতরাং বিশ্রাম আনন্দময় হইলে অবসর উপভোগ্য হয়, শরীর ও মন উভয়েই বিশ্রাম পায়।

ভোজনের সদভ্যাস

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যপুষ্টির সম্যক সাফল্যের জন্য আবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত ভোজন-অভ্যাস। যেমন—

(১) নির্দিষ্ট সময়ে ভোজন—অতি শৈশব হইতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস করিলে প্রত্যহ ঐ সময়ে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ঐ সময় পরিপাক-যন্ত্রে পাচক রস ক্ষরিত হয়। তাই ঐ সময় আহার করিলে খাদ্য সহজে হজম হয়। নির্দিষ্ট সময়ে আহার না করিলে ক্ষুধা পড়িয়া যায় ও ক্ষরিত পাচক রসের অপচয় ঘটে।

(২) পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ—শরীর রক্ষার জন্য যে সকল খাদ্য প্রয়োজন সেই সকল খাদ্যভক্ষণের অভ্যাস শৈশব হইতে প্রয়োজন। যেমন—মিশ্র খাদ্য গ্রহণ করিতে শেখান। তাহা হইতে সকল প্রকার খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। কারণ কোন একটি খাদ্যে সকল প্রকার উপাদান থাকে না। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ভাত-রুটির সহিত যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা ও তাজা শাক-সবজি খাওয়া প্রয়োজন। সাইট্রাস ফ্রুটস্ (citrus fruits) এবং অঙ্কুরিত শস্য ভক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

(৩) পরিচ্ছন্নতা—অধিকাংশ রোগজীবাণু খাদ্য এবং পানীয়ের সহিত দেহে সংক্রামিত হয়। তাই প্রথম হইতেই খাইবার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিলে অনেক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন—পরিষ্কার বাসনপত্রে ভক্ষণ, খাইবার পূর্বে ভাল করিয়া হাত ধুইয়া লওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে বসিয়া আহার্য গ্রহণ ইত্যাদি।

(৪) ভোজন-রীতি—নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত রীতি-নীতিগুলি অনুসরণ করিলে খাদ্য সহজে হজম হয়। যেমন—গুরু ভোজন না করা, ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাওয়া, খাওয়ার সময় কোনরূপ দুশ্চিন্তা, রাগ বা দুঃখ পোষণ না করা, হালকা হাস্যময় পরিবেশে ভোজন করা প্রভৃতি। খাইবার সময় প্রথমে কোন

ঈষদুষ্ণ পানীয় বা ঝোল (soup) দিয়া ভোজন শুরু করিলে এবং কাঁচা স্যালাড খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কঠিন পরিশ্রমের পর শরীর যখন অত্যন্ত ক্লান্ত থাকে তখন ভোজন করিলে ঠিকমতো হজম হয় না। অত্যধিক মিষ্টি বা ভাজাভুজি খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়।

জলপানের অভ্যাস—প্রত্যহ সাত হইতে আট গ্লাস জল পান করার অভ্যাস করা দরকার। খাওয়ার সঙ্গে জলপান না করিয়া, এক ঘণ্টা পরে জলপান করিলে হজম ভাল হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগের ঠিক পরেই এবং নিদ্রা যাইবার সময়ে জলপান করিলে হজম ভাল হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর শ্রান্ত দেহে কখনও জলপান করা উচিত নহে। হঠাৎ রৌদ্র হইতে আসিয়া জলপান করিলেও ক্ষতি হয়।

অনেকে দাঁড়াইয়া ঘটি করিয়া জল লইয়া আলগোছে গলায় ঢালিয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস। ইহাতে জলের সহিত প্রচুর বায়ু উদরে প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ড হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্বাসনালীতে জল প্রবেশ করিবার আশঙ্কা থাকে। গ্লাসে জল লইয়া চুমুক দিয়া অল্প অল্প করিয়া পান করিতে হয়। সকল সময় বীজাণুশূন্য বিশুদ্ধ জল পান করিবার অভ্যাস করা উচিত।

স্নানের অভ্যাস

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মঋতুতে দুইবেলা এবং শীতঋতুতে একবেলা স্নান করিবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যহ স্নান করিলে ঘামের সহিত যে ক্লেদ ও অম্ল পদার্থ বাহির হয় তাহা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। 'সিবেসাস' গ্রন্থি হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয় তাহা ধূলাবালি লাগিয়া দেহ-ত্বকের উপর চটচটে আঠাল একটি আস্তরণ তৈয়ারি করে। সেইজন্য জল এবং সাবান দিয়া প্রত্যহ স্নান করিলে এই ময়লা জমিতে পারে না। অতি শৈশব হইতেই তেল মাখিয়া স্নান করিবার অভ্যাস করা উচিত। অবশ্য স্নানের সময় সাবান বা গামছার সাহায্যে তেল-ময়লা তুলিয়া ফেলিতে হয়। স্নান করিলে রক্তসঞ্চালন ভাল হয়। ইহা ছাড়া দেহ মালিন্যমুক্ত হয়, দেহলাবণ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং স্নায়ু সতেজ হয়।

দেহ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস

(১) **নখ কাটা**—নখ কাটা একটি অবশ্য করণীয় কার্য। হাতের নখের ফাঁকে ময়লা জমিয়া থাকে এবং খাদ্যগ্রহণ, রন্ধন বা পরিবেশনের সময় উহা খাদ্য মারফত উদরে গিয়া রোগের স্বষ্টি করে। তাই নিয়মিত নখকাটার অভ্যাস করা প্রয়োজন।

(২) **জলশৌচের অভ্যাস**—ভারতবর্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ মলত্যাগের পর কোনরূপ 'স্যানিটারি পেপার' ব্যবহার করেন না, জলশৌচই করেন। জলশৌচের পরে হাতখানি খুব ভাল জীবাণুনাশক সাবানের দ্রাব দিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। তাহা না হইলে নখের কোণে মলনিঃসৃত জীবাণু লাগিয়া থাকে এবং খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়। তেমনি প্রস্রাব করিবার পর জল ব্যবহারের অভ্যাস করিতে হয়। কারণ মলের ন্যায় মূত্রের সহিত শরীরের বর্জ্য পদার্থ বাহির হয়। উহা শরীরের যে কোন স্থানে লাগিয়া থাকিলে চর্মের ক্ষতিসাধন করে। তাই মলত্যাগ ও মূত্র-ত্যাগের পর হাত, পা ও মুখ জল দিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত।

(৩) **থুতু ফেলা**—যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা অত্যন্ত বদ অভ্যাস। থুতু, শিকনি ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে ক্লেদাক্ত বিষাক্ত পদার্থ বাহির হয়। হাম, বসন্ত, যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দিকাশি, হুপিংকফ, ডিপথিরিয়া ইত্যাদির রোগজীবাণু রোগীর গয়ের ও থুতুর সহিত মিশ্রিত থাকে। তাই যেখানে-সেখানে থুতু ফেলিলে উহা শুকাইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায় এবং বায়ুকে জীবাণুদুষ্ট করে। এই ভাবে রোগ বিস্তার লাভ করে। সেইজন্য নরদমার মুখে থুতু ফেলিয়া, জল ঢালিয়া উহা বাহির করিয়া দিতে হয় অথবা থুতু ফেলিবার জন্য নির্দিষ্ট পাত্র রাখিতে হয়। পরে ঐ পাত্রের থুতু হয় পুঁতিয়া, না হয় পুড়াইয়া ফেলিতে হয়।

(৪) **শিকনি ঝাড়া**—শিকনি ঝাড়িয়া তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলা উচিত। অথবা একটি রুমাল নাকে চাপা দিয়া শিকনি ঝাড়িতে হয়। পরে উহা কাচিয়া নির্বীজন করিতে হয়।

(৫) **কাশি**—কাশির সময় থুতুর ছিটা বাহির হয় ও বহুদূর পর্যন্ত ছিটায়। তাই কাশির সময়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়া কাশা উচিত।

(৬) **গা, হাত, পা চুলকানো**—গ্রীষ্মকালে ঘামাচি হইলে বা অন্য কারণে গা-হাত-পা চুলকাইলে নখ দিয়া চুলকানো উচিত নয়। ইহাতে দেহ-চর্ম ছড়িয়া বিষাইয়া যাইতে পারে। তাহা ভিন্ন ইহাতে চর্মের ময়লা নখে আসিয়া জমে। তাই কোন একটি জিনিস বিশোধন করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহার সাহায্যে চুলকাইতে হয়। যেমন—সমুদ্রের ঝিনুক, চিরুনি বা টার্কিশ তোয়ালের টুকরা ইত্যাদি। কোন সময় নখে করিয়া চুলকাইলে হাত ভাল করিয়া ধুইয়া তবে খাদ্যে হাত দেওয়া উচিত।

(৭) **চুল আঁচড়ান**—চুল আঁচড়াইয়া চুলের নুটি যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নহে। এলো চুলে খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে নাই অথবা ভোজন-স্থানে চুল আঁচড়াইতে নাই, তাহাতে খাদ্যে চুল উড়িয়া পড়ে।

(৮) **মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস**—প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। শৈশব হইতে যদি নির্দিষ্ট সময়ে মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে যখন-তখন পায়খানা বা প্রস্রাবখানায় যাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং শরীর ক্লেদমুক্ত থাকে।

দেহের ওজন ও উচ্চতার বিষয়ে আলোচনা

[Study of proper height and weight
according to age]

ওজন ও উচ্চতা পরীক্ষা—

পরীক্ষার প্রয়োজন :—(১) দেহের ওজন ও উচ্চতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ আছে। তাই ইহা স্বাস্থ্য পরীক্ষার একটি অঙ্গ। দুইবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে যদি একবার ওজন ও উচ্চতা পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা বোঝা যায়।

(২) ওজন ও উচ্চতা শারীরিক বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ওজন ও উচ্চতা পরীক্ষা করিলে শারীরিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হইতেছে কিনা জানা যায়। উচ্চতার তুলনায় যদি ওজন কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেহের পুষ্টি ঠিকমতো হইতেছে না। উপযুক্ত পুষ্টি না হওয়ার কারণ, হয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আর না হয় ব্যাধির আক্রমণ। এইভাবে দেহের ওজন পরীক্ষা করিয়া অনেক সময়

গোপন ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষয়রোগে অথবা অন্য কোন বিপাকীয় ব্যাধিতে (metabolic diseases) দেহের ওজন কমিয়া যায়।

(৩) একই বয়সী শিশুদের ওজন লইয়া তুলনা করিলে ওজনবৃদ্ধির ত্রুটি ধরা পড়ে। এজন্য শিশুদের ওজনের যে 'স্ট্যাণ্ডার্ড' তালিকা আছে তাহার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। বহুসংখ্যক শিশুর ওজন লইয়া গড় নির্ণয় করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের 'মান' (standard) বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। তাই তুলনা করিবার সময় নিজের দেশের ওজনের স্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত তুলনা করাই ভাল। যে কোন একটি শিশুর ওজন লইয়া তালিকায় দেখিতে হইবে ঐ বয়স এবং উচ্চতার শিশুর ওজন কত। যদি কম হয় তাহা হইলে শিশুটির স্বাস্থ্যের মান নিম্ন এবং বেশী হইলে মান উচ্চ ধরিতে হইবে। অবশ্য মান অপেক্ষা শতকরা দশভাগ কম বা বেশী হইলে স্বাস্থ্য মান অনুযায়ী ধরা যায়।

আদর্শ ওজনে পৌঁছানোর উপায়—

নীরোগ শরীর, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিমিত শ্রম ও বিশ্রাম আদর্শ ওজন লাভের সর্বাপেক্ষা ভাল উপায়।

আদর্শ ওজন লাভের জন্য তাই পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ভক্ষণ, নিয়মিত রাত্রে এবং দিবাভাগে বিশ্রাম ও প্রচুর খেলাধূলার প্রয়োজন। ইহার উপর স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মগুলি পালন করিলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস করিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

দেহের ওজন ও উচ্চতার উপর বিভিন্ন জিনিসের প্রভাব—

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। তবে সকল দেশের মানুষের উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধির হার সমান নহে। তিনটি জিনিস প্রধানতঃ দেহের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করে। যথা—(১) দেশের জলবায়ু, (২) বংশগতি, (৩) জীবনযাত্রার মান।

(১) জলবায়ু—জলবায়ুর বিরাট প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। এই কারণেই পাঞ্জাবীরা দীর্ঘ এবং নেপালীরা খর্বকায়। সেরূপ উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের শিশু অপেক্ষা বাঙালী শিশুদের ওজন কম।

(২) বংশগতি—পিতামাতা দীর্ঘাঙ্গ হইলে সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরাও

দীর্ঘাঙ্গ হয়। পিতামাতার স্বাস্থ্য ভাল হইলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও ভাল হয় এবং তাহাদের দেহের ওজন মান অনুযায়ী হয়।

(৩) জীবনযাত্রার মান—যে সকল পরিবারের জীবনযাত্রার মান উচ্চ সেই সকল পরিবারের শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল। তাহাদের ওজন এবং উচ্চতা মান অনুযায়ী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে শৈশব হইতে যদি খর্বকায় শিশুদের উচ্চমানের জীবনযাত্রার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা যতটা খর্বকায় হইত ততটা হয় না। এরূপ পরীক্ষা অবশ্য সকল সময় যমজ ভাইবোনদের (identical twin) লইয়া করা হয়।

বিভিন্ন বয়সে উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হার—

শৈশবে দেহের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হার—বয়স যত কম থাকে উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধির হার তত বেশী হয়। জন্মের পর হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিশু শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়। জন্মের সময় যদি উচ্চতা ৫০ সে. মি. (২০″) থাকে এক বৎসরে শিশু ৭১-৭৫ সে. মি. (২৮″/৩০″) লম্বা হয়। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫ (৩″) হইতে ১২ সে. মি. (৫″) লম্বা হয়। পাঁচ বৎসরে শিশুর উচ্চতা জন্মের সময়ের উচ্চতার দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু বেশী হয়। সাধারণতঃ সে ১.০৯ (৪৩″) হইতে ১.১৪ (৪৫″) মিটার লম্বা হয়।

উচ্চতা অপেক্ষা ওজন বৃদ্ধির হার আরও বেশী হয়। জন্মের সময় শিশুর যা ওজন থাকে ছয় মাস বয়সে ওজন তাহার দ্বিগুণ হয়। এক বৎসর বয়সে উহা তিনগুণ হয়। জন্মের সময়ে ওজন তিন কিলোগ্রাম (৭ পাঃ) হইলে, ছয় মাসে ৬.৫ কিলোগ্রাম (১৪ পাঃ) এবং এক বৎসরে ৯.৫ কিলোগ্রাম (২১ পাঃ) হয়। এক হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে গড়ে শিশু প্রতি বৎসরে ২/২.৫ কিলোগ্রাম (৪/৫ পাঃ) বৃদ্ধি পায়। ছয় বৎসর বয়সে শিশুর ওজন জন্মের ওজনের ছয় গুণ অধিক হয়।

বাল্যে ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির হার—ছয় হইতে নয় বৎসর বয়সে শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধির হার তুলনায় কম থাকে। কিন্তু ওজন বৃদ্ধির হার সমান থাকে। এই বয়সের বালক-বালিকারা প্রতি বৎসর গড়ে উচ্চতায় ৫ হইতে ৬.৫ সে. মি. বৃদ্ধি পায়, এবং ওজনে দেড় হইতে দুই কিলোগ্রাম বৃদ্ধি পায়। নয় হইতে বার বৎসরের মধ্যে উচ্চতার তুলনায় ওজন-বৃদ্ধির হার অধিক থাকে।

কৈশোরে ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির হার—বার হইতে পনের বৎসরের মধ্যে কিশোরীদের ওজন এবং উচ্চতা বৃদ্ধির হার খুব বাড়িয়া যায়। পনের হইতে আঠার বৎসরের মধ্যে কিশোরদের বৃদ্ধির হার খুব বেশী হয়। এই বয়সেই কিশোর-কিশোরীদের ওজন ও উচ্চতায় বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। ইহার পর হইতে বৃদ্ধির গতি স্তিমিত হইয়া পড়ে। যৌবনপ্রাপ্ত হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। তবে উচ্চতা অনুযায়ী ওজনের পার্থক্য হয়।

শিশুর জন্ম হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত দেহের উচ্চতা এবং ওজনের তালিকা

বয়স	বালক		বালিকা	
	উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা	ওজন
জন্মের সময়	৫২ সে. মি.	৩·৪ কে.জি.	৫২ সে. মি.	৩·২ কে.জি.
৬ মাসে	৬৫ ”	৭·২ ”	৬৩ ”	৭·০ ”
১২ মাসে	৭৪ ”	৯·৩ ”	৭৩ ”	৯·০ ”
১৮ মাসে	৭৬ ”	১০·১ ”	৭৫ ”	১০·০ ”
২ বৎসরে	৮১ ”	১২·০ ”	৮২ ”	১১·৬ ”
৩ বৎসরে	৮৯ ”	১৪·৩ ”	৮৯ ”	১৩·৬ ”
৪ বৎসরে	৯৬ ”	১৫·৮ ”	৯৬ ”	১৫·৪ ”

দেহের ওজন ও উচ্চতার চার্ট প্রস্তুত করিবার নিয়ম—দেহের ওজন ও উচ্চতা পরীক্ষা করিয়া চার্ট প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় ওজন লইবার যন্ত্র, উচ্চতা মাপিবার স্কেল এবং গ্রাফ পেপার, পেন্সিল প্রভৃতি।

ওজন পরীক্ষা—একজন ছাত্রী ওজন-যন্ত্রের উপর জুতা খুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। আর একজন ছাত্রী ওজন-যন্ত্রের কাঁটাটি কত কে. জি. বা কিলোগ্রাম নির্দেশ করিতেছে দেখিয়া লিখিয়া রাখিবে।

উচ্চতা পরীক্ষা—যাহার ওজন লওয়া হইতেছে সেই ছাত্রীটি উচ্চতামাপক স্কেলের দিকে পিঠ দিয়া জুতা খুলিয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় ছাত্রীটি একটি

ফুটরুল তাহার মাথার উপর দিয়া পিছনের স্কেলে ঠেকাইবে। সে ফুটরুলটি যত মিটার-সেন্টিমিটারে ঠেকিবে তাহা লিখিয়া রাখিবে। এইভাবে প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা মাপিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে।

চার্ট প্রস্তুত—একখানি গ্রাফ পেপার লইতে হইবে। গ্রাফ পেপারের নীচে হইতে উপরে ক্রম-বর্ধমান হারে কে. জি. লিখিতে হইবে। তলায় পর পর ধারাবাহিকভাবে মাসের নাম লিখিতে হইবে। প্রতি মাসের ওজন গ্রাফে প্রথমে বিন্দুর সাহায্যে নির্দেশ করিতে হইবে; পরে বিন্দুগুলি রেখার সাহায্যে জুড়িয়া দিলেই 'গ্রাফ-রেখা' প্রস্তুত হইবে। ঐ গ্রাফ-পেপারেই যদি অপর পাশ দিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড ওজন নির্দেশ করিয়া রেখা টানা যায় তাহা হইলে দুইটি তুলনা করিয়া বলা যায় ছাত্রীটির ওজন মান অনুযায়ী কিনা। (চার্ট নং ৪ দেখ।)

উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বাড়িতেছে কি-না পরীক্ষা করিতে হইলে গ্রাফ-পেপারের নীচে সময়ের পরিবর্তে মিটার-সেন্টিমিটার হিসাব ক্রম-বর্ধমান হারে লিখিতে হইবে। তারপর একই ভাবে বিন্দু দিয়া পরে রেখা দ্বারা বিন্দুগুলি জুড়িতে হইবে। (চার্ট দেখ।)

উদাহরণঃ বিদ্যালয়—বালী গার্লস স্কুল
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রীর নাম—অনিমা দে
বয়স—১২ বৎসর
উচ্চতা—১·৬৫ মিটার (৫২ ফুট)

বয়স অনুযায়ী ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির হার

ওজন		উচ্চতা	
১৯৬৫ সাল	কি. গ্রা.	১৯৬৫ সাল	
জানুয়ারী মাস	৩২—৬	জানুয়ারী	১·৪২ মি. (৪'৮")
ফেব্রুয়ারী „	৩৩—০	ফেব্রুয়ারী	১·৪২ „ (৪'৮")
মার্চ „	৩৩—১	মার্চ	১·৪২ „ (৪'৮")
এপ্রিল „	৩৩—৭	এপ্রিল	১·৪২ „ (৪'৮")
মে „	৩৪—০	মে	১·৪২ „ (৪'৮")

		কি. গ্রা.		মিঃ
জুন	„	৩৪—১	জুন	১'৪৫ „ (৪'৯")
জুলাই	„	৩৪—২	জুলাই	১'৪৫ „ (৪'৯")
আগস্ট	„	৩৪—৪	আগস্ট	১'৪৫ „ (৪'৯")
সেপ্টেম্বর	„	৩৪—৬	সেপ্টেম্বর	১'৪৫ „ (৪'৯")
অক্টোবর	„	৩৪—৮	অক্টোবর	১'৪৫ „ (৪'৯")
নভেম্বর	„	৩৪—৯	নভেম্বর	১'৪৭ „ (৪'১০")
ডিসেম্বর	„	৩৫—১	ডিসেম্বর	১'৪৭ „ (৪'১০")

১৬ আ:=১ পা.=৪৫৩'৬ গ্রাম='৪৫৩ কে. জি.
১ আ.=২৮'৩৫ গ্রাম
১ই.=২'৫৪ সেন্টিমিটার='০২৫৪ মিটার
১ ফু.=৩০'৪৮ „ ='৩০৪৮ „

অনুশীলনী

E. ১৯৬৪ (৬) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—(খ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

উঃ সং—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলিতে সেই সকল স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির শরীরটি সুস্থ রাখিতে সাহায্য করে। ইহা দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সঠিক ব্যবহারের তথ্য পরিবেশন করে।

[পুষ্টিকর খাদ্য, শ্রম, বিশ্রাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সদভ্যাস, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঠিক ব্যবহার ও দেহভঙ্গি লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে।]

E. ১৯৬২ (৫) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—(গ) পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন।

উঃ সং—ধূলা-বালি, তেল-কালি, আবর্জনা, দেহ-নিঃসৃত মল প্রভৃতি হইতে যাহা মুক্ত তাহাই পরিচ্ছন্ন। দেহ পরিচ্ছন্ন রাখিবার অর্থ চর্ম, চুল, চক্ষু, নাসিকা, মুখ, দন্ত, পোশাক-পরিচ্ছদ ঐ সকল ময়লা হইতে মুক্ত রাখা এবং পরিবেশটি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখা।

[প্রত্যেকটি জিনিস কিভাবে পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে তাহা আলোচনা করিতে হইবে।]

E. ১৯৬৭ (১) স্বাস্থ্যরক্ষার কি প্রয়োজন তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উঃ সং—আগের উত্তরের মতোই হইবে।

E. ১৯৬৪ (১) দেহ ও মনের উপর ব্যায়াম এবং খেলাধুলার প্রভাব কি বল। কখন তুমি বলিতে পারিবে, ব্যক্তিটির ব্যায়ামের সদভ্যাস গঠিত হইয়াছে?

উঃ সং—[(১) ব্যায়াম ও খেলাধূলার প্রয়োজন লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যাঁহারা পালন করেন তাঁহাদেরই ব্যায়ামের অভ্যাস হইয়াছে বলা যায়। যথা—(ক) নিয়মিত ব্যায়াম, (খ) বয়স উপযোগী ব্যায়াম, (গ) সঠিক ও সমভাবে অঙ্গ সঞ্চালন, (ঘ) নির্দিষ্ট ধারা মানিয়া চলা, (ঙ) অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষাগ্রহণ, (চ) ব্যায়ামের আধুনিক নিয়মগুলি মানিয়া চলা।]

E. ১৯৬৭ (২) ব্যায়াম করিবার সাধারণ নিয়ম কি কি ? অতি ব্যায়ামের কুফল কি ?

উঃ সং—ব্যায়ামের নিয়ম—(১) চিত্তগ্রাহিতা, (২) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়ামের মাত্রা, (৩) ব্যায়ামের সহিত খাদ্য ও বিশ্রামের সামঞ্জস্য, (৪) পরিমিত ব্যায়াম, (৫) নিয়মিত ব্যায়াম, (৬) প্রাক ব্যায়াম—খেলাধূলা, (৭) ব্যায়ামের সময় ও স্থান, (৮) ব্যায়ামের অন্যান্য নিয়ম, (৯) অতি ব্যায়ামের কুফল—ওজন কমা ও দেহক্ষয়, দুর্বলতা, স্বাস্থ্যভঙ্গ।

E. ১৯৬৫ (Comp.) (৩) দেহের উচ্চতার সহিত ওজনের সম্বন্ধ কি ? ১'৫২ মিটার লম্বা কোন ব্যক্তির ২৫, ৩০ এবং ৩৫ বৎসর বয়সে দেহের ওজন কত হইবে ?

উঃ সং—(১) বৃদ্ধির অর্থ ওজন ও উচ্চতার সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি, (২) শৈশব হইতে কিভাবে শিশু ওজন ও উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়, (৩) বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে দুই প্রকার বৃদ্ধি কিভাবে হয়, (৪) বিশেষ অবস্থায় ও জলবায়ুতে ঐ দুই বৃদ্ধির সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়ায়—এইগুলি আলোচনা করিতে হইবে। (৫) বিভিন্ন বয়সের উচ্চতার চার্ট দেখ।

'E' ১৯৬০ (২) বদ্ধ বায়ুতে শ্বাস গ্রহণের কুফল কি কি ?† একটি কক্ষের বায়ু-সঞ্চালনের সুবন্দোবস্ত কিরূপে করা যায় ?

উঃ সং—(১) কুফল—সর্দিগর্মি, বায়ুবাহিত ব্যাধিগুলির সংক্রমণ।

(২) বায়ু-সঞ্চালন—আভ্যন্তরীণ বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা, ঘরের বাহিরের বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা।

E. ১৯৬১ (২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কাহাকে বলে ? স্বাস্থ্যের জন্য নির্মল বায়ু এবং সূর্যালোক কেন প্রয়োজন ?

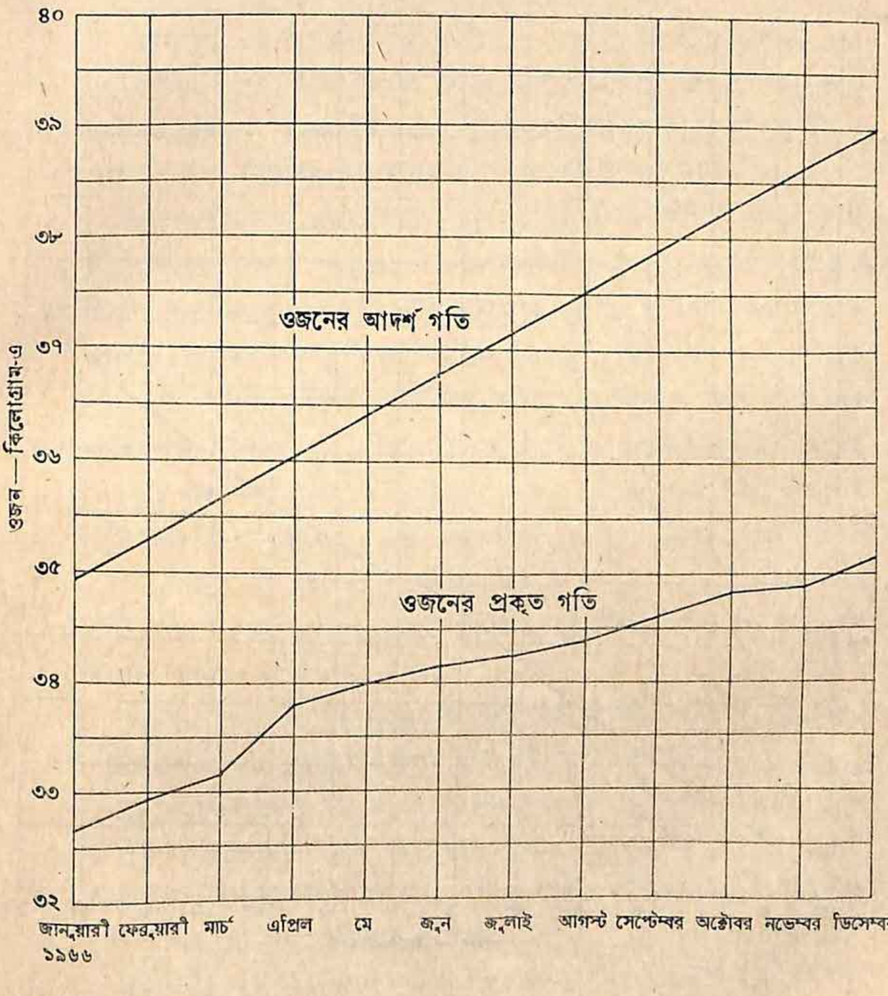
উঃ সং—(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা, (২) স্বাস্থ্যের জন্য নির্মল বায়ুর প্রয়োজন—অক্সিজেন সরবরাহ করে—অক্সিজেনের দেহাভ্যন্তরে কাজ, (৩) সূর্যালোকের প্রয়োজন—স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন সূর্যরশ্মির প্রভাব।

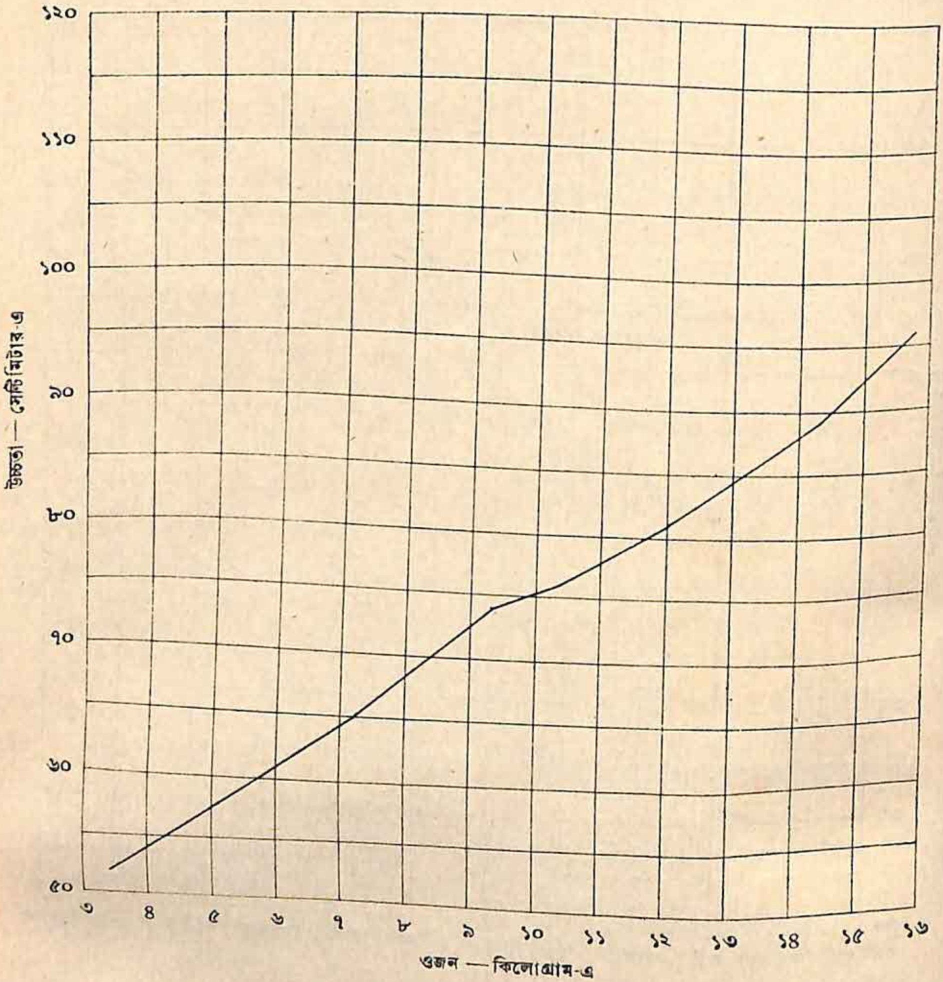
E. ১৯৬৩ (৩) দূষিত বায়ু কাহাকে বলে ?†† একটি কক্ষের বায়ু-সঞ্চালনের সুবন্দোবস্তের জন্য তুমি কি কি উপায় অবলম্বন করিবে ?

উঃ সং—(১) দূষিত বায়ুর সংজ্ঞা—কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, রোগজীবাণু প্রভৃতির অত্যধিক বৃদ্ধি। (২) বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা।

E. ১৯৬৬ (১) নির্মল বায়ুতে শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন কি ?††† তোমার শয়ন-কক্ষে নির্মল বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টির জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ?

উঃ সং—(১) নির্মল বায়ুর প্রয়োজন, (২) বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।


৪০
৩৯
৩৮
৩৭
৩৬
৩৫
৩৪
৩৩
৩২
ওজন — কিলোগ্রাম-এ
ওজনের আদর্শ গতি
ওজনের প্রকৃত গতি
জান্‌য়ারী ফেব্র্‌য়ারী মার্চ এপ্রিল মে জ্‌ন জ্‌লাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর
১৯৬৬



১২০
১১০
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
উচ্চতা — সেন্টিমিটার-এ
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
ওজন — কিলোগ্রাম-এ

বাসগৃহ

(Study of the house)

বাসগৃহ—যে স্থানে মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস করে তাহাকেই বলা হয় বাসগৃহ। গৃহ নিজস্ব অথবা ভাড়া করা হইতে পারে। গৃহ মানুষকে স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দান করে। গৃহেই পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে। তাই গৃহগুলিই শিশুদের দেহ-মনের সুষ্ঠু বিকাশের উপযুক্ত স্থান।

স্বাস্থ্য জীবনকে সুন্দর করে। সেই স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হইলে চাই নিরাপদ গৃহ, যেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য আর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম মিলিয়া থাকে। আবার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে বা সুকুমার বৃত্তিগুলির চর্চা করিতে হইলেও প্রয়োজন হয় সুপরিচ্ছন্ন, শান্তিপূর্ণ গৃহের। শিশু-সন্তানগুলি লালিত হয় গৃহে। গৃহ-পরিবেশেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। তাই গৃহ কেবল আবাস-স্থলই নহে, উহা সমাজের একটি দৃঢ় স্তম্ভও বটে। সুখী ও সুস্থ পরিবার বাস করে সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন গৃহে। সুখী ও সম্পন্ন পরিবারগুলিই সৃষ্টি করে উন্নত সমাজের। এরূপ পরিবারই জন্ম দেয় আদর্শ নাগরিকের। আদর্শ নাগরিকই হয় জাতির অগ্রগতির ধারক ও বাহক। তাই বলা যাইতে পারে, গৃহ কেবল একটি পরিবারকেই আশ্রয় দেয় না, জন্ম দেয় জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের।

সুতরাং গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচনের সময় উহার জমি, অবস্থান, পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য সুবিধার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ভূমি নির্বাচন—গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচন করিবার সময় প্রথমেই ভূমি নির্বাচন করিতে হয়। ভূমি নির্বাচনের সময় মাটি গৃহনির্মাণের উপযোগী কিনা তাহা সর্বাগ্রে দেখা উচিত। মাটি নানারূপ হইতে পারে, কিন্তু সকল মাটি গৃহনির্মাণের উপযোগী নহে। যেমন—

(১) এঁটেল মাটি (Clay soil) : এইরূপ মাটির মধ্য দিয়া জল শোষিত হইতে পারে না। তাই এইরূপ জমির উপর বাড়ী করিলে বাড়ী স্যাঁতসেঁতে হয়। গ্রীষ্মের সময় মাটি শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিত বসিয়া যায়।

(২) পুকুর বোজানো জমি (Made soil) : খানা, ডোবা বা পুকুর

বোজানো জমিও ঐরূপ হয়। এইরূপ জমিতে বাড়ী করিলে অল্প দিন পরে ভিত বসিয়া খিলানে ফাট ধরিতে পারে।

(৩) নীচু জমি : যে কোন নীচু জমি বা জলা জমি আবর্জনা দিয়া ভরাট করিয়া তাহার উপর বাড়ী করা উচিত নহে। কারণ ঐ সকল আবর্জনা পচিয়া গ্যাস হয় ও বাড়ীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

(৪) পাথুরে জমি, খড়িমাটি বা বালুকাময় জমি : পাথুরে জমি, খড়িমাটি-প্রধান অথবা বালুকাময় উঁচু ঢালু জমি গৃহনির্মাণের উপযোগী। এইরূপ জমিতে জল বসে না। উঁচু এবং ঢালু হইলে বৃষ্টির জল গড়াইয়া যায়। তাই উহা সর্বদা শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর হয়।

পরিবেশ (Surrounding)—জমি নির্বাচনের সময় গৃহনির্মাণের পূর্বে পরিবেশের কথাও চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, গৃহের অবস্থানের উপর যেমন গৃহ-পরিজনগণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, গৃহ-পরিবেশের উপর তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

বাজারহাট, কলকারখানা, আস্তাবল, কবরখানা হইতে গৃহ দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাজারহাট প্রভৃতির কোলাহল যেমন মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য নষ্ট করে, আস্তাবল, কবরখানা প্রভৃতি নিকটে থাকিলে তেমনই গৃহের সাধারণ স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। বিদ্যালয়, দেবালয়, বড় রাস্তা, পোস্ট অফিস প্রভৃতি হইতে বাড়ী খুব দূরে হইলে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় হয়। তাই এইগুলি গৃহের নিকটে হওয়া প্রয়োজন।

পল্লী নির্বাচন করিবার সময় সেই পল্লীর পরিবারগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করা প্রয়োজন। ধনী পল্লীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহ নির্মাণ করিলে তাহার পক্ষে প্রতিবেশীর সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অকারণে হীনতাবোধ ও মানসিক অশান্তি দেখা দেয়। তেমনি কোন সামাজিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ধনী পরিবার যদি মধ্যবিত্ত পাড়ায় আসিয়া বাড়ী করে তাহা হইলে সেখানে তাহাদের নিজ শ্রেণীর বা মানের সঙ্গীর অভাব হয়। এরূপক্ষেত্রে তাহারা প্রতিবেশীকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে, আর প্রতিবেশী তাহাদের গর্বিত ভাবে।

ইহার পর বিবেচনা করিতে হয় স্থানটি বেশ উন্মুক্ত কিনা, কোন বৃহৎ বৃক্ষ বা পর্বত অথবা অট্টালিকা বাড়ীটির আলো-বাতাস আগমনের পথ রুদ্ধ

করিতেছে কিনা। জমির আশেপাশে বস্তি অথবা কুঁড়ে ঘর থাকিলেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ঐ সকল বাড়ীর ধূম গৃহজনদের শ্বাসরোধ করে।

অবস্থান (Aspect)—গৃহের অবস্থানের উপর বাড়ীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তাই দেখা দরকার—বাড়ীটি কোন্ মুখী হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক আলো-বাতাস আসিবে। বাড়ীর অধিকাংশ জানালা-দরজাগুলি দক্ষিণ-মুখী হইলে প্রচুর বায়ু-সঞ্চালন হয় এবং পূর্ব-মুখী হইলে কক্ষমধ্যে দিনান্তে কিছুক্ষণের জন্যও রৌদ্র প্রবেশ করে। কারণ ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এইজন্য আজকাল বাড়ীগুলি ঠিক দক্ষিণ-মুখী না করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখী করা হয়। ইহাতে অধিকাংশ ঘরে প্রচুর বায়ু প্রবেশ তো করেই, রৌদ্রও আসে। তবে রন্ধনশালা, ভাঁড়ার প্রভৃতি উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব-মুখী হইলে ক্ষতি নাই। জানালা-দরজাগুলি রুজু রুজু হইলে বায়ু-সঞ্চালনের সুবিধা হয়। বড় নদী, খাল বা প্রমোদ-উদ্যানের পার্শ্বে বাড়ী হইলে আলো-বাতাস অবাধে আসিতে পারে। রাস্তার উপর সমকোণ সৃষ্টি করিয়া বাড়ী করিলেও বায়ু-সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি হয় না। এ ছাড়া বাড়ীতে যাহাতে যথেষ্ট বায়ু-সঞ্চালন হইতে পারে সেজন্য মোট জমির $\frac{১}{৮}$ অংশ ছাড়িয়া বাড়ী করিতে হয়। বাড়ীর দক্ষিণে উদ্যান অথবা উন্মুক্ত স্থান রাখিতে পারিলে বায়ু-সঞ্চালনের সুবিধা হয়। তাই দক্ষিণে উদ্যান এবং পশ্চিমে জলাশয় আদর্শ বাড়ীর বড় শর্ত।

মল নিষ্কাশন ব্যবস্থা—অবস্থানের পরই বিচার্য বিষয় হইল বাড়ীর মল নিষ্কাশন ব্যবস্থা। বাড়ীর তরল মল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বাড়ীর নিকটবর্তী রাস্তায় পাকা ও ঢাকা ড্রেন থাকিলে ভাল হয়। বাড়ীর নরদামাগুলিকে যুক্ত করিলেই মল-নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান হয়। পায়খানার ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। পায়খানা নানারূপ হইতে পারে। তাহার মধ্যে যে সকল অঞ্চলে জলবাহিত মল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে সে সকল অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা ভাল। সেরূপ ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে মলশোধনী পায়খানা নির্মাণ করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে গর্ত-পায়খানা, কূপ ও ট্রেঞ্চ-পায়খানাও করা যাইতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটি-পরিচালিত বহু শহরে এখনও খাটা পায়খানার প্রচলন আছে। ইহা সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর

ব্যবস্থা। শুষ্ক আবর্জনা অপসারণের সুব্যবস্থা যে সকল স্থানে আছে সেই সকল স্থানে গৃহ নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। এইজন্য মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত শহরগুলি বাড়ী তৈয়ারির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহা না হইলে বাড়ীর নিকট গর্ত কাটিয়া আবর্জনা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে হয়।

জল ও আলোর ব্যবস্থা

শহরাঞ্চলে বাড়ী নির্মাণের সময় জল, আলো, গ্যাস, টেলিফোন প্রভৃতির কথাও চিন্তা করিতে হয়। এইগুলি লইবার সুবিধা থাকিলে বাড়ী তৈয়ারির খরচ কম হয়, জীবন-যাত্রাও সহজতর হয়।

(১) আলো—তেল ও ইলেকট্রিক সাধারণতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে ইলেকট্রিকই সুবিধাজনক। ইহা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি ইহাতে খরচ কম এবং কোনরূপ বাড়তি ঝামেলা নাই। তাই যে সকল স্থানে ইলেকট্রিকের প্রধান লাইন আছে সেই সকল স্থানে বাড়ী করা সুবিধাজনক। তাহা হইলে অল্প খরচে ইলেকট্রিক পাওয়া যায়।

(২) জল—যেস্থানে কলের জলের ব্যবস্থা নাই, সেই স্থানে গৃহ নির্মাণের সময় নিকটে পুকুর বা নদী আছে কিনা, বাড়ীর মধ্যে কূপ অথবা নলকূপ খননের সুবিধা আছে কিনা তাহার সমীক্ষা করা দরকার। কলের জলের সুবিধা থাকিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়।

(৩) গ্যাস লাইন—শহরাঞ্চলে গ্যাস লাইন থাকে। বাড়ীর নিকট দিয়া প্রধান লাইন থাকিলে গ্যাস লইবার সুবিধা হয়।

(৪) টেলিফোন—শহরে যাহাদের বাড়ীতে টেলিফোন প্রয়োজন তাহাদের টেলিফোন লাইন ঐ অঞ্চল দিয়া গিয়াছে কিনা চিন্তা করা উচিত।

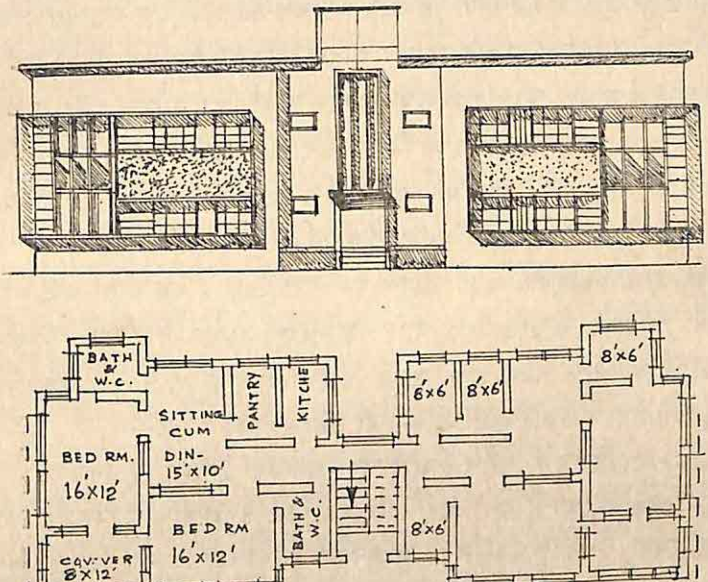
এইসকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় কলকারখানা-বহুল বড় শিল্পাঞ্চল অথবা একেবারে গ্রাম অপেক্ষা বড় শহরের নিকটবর্তী ছোট শহর অথবা গ্রামের নিকটবর্তী শহর গৃহনির্মাণের পক্ষে অধিক উপযোগী। ইহাতে শহরের সুবিধা এবং গ্রামের নির্জনতা দুই পাওয়া যায়। অবশ্য যাহারা কৃষিজীবী তাহাদের পক্ষে গ্রামই ভাল।

নকশা (Plan)

বাড়ী করিবার পূর্বে বাড়ীর নকশা (plan) করিতে হয়। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য—(ক) আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা এবং (খ) বাহিরের গঠন স্থির করা।

(ক) আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা—আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা অর্থাৎ কয়-খানি শয়ন কক্ষ হইবে, বসিবার ঘর, খাইবার ঘর ও রন্ধন ঘর কোন্ স্থানে হইবে ইত্যাদি। এক কথায় কক্ষ-সংখ্যা ও সন্নিবেশ ইহার উপর নির্ভর করে।

আদর্শ বাড়ী



চিত্র নং—১৮ : বাড়ীর আভ্যন্তরীণ নকশা

বাড়ীর মাপ—নকশা প্রস্তুতের সময় প্রথমেই দেখিতে হইবে পরিবারটি বৃহৎ না ক্ষুদ্র। কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী কক্ষের সংখ্যা ও মাপ স্থির করিতে হয়। তারপর প্রশ্ন আসে উহার পরিজনগণ কিরূপ অর্থাৎ শিশু, বৃদ্ধ, রোগী আছে কিনা। সেই অনুযায়ী উদ্যান, আঙ্গিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কক্ষ-সংলগ্ন করিয়া স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজন থাকিলেও সকল সময় বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করা সম্ভব হয় না, সেজন্য অর্থ থাকা চাই। প্রয়োজন মিটিবে এবং নির্দিষ্ট টাকার

মধ্যে বাড়ীটি তৈয়ারি করা যাইবে এরূপ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। যেমন—

(১) বাড়ীতে বড় বড় দালান এবং অধিক সিঁড়ি ও বারান্দা না রাখিয়া, অধিক কক্ষ নির্মাণ করিলে প্রয়োজনও মিটে অথচ খরচও কম হয়। বাড়ী নির্মাণ করিবার সময় প্রত্যেকটি স্থান কাজে লাগাইলেও খরচ কম হয়। যেমন সিঁড়ির নীচে স্নানাগার বা ভাঁড়ার ঘর করিলে একটি কক্ষ নির্মাণের অর্থ বাঁচিয়া যায়। (২) এইভাবে বাড়ীর মাপ স্থির করিয়া লইয়া কক্ষ সন্নিবেশের কথা চিন্তা করিতে হয়। বিভিন্ন কক্ষের উদ্দেশ্য-অনুযায়ী কক্ষ সন্নিবেশ করিতে হয়। আবার আলো-বাতাস আসার সুবিধা এবং পরিজনদের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী কক্ষগুলি কোথায় অবস্থিত হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। যেমন— বসিবার ঘর গৃহের প্রবেশ-পথের নিকটে এবং রন্ধন-গৃহাদি হইতে দূরে হইবে। পড়ার বা লাইব্রেরীর জন্য ঘর গৃহের কল-কোলাহল হইতে দূরে, নির্জনে, উদ্যানের পার্শ্বে অথবা ছাদে হওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগীর কক্ষ বাড়ীর একপাশে হওয়া ভাল। খাইবার ঘর, রান্নার ঘর এবং ভাঁড়ার ঘর কাছাকাছি হইলে অযথা পরিশ্রম করিতে হয় না। শয়ন-কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমই আধুনিক বাড়ীর বৈশিষ্ট্য। শয়ন-কক্ষে প্রচুর আলো-বাতাস আসা উচিত। স্থান সংকুলান হইলে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গিনা বা উদ্যান থাকা উচিত।

(খ) **বাহিরের গঠন**—বাহিরের আকার গোল, চৌকা বা অর্ধ গোলাকৃতি হইতে পারে। তবে বাহিরের গঠন ও আকার অনেকাংশে কক্ষ সন্নিবেশের উপর নির্ভরশীল। আজকাল জানালার শার্সী, সুন্দর সুন্দর রেলিং দেওয়া বারান্দা ইত্যাদি দিয়াও বাহিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

গৃহনির্মাণ

নকশা অনুমোদন—বাড়ীর নকশা প্রস্তুত হইবার পর উহা পৌরসভার নিকট পেশ করিতে হয়। পৌরসভা উহা আইন-মাফিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর বাড়ী করিবার অনুমতি দেন।

লে-আউট—নকশা অনুমোদিত হইলে যে-জমিতে বাড়ী হইবে তাহা মাপজোখ করিয়া স্থির করিয়া লইতে হয়, কোথায় কি হইবে। ইহাকে বলা হয় 'Lay out'। তারপর ভিত খনন করা হয়।

ভিত্তিস্থাপন—বাড়ীখানির মজবুত হওয়া বা না হওয়া ভিতের উপর নির্ভর করে। তাই ইটের বাড়ী বা পাকা বাড়ী করিলে ভিত ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। বাড়ীর উচ্চতা কতটা হইবে তাহার উপর নির্ভর করে ভিত কতটা গভীর হইবে। কারণ উপর-তলার সমস্ত ভারই ভিতের উপর পড়ে। সাধারণ দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ীর জন্য তিন ফুট গভীর খাদ খনন করা হয়। তারপর দেওয়াল যত মোটা হইবে তাহার চারিগুণ চওড়া দেওয়াল সিমেণ্ট ও বালি দিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হয়। ইহাই হইল প্রকৃত ভিত (foundation)। গাঁথনি ভূ-পৃষ্ঠের তল পর্যন্ত হইলে দেওয়াল ড্যাম্প-প্রুফ করিবার জন্য নিশ্ছিদ্র উপাদান দিয়া ড্যাম্প-প্রুফ স্তর গাঁথিতে হয়। সাধারণতঃ সিমেণ্ট, বালি এবং পাথর কুচি দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। তাহার উপর মাটির উপরের ভিত গাঁথা হয়। তাহাকে বলে 'base'। মাটির উপরের ভিত অপেক্ষা মাটির নীচের ভিত দ্বিগুণ মোটা হয়। জলা জমি, নীচু জমি অথবা বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ভিত উঁচু করিতে হয়। তারপর ঘরের দেওয়াল গাঁথা হয়। নীচের ঘরগুলির দেওয়াল উপরের ঘরের দেওয়াল অপেক্ষা মোটা হয়। চুন-সুরকির দেওয়াল যত মোটা করিতে হয়, বালি-সিমেণ্টের দেওয়াল তাহা করিবার প্রয়োজন হয় না। একতলার দেওয়ালের উচ্চতা সাধারণতঃ ৩·৬ মিটার বা ১২ ফুট হয়। বাড়ী যত বেশি তলা-বিশিষ্ট হইবে দেওয়ালও তত মোটা করিতে হইবে। ঢালাই ছাদের জন্য যত মোটা দেওয়াল প্রয়োজন, কড়ি-বরগা দেওয়া পেটাই ছাদের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক মোটা দেওয়াল প্রয়োজন। দেওয়াল গাঁথার সময় জানালা-দরজার খিলানগুলি কংক্রিট করিয়া জমাইয়া লইতে হয়; কারণ তাহার উপরই ছাদের ভার থাকে। দেওয়াল গাঁথা হইলে ছাদ ঢালাই হয়। পাথর-কুচা, সিমেণ্ট এবং লোহার শিক দিয়া ছাদ জমানো হয়। তারপর সুরকি ও জল দিয়া পিটাইয়া জলছাদ তৈয়ারি হয়। বাড়ী প্রস্তুত হইলে কাঠের জানালা-দরজা বসানো হয়। জানালা তিন প্রকার হইতে দেখা যায়—(১) লম্বা শিক দেওয়া জানালা—ইহা প্রায় মেঝের ১৫ সে.মি. (৬") উপর হইতে বসানো হয়। (২) আজকাল গ্রিল দেওয়া চওড়া মার্কিন-জানালার প্রচলনই অধিক। (৩) ইহা ভিন্ন আওয়াজি জানালাও কোন কোন ঘরে বসানো হয়। ইহার পর মেঝে প্রস্তুত হয়। পাকা বাড়ীর মেঝে সাধারণতঃ সিমেণ্টের বা মোজাইকের করা

হয়। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি ব্যয়বহুল, কিন্তু সুন্দর, মসৃণ এবং মজবুত। সর্বশেষে দেওয়ালে রং দেওয়া, বাহিরে প্রাচীর প্রস্তুত করা, আলো-জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হয়।

ইহা তো গেল ইটের পাকা বাড়ী নির্মাণের পদ্ধতি। কিন্তু ইট ছাড়াও কাঠ, মাটি এবং পাথরের বাড়ী হইতে পারে।

কাঠের বাড়ী—শীতপ্রধান দেশে কাঠের বাড়ী প্রস্তুত করা হয়। কারণ ইহা শীততাপনিয়ন্ত্রক। কিন্তু ইটের বাড়ীর মতো ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইহার কোন ভিত প্রয়োজন হয় না। মেঝে এবং দেওয়াল কাঠের হয়। ছাদও কাঠের হয়। তাহার উপর অনেক সময় টালি দিয়া আর একটি ছাদ করা হয়। জানালা-দরজাগুলি হালকা ধরনের হয়।

মাটির বাড়ী—স্বল্প ব্যয়ে করা যায় বলিয়া অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তি মাটির বাড়ী নির্মাণ করে। মাটির বাড়ীতেও ভিতের প্রয়োজন হয় না। দেওয়াল শুধু মাটি দিয়া অথবা বাখারির উপর মাটি ধরাইয়া খাড়া করা হয়। মাটির ঘরের ছাদ বাঁশের কাঠামোর উপর গোলপাতা বা খড় অথবা টালি সাজাইয়া করা হয়। অনেকে টিনের চালও করে। মাটির বাড়ীর জানালা ছোট ছোট ও মেঝে মাটির হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে দেওয়াল 'উলুটি' করিয়া মসৃণ করা হয় এবং গেরিমাটি দিয়া সুন্দর রং করা হয়। সাঁওতালদের প্রস্তুত মাটির বাড়ী দেখিবার মতো সুন্দর হয়।

পাথরের বাড়ী—পাহাড় অঞ্চলে যে স্থানে সুলভে পাথর পাওয়া যায় সেখানে পাথরের বাড়ী প্রস্তুত করা হয়। পাথরের বাড়ীর দেওয়াল পাথরের এবং ছাদ শ্লেট পাথরের হয়। মেঝে সিমেন্ট করা থাকে বা কাঠের হয়। দরিদ্র পরিবারগুলি পাথরেরই মেঝে করে। জানালা-দরজা ছোট এবং কাঠের হয়।

অনুশীলনী

E. ১৯৬০ (৭) নূতন বাড়ীর পরিকল্পনা করিবার সময় (a) বাড়ীর গঠন, (b) বায়ু-সঞ্চালন, (c) নরদামার ব্যবস্থার কথা বিশেষ করিয়া চিন্তা করা উচিত কি? তোমার উত্তরের পশ্চাতে কারণ দেখাও।

উঃ সং—(a) বাড়ীর গঠন, (b) বায়ু-সঞ্চালন, (c) নরদামার ব্যবস্থার প্রয়োজন কি এবং কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বিশদ ভাবে লিখিতে হইবে।

E. ১৯৬৪ (৭) বসতবাড়ীর জন্য স্থান নির্ণয়ের পূর্বে কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করিতে হইবে তাহা বল। ঘরগুলিতে আলো এবং বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা কেমন করিয়া করিবে, দুইটি উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও।

উঃ সং—(১) স্থাননির্বাচন—ভূমি, পরিবেশ, অবস্থান। (২) আলোর ব্যবস্থা—বৈদ্যুতিক আলো, তৈলের আলো। (৩) বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা—স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক উপায়।

E. ১৯৬৫ (Comp.) (৭) বসতবাড়ীর নকশা প্রস্তুতের সময় নরদামা, জলসরবরাহ এবং অনাময় ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ পদ্ধতির কথা চিন্তা করিবে ?

উঃ সং—(১) নরদামার ব্যবস্থা—পাকা নরদামা, সোক পিট প্রভৃতি।

(২) জল—কলের জল, কূপ, নলকূপ প্রভৃতি।

(৩) অনাময় ব্যবস্থা—শুষ্ক আবর্জনা অপসারণ, তরল মল অপসারণ—পায়খানার ব্যবস্থা।

E. ১৯৬৫ (Comp.) (৯) সুপরিকল্পনার দ্বারা তুমি কেমন করিয়া রন্ধনশালায় শ্রম এবং সময় বাঁচাইতে পার ?

উঃ সং—(১) অবস্থান, (২) মেঝে ও দেওয়াল, (৩) জানালা-দরজা, (৪) নরদামা, (৫) চুল্লী, (৬) তাক বা আলমারি, (৭) সরঞ্জাম-বিন্যাস।

E. ১৯৬৭ (৭) গৃহ নির্বাচনের সময় তুমি কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করিবে ? স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ কাহাকে বলে ?

উঃ সং—(১) গৃহ নির্বাচনের সময় দেখিতে হইবে—বাড়ীর ভূমি, পরিবেশ, অবস্থান, আয়তন, আভ্যন্তরীণ নকশা, বায়ু-সঞ্চালন, আলো, জল, নরদামা, অনাময় ব্যবস্থা।

(২) স্বাস্থ্যসম্মত বাড়ীর সংজ্ঞা।

সজ্জা-বিন্যাসের নীতি
(Art Principles)

মানুষের সৌন্দর্য-স্পৃহা স্বাভাবিক। সে সব কিছুই সুন্দর দেখিতে চাহে এবং সব কিছুই সুন্দরভাবে করিতে চাহে। এইজন্য যেখানে তাহারা বাস করে সেই ঘর-দুয়ার, উদ্যান, আঙ্গিনা প্রভৃতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখে। সজ্জা-বিন্যাসের উপর সৌন্দর্য-সৃষ্টি নির্ভর করে। তাই সজ্জা-বিন্যাসের মূল নীতিগুলি সকল গৃহিণীর জানা উচিত।

সজ্জা-বিন্যাসের মূল নীতি পাঁচটি। যথা—(১) মিল (harmony), (২) আনুপাতিক সমতা (proportion), (৩) ভারসাম্য (balance), (৪) ছন্দ (rhythm) ও (৫) বিশেষ আকর্ষণ (emphasis)।

মিল (Harmony) : সৌন্দর্য সৃষ্টির মূল কথা মিল। প্রতিটি সজ্জা-দ্রব্যের মধ্যে যদি একটি একতার সুর বজায় না থাকে তাহা হইলে খাপছাড়া দেখায়। তাই সজ্জা-বিন্যাসের সময় বিভিন্ন সজ্জাদ্রব্যের মধ্যে যাহাতে মিল থাকে তাহা গৃহিণী দেখিবেন। সজ্জাদ্রব্যগুলির আকার, রং, গঠন ইত্যাদির মধ্যে মিল থাকিলে তবে উহাদের সমন্বয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। সব কিছুর মধ্যে মিল হইলে কোন জিনিস বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এবং কোন কিছু বিচ্ছিন্ন মনে হয় না। সবগুলি মিলিয়া-মিশিয়া মানুষের মনকে আকর্ষণ করে।

আনুপাতিক সমতা (Proportion) : "Proportion is the relationship of space to one another."—অর্থাৎ দুই স্থানের আয়তনের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপরই আনুপাতিক সমতা নির্ভর করে। ঘরের মাপের সহিত আসবাব-পত্রের মাপের এবং আসবাব-পত্রগুলির পরস্পরের মাপের অনুপাত ঠিক হইলে আনুপাতিক সমতা রক্ষা হয়। আসবাব-পত্রগুলি মেঝের কতখানি স্থান দখল করিল, পরস্পরের কতটা দূরে রহিল তাহার উপরও আনুপাতিক সমতা নির্ভর করে। যেমন—পুষ্প-বিন্যাসের সময় পুষ্পবৃন্তগুলির মাপ পুষ্পাধারের দৈর্ঘ্যের দেড়গুণ উচ্চ হইলে পুষ্পগুচ্ছের সহিত পুষ্পাধারের আনুপাতিক সমতা রক্ষা হয়। অবশ্য সব ফুল বা পাতাই যে দেড়গুণ লম্বা

হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। অধিকাংশ ফুল বা পাতার দৈর্ঘ্য দেড়গুণ হইলেই যথেষ্ট।

ভারসাম্য (Balance) : যে কোন জিনিসের মধ্যবিন্দু হইতে দুই দিকের ভার যদি সমান হয় তাহা হইলে ভারসাম্য রক্ষা হয়। এইজন্যই তুলাযন্ত্রের দুইদিকের ভার সমান থাকিলে কাঁটাটি একদিকে হেলিয়া পড়ে না। সজ্জা-বিন্যাসের সময়েও যদি সজ্জা-বণ্টন এমন হয় যে কক্ষের কোন একটি দিক অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইলে কক্ষসজ্জার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। এইজন্য সজ্জাদ্রব্য সংস্থাপনের পূর্বে ঘরখানির মাঝখান দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া লইতে হয়, তারপর ঐ রেখার দুই পার্শ্বে সমভাবে সজ্জাদ্রব্য রাখিতে হয়। বণ্টনের সময় দুই-তিনটি জিনিসের উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার। যেমন—(১) সজ্জাদ্রব্যগুলির রং, (২) উহাদের আকার, এবং (৩) গঠন। উজ্জ্বল রং, বৃহদাকৃতি জিনিস, বিশেষ গঠন-নৈপুণ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই রং, আকার ও গঠন-বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিয়া সজ্জা-উপকরণগুলি বণ্টন করিলে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হয়। সজ্জা-বিন্যাস সমাপ্ত হইলে, কাল্পনিক মধ্য-রেখার উপর দাঁড়াইয়া সমগ্র কক্ষে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হয়। যদি কক্ষের কোন একটি দিকে দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। আর যদি রেখার উভয় দিকই সমভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

ছন্দ (Rhythm) : যেখানে গতি সেখানে ছন্দ। তাই মণ্ডন শিল্পের সার্থকতা উহার ছন্দে। ছন্দ-পতন ঘটিলে যে কোন রূপ সজ্জা ব্যর্থ হয়। গৃহ-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ছন্দ নির্ভর করে দৃষ্টির গতির উপর। দৃষ্টি যদি বিনা বাধায় বিভিন্ন সজ্জাদ্রব্যের উপর দিয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলে সজ্জা-বিন্যাস ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। একটি রং বা একই ধরনের কোন জিনিস কক্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করিলে দৃষ্টি স্বভাবতঃই একটি হইতে আর একটিতে বিচরণ করে। প্রথমেই একটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দৃষ্টি তাহার উপর স্থির হয়, তাহার পর ঐরূপ অন্য জিনিস কক্ষের অন্য স্থানে থাকিলে চক্ষু তাহার উপর গিয়া পড়ে। এইভাবে একটি হইতে আর একটিতে যখন দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যদি

এমন কিছু থাকে যাহা দৃষ্টির গতি-পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে ঐ জিনিস ছন্দ-পতন ঘটায়। চক্ষুর বিচরণ-পথ ধরিয়া কাল্পনিক রেখা টানিলে তাহা যদি বৃত্তাকার অথবা বিসর্পিল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ছন্দ রক্ষিত হইয়াছে। আর যদি ছেদক-রেখার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ছন্দ-পতন ঘটিয়াছে। যেমন—ঘূর্ণি, গোলাপের পাপড়ি, শঙ্খের আবর্ত ইত্যাদিতে ছন্দ আছে। এই সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টি বিনা বাধায় ঘুরিয়া আসিতে পারে, তাই সজ্জা-বিন্যাসের সময় পুনরাবৃত্তি এমনভাবে ঘটাইতে হয় যাহাতে দৃষ্টি বিচরণ-পথে কোথাও বাধা না পায়।

বিশেষ আকর্ষণ (Emphasis)ঃ রূপসজ্জার সামগ্রিক সার্থকতা নির্ভর করে উহার centre of attraction বা আকর্ষণের কেন্দ্রটির উপর। যে কোন কক্ষের সজ্জা-বিন্যাসের সময় এমন একটি জিনিস রাখিতে হইবে যাহা কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একবার মনোযোগ কোনও একটি সুন্দর জিনিসের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে সমস্ত সজ্জা-বিন্যাসকেই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ঐ আকর্ষণীয় সজ্জা-উপকরণটি অন্যান্য উপকরণ হইতে পৃথক হইবে। উহা রং বা নকৃশা বা গঠন-নৈপুণ্যে অভিনব হইবে। তবেই উহা সহজে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। কিন্তু একটি ঘরে মাত্র একটি আকর্ষণীয় জিনিস রাখা উচিত। একাধিক আকর্ষণীয় দ্রব্য রাখিলে দৃষ্টি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। সুতরাং প্রধান আকর্ষণ যাহা হইবে তাহা সমস্ত সজ্জাদ্রব্যের মধ্যে এক এবং অনন্য হওয়া প্রয়োজন।

ইহা যে কোন সজ্জাদ্রব্য হইতে পারে। যেমন—একখানি বিশেষ ছবি, একগুচ্ছ ফুল, একটি ফুলের ডাল, একটি আলোকাধার, বিশেষ একটি পুতুল, মূর্তি অথবা কোন একটি বিশেষ সংগ্রহ। আকর্ষণের দ্রব্যটি কক্ষের এমন স্থানে থাকিবে যেখান হইতে উহা সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

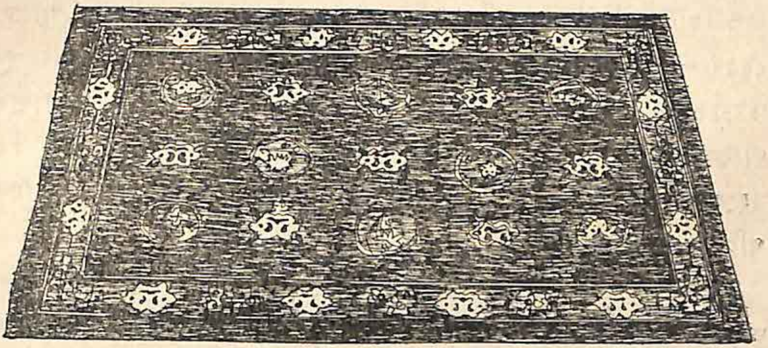
সজ্জা-উপকরণ

মেঝের সজ্জাঃ ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশে সাধারণতঃ মেঝে ঢাকিবার রেওয়াজ নাই। আধুনিক ধনী-গৃহে এবং শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশগুলিতেই মাত্র মেঝেতে কার্পেট পাতিবার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু

অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মেঝেতে কার্পেট অথবা অনুরূপ কিছু পাতা হয়।

মেঝে ঢাকিবার জন্য নানাপ্রকার জিনিস ব্যবহার করা হয়। যেমন—(১) কার্পেট, (২) লিনোলিয়াম, (৩) মাদুর বা পাটি, (৪) নকশা করা কম্বল (কাশ্মীরী গাব্বা ও নামদা), (৫) পশুচর্ম প্রভৃতি।

আর্থিক সামর্থ্য এবং প্রয়োজনমতো এই সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র নং—১৯ : কার্পেট

কার্পেট ঃ মেঝে সজ্জার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুন্দর উপকরণ হইল কার্পেট। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত সকল দেশে মেঝে সজ্জার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হিসাবে কার্পেট সমাদর পাইয়া আসিতেছে।

কার্পেট দুই প্রকার হয়—একটি অত্যন্ত দামী, অপরটি অল্প দামী।

দামী কার্পেট চট বা ক্যানভাসের উপর নানা রঙের পশম দিয়া বোনা হয়। চটের আসন বা কার্পেটের ছবি প্রস্তুতের মতোই ইহার বুনন-পদ্ধতি। বড় চট অথবা 'ক্যানভাস' ঝুলাইয়া, পশম দিয়া অনেকে একসঙ্গে নকশা তুলিয়া থাকে।

অল্প দামী কার্পেট ছোট ছোট তাঁতে বোনা হয়। ইহা পশম বা উলের সহিত তুলা মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয় বলিয়া খরচ কম পড়ে। প্রথমোক্ত কার্পেটই অধিক সুন্দর এবং ইহার আদরও বেশী। প্রাচীন কালে হাতে

বোনা কার্পেট-শিল্পের প্রচলন ছিল। এখনও তুরস্ক, পারস্য ও কাশ্মীরের কার্পেট পৃথিবী-বিখ্যাত।

কার্পেট ব্যবহারের সুবিধা—কার্পেট ব্যবহারের বহুল প্রচলন হওয়ার কারণ ইহার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা—(১) ইহা কক্ষের সর্বাপেক্ষা ভাল পটভূমি রচনা করিতে পারে। তাই মেঝে সজ্জার উপকরণের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। (২) কার্পেট সুন্দর, টেকসই, আরামদায়ক, গরম এবং নিঃশব্দ। (৩) কার্পেট নিঃসন্দেহে অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যের আকর্ষণ বাড়াইয়া দেয়।

কার্পেট ব্যবহারের অসুবিধা—তবে ইহার ব্যবহারে যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, তেমনি আবার কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যেমন—(১) কার্পেট অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। (২) কার্পেটের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ধুলা-বালি জমে এবং ইহার সহিত নানারূপ রোগজীবাণুও থাকিতে পারে। তাই ইহা অস্বাস্থ্যকর। (৩) কার্পেট অত্যন্ত ভারী হয়, সহজে তুলিয়া পরিষ্কার করা যায় না। (৪) কার্পেটে ঢাকা মেঝে নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

কার্পেট নির্বাচন ও ব্যবহার—যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা অবশ্যই কার্পেট ক্রয় করিবেন। কার্পেট নির্বাচন করিবার সময় কতকগুলি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে।

(১) কার্পেট ক্রয় করিবার সময় সর্বদা ভাল জিনিস ক্রয় করিতে হয়। তাহা না হইলে অতি অল্প দিনে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

(২) ঘরের মেঝের মাপ অনুযায়ী কার্পেট ক্রয় করা উচিত। কার্পেটের নকশাগুলির যেন ঘরের মাপের অনুপাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। কারণ কার্পেট সাধারণতঃ কক্ষের সমগ্র মেঝে জুড়িয়া থাকে। তাই উহার রঙ এবং নকশা কক্ষের মাপের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টি যত বেশী বিস্তৃত হয় জিনিসটি তত বড় দেখায়। বড় বড় নকশা থাকিলে ঘরখানিও বড় দেখাইবে। কার্পেটের রঙ ঘরের অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেমন—আলো যে ঘরে কম আসে সেই ঘরের জন্য উজ্জ্বল, হালকা রঙ নির্বাচন করিতে হইবে। ছোট ঘরের পক্ষে হালকা রঙ উপযোগী। কার্পেটের রঙ এমন হইবে যাহা সহজে অন্যান্য সজ্জা-দ্রব্যের রঙের সহিত মিলিয়া যায়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রঙ নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ রঙ অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণকারী হইলে

ইহা কক্ষ-সজ্জার পটভূমি হিসাবে আর থাকিবে না। ফলে অন্য সজ্জাদ্রব্যের সহিত রঙ মিলানো কঠিন হইবে। কার্পেটের রঙ এবং নকশার সহিত অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যের একটা মিল যেন থাকে। কিন্তু উহা অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যের রঙ এবং নকশাকে ছাপাইয়া যাইবে না। তবেই সমন্বয় সাধন সম্ভব হইবে, সমস্ত ঘরখানি সুন্দর দেখাইবে এবং কার্পেটখানি বিশেষভাবে চোখে পড়িবে না। কার্পেটের রঙ যেন ঘরের প্রয়োজন অনুযায়ী হয়। যেমন—বসিবার ঘরে কার্পেটের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা হইবে। সকল সময় ঘরে ব্যবহারের জন্য পাকা এবং ঘন রঙ-এর কার্পেট উপযোগী। এরূপ কার্পেটে সহজে দাগ ধরে না বা রঙ উঠিয়া যায় না।

কার্পেটের মাপ—৭ × ৬ মিটার ঘরের জন্য ৫·৫ × ৪·৫ মিটার কার্পেটের প্রয়োজন। সুতরাং ঘরের মেঝের মাপ অপেক্ষা কার্পেট ছোট আকারের হইবে।

কার্পেট পাতিবার নিয়ম—মেঝে পরিষ্কার করিয়া প্রথমে খবরের কাগজ বা অন্য কাগজ পাতিতে হইবে। খবরের কাগজের পরিবর্তে কীট নিবারক ফেল্ট কাপড়ও পাতা যায়। আবার কাগজ বা কাপড়ের পরিবর্তে প্লাস্টিকও ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা পোকায় কাটিতে পারে না এবং ইহার মধ্য দিয়া ড্যাম্প উঠে না। এইভাবে কার্পেটের নীচে কিছু পাতিলে উহা আরও নরম লাগে, শব্দ হয় না, মেঝের সহিত কার্পেটের ঘর্ষণ হয় না বলিয়া উহা বহুদিন টেঁকে, মেঝের ধূলা ময়লা কার্পেটে লাগে না, ঘরটি গরম থাকে।

লিনোলিয়ামঃ লিনোলিয়াম দেখিতে সুন্দর এবং মসৃণ। ইহা পরিষ্কার করা সহজ, কিন্তু গরম নহে। শীতপ্রধান দেশে তাই ইহা চলে না। গরম দেশে ইহা মেঝেতে পাতা যাইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে রান্নাঘর ও বাথরুমে কাঠের মেঝের উপর ইহা পাতা হয়। লিনোলিয়াম পাতিলে ড্যাম্প উঠে না। লিনোলিয়াম দুই প্রকার হয়— (১) প্লেন লিনোলিয়াম, (২) কর্ক লিনোলিয়াম।

লিনোলিয়াম পাতিবার নিয়ম—সাধারণতঃ কাঠের মেঝের উপর লিনোলিয়াম পাতা হয়। মসৃণ, পরিষ্কার মেঝেতে কাগজ পাতিয়া তাহার উপর লিনোলিয়াম পাতিতে হইবে। মেঝের মাপ অপেক্ষা লিনোলিয়াম

একটু ছোট হইবে। কারণ ইহা পাতিবার পর ইহার উপর ক্রমান্বয়ে চাপ পড়িয়া চ্যাপ্টাইয়া আকারে কিছু বাড়িয়া যায়।

সতরঞ্চি : ইহা সুতার তৈয়ারী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানা রঙ এবং নকশার সতরঞ্চি পাতার রেওয়াজ আছে। ইহা কার্পেট অপেক্ষা কম ভারী, তাই অপেক্ষাকৃত সহজে পরিষ্কার করা যায়। তবে ইহা কার্পেটের মতো গরম ও সুদৃশ্য নহে। তবুও ইহারা কক্ষের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী। শোঁয়া উঠা মোটা সতরঞ্চিগুলি কার্পেটের অনুকরণে প্রস্তুত হয়। তাই উহারা গরম না হইলেও, বেশ নরম এবং আরামদায়ক হয়। আমাদের দেশে ইহাতেই বেশ কাজ চলিয়া যায়। দাম কম বলিয়া সকলেই ব্যবহার করিতে পারে।

সতরঞ্চি নানাপ্রকার হয়—পাতলা, মোটা, শোঁয়াতোলা ইত্যাদি। আজকাল নারিকেল দড়ি, পাট, বাতিল পশম ইত্যাদি দিয়া নানারূপ মেঝে-ঢাকা বোনা হয়। এইগুলিতে নানা রঙ এবং নকশা দিয়া কার্পেটের অনুকরণে বোনা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র নারিকেল দড়ি দিয়া যেগুলি বোনা হয় সেইগুলি একটু খসখসে হয়। কিন্তু পাট ও টুকরা উল দ্বারা যাহা বোনা হয় সেইগুলি বেশ নরম এবং দামও কম হয়। মহীশূর রাজ্যে এই ধরনের ভারতীয় কার্পেট বোনার বহু প্রতিষ্ঠান আছে। দক্ষিণ ভারতে কোচিনের নিকট আলেপ্পিতে ও অন্যান্য স্থানে দড়ি দিয়া নানারূপ মেঝে-ঢাকা বোনা হয়।

কম্বল : পুরাতন কম্বলের উপর সুন্দর সুন্দর নকশা করিয়া কাশ্মীরীরা বিক্রয় করে। এইগুলিকে 'গাব্বা' বলে। পুরানো টুকরা পশম ও কম্বলের প্রস্তুত বলিয়া ইহাদের দাম কম হয়। এইগুলি বেশ গরম ও সুন্দর। অল্প দামে এই গাব্বাগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায় বলিয়া সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে, তবে খুব টেকসই নহে এবং পরিষ্কার করাও সহজ নয়।

মাদুর : মাদুর ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের প্রধান কুটীরশিল্পগুলির অন্যতম। ইহা এক প্রকার ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ শুকাইয়া লইয়া বোনা হয়। মোটা কাঠির ও মিহি কাঠির—এই দুই প্রকার মাদুরই পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের নকশা-করা মিহি মাদুর অতি সুন্দর। ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি উত্তম মেঝে-সজ্জার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইতে

পারে। মাদুরের রঙ এবং নকশাগুলি পটভূমি রচনার পক্ষে বেশ উপযোগী। তবে ইহা গরম নহে, তাই শীতের সময় চলে না। মাদুরের মতো পাটিও মেঝে ঢাকিবার খুব ভাল উপকরণ। ইহা অতি মসৃণ ও শীতল, তাই গরম কালে খুবই আরামদায়ক।

দেওয়াল-সজ্জা : শিল্পীর আঁকা ছবি বা অন্য কোন উপকরণ দিয়া দেওয়াল-সজ্জার রীতি সর্বদেশে সর্বকালে প্রচলিত আছে। দেওয়াল সজ্জা না করিলে আভ্যন্তরীণ গৃহ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না।

দেওয়াল-সজ্জার জন্য নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন—বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি, ওয়ালপ্লেট, ফটো বা আলোক-চিত্র, দর্পণ, সুন্দর সূচী-কার্য বা কোন সূক্ষ্ম বোনা কাপড়, দেওয়াল-ফুলদানি ইত্যাদি। এই সকল উপকরণের মধ্যে শিল্পীর আঁকা ছবি সহজে মানুষের মন আকর্ষণ করে।

চিত্র নির্বাচন : চিত্র নির্বাচনের সময় কতকগুলি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১) চিত্রের বিষয়বস্তু—বাসগৃহের যে কোন কক্ষের জন্য চিত্র নির্বাচন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে উহার বিষয়-বস্তুর কথা ভাবিতে হয়। কারণ বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ঘরের উদ্দেশ্যের সহিত ছবির বিষয়-বস্তুর মিল বা সাদৃশ্য থাকা চাই। যেমন—পূজার ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি, শয়ন-কক্ষে নৈসর্গিক শোভার চিত্র, শিশুর ঘরে জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখী, পরী, ফুল প্রভৃতির ছবি বেশ উপযোগী। কিন্তু যে ছবি বাসগৃহের উপযোগী নহে, তাহা ঘরের সহজ ঘরোয়া ভাব নষ্ট করে। যেমন—ধর্মপ্রচারের ছবি বা কোন বিশেষ রাজার অত্যাচারের ছবি, প্রভৃতি বাসগৃহে না রাখাই ভাল। তবে কোন পরিবারের মনের নিজস্ব সুরের সহিত যদি চিত্রের মিল হয় তাহা হইলে উহা রাখা যাইতে পারে। যেমন—কোন পরিবার যদি ধর্মপ্রাণ হয়, তাহা হইলে সেই পরিবারের বসিবার ঘরে ধর্মীয় ছবি টাঙ্গাইলে বেমানান হয় না।

সাধারণ নীতি হিসাবে যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ছবিই নির্বাচন করা উচিত। কারণ ইহা আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার সহিত সহজে খাপ খায়। মানুষের মনেও ইহাদের আবেদন চিরন্তন। ফুল, ফল, পাখী, প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতির ছবিকে নৈর্ব্যক্তিক ছবি বলা হয়।

(২) **চিত্রের রং**—চিত্রের রঙও ঘরের রং-এর উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। শান্ত অথচ আনন্দপূর্ণ, স্থির অথচ উৎসাহব্যঞ্জক রঙই বাসগৃহের উপযোগী। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত রুচির মূল্যও কিছুটা দেওয়া উচিত। শয়ন কক্ষের ছবিগুলির রঙ স্নিগ্ধ এবং শিশুর ঘরের ছবির বর্ণ সমুজ্জ্বল হইলে ভাল হয়। ছবির রঙের সহিত অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যেরও মিল থাকা দরকার।

(৩) **মিল**—বিষয়-বস্তুর দিক হইতে সামঞ্জস্য নাই এমন দুইখানি ছবি এক ঘরে টাঙ্গাইতে নাই। আলোকচিত্র বা ওয়ালপ্লেট টাঙ্গাইবার সময় এই একই নীতি অনুসরণ করিতে হয়।

ছবি টাঙ্গাইবার নিয়ম ঃ সজ্জা-বিন্যাসের সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ মিল, ছন্দ, অনুপাত, সমন্বয় প্রভৃতির কথা ছবি টাঙ্গাইবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে। ছবির ফ্রেমের আকার ও ছবির রঙের সহিত দেওয়ালের আকার ও রঙ এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের আকারের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। একই দেওয়ালে অধিক-সংখ্যক ছবি টাঙ্গাইলে বড় দৃষ্টিকটু লাগে। এছাড়া একাধিক ছবি মনোযোগকে বিভক্ত করে। ফলে ছবিগুলিকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপভোগ করা যায় না। তাই এই বিষয়ে জাপানীদের আদর্শ অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাঁহারা একটি ঘরে একখানি মাত্র ছবি টাঙ্গাইয়া থাকেন।

ছবি টাঙ্গাইবার সময় আরও কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা উচিত। যেমন—(১) ছবি এমনভাবে টাঙ্গাইতে হয় যাহাতে ছবির মধ্যভাগ ঠিক দর্শকের চোখের তলের সমান হয়। (২) একই দেওয়ালে যদি অধিক ছবি টাঙ্গানো হয় তাহা হইলে লক্ষ্য রাখিতে হয় ছবিগুলির ফ্রেমের উপরের অংশ যেন একটি সরল-রেখায় থাকে। (৩) যেখানে কোন আসবাব আছে তাহার ঠিক উপরের দেওয়ালে ছবি টাঙ্গাইলে ছবিগুলির উপরের অংশ এক সরল-রেখায় না রাখিয়া ছবিগুলির ফ্রেমের তলার অংশ এক সরল-রেখায় রাখিতে হয়। (৪) ছবি এমন ভাবে টাঙ্গাইতে হয় যাহাতে পেরেক অথবা ঝোলানোর দড়ি বাহির হইতে দেখা না যায়। (৫) ছবির পশ্চাদ্‌ভাগ দেওয়ালের সহিত লাগিয়া থাকিবে, ছবি সম্মুখে ঝুলিয়া থাকিবে না।

ছবি বাঁধানোর সময়ও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। তেল রং-এর

ছবি বাঁধানোর সময় মূল ছবি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহারই ধার ঘেঁষিয়া ফ্রেম থাকিবে। কিন্তু জল রং-এর ছবি এবং তাহার ফ্রেমের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকিবে। এই ব্যবধান সাদা অথবা ছবির মূল রং-এর সহিত খাপ খাওয়াইয়া রঙ্গিন বোর্ডের হইবে। এই ব্যবধানটুকুর জন্যই ছবিটি দেওয়াল এবং ফ্রেম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নিজেকে দর্শকের নিকট তুলিয়া ধরিতে পারে।

ফটো অথবা ওয়ালপ্লেট টাঙ্গাইবার সময়ও এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার।

জানালা ও দরজার পর্দা নির্বাচন ও বিন্যাস

সুসভ্য সমাজে গৃহ-বিন্যাসের অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্দা। এইজন্য পর্দা ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা থাকা দরকার।

পর্দার কাজঃ পর্দার কাজ প্রধানতঃ দুইটি—(১) আব্রু-রক্ষা ও (২) সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

(১) **আব্রু-রক্ষা**—গৃহ কেবল মানুষের আশ্রয়-স্থলই নহে, এখানে তাহারা নিজের মতো করিয়া থাকিতে চাহে। গৃহজীবন একান্তভাবেই ব্যক্তি-গত। মানুষ জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিতে চাহে না। এইজন্য গৃহের আব্রু-রক্ষার প্রয়োজন আছে। পর্দা আব্রু রক্ষা করে।

(২) **সৌন্দর্য-সৃষ্টি**—পর্দা দ্বারা কক্ষের আলোক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পর্দার রং, মাপ ও আকৃতি দ্বারা কক্ষের ও জানালার বহু ত্রুটি ঢাকিয়া দেওয়া যায়। পর্দার রং ও নকশা কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অতএব গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ পর্দা।

পর্দার প্রকার-ভেদঃ পর্দা দুই প্রকার—(১) বড় ভারী পর্দা এবং (২) হালকা পাতলা পর্দা। প্রথম পর্দাকে ইংরাজিতে বলে 'ড্রেপারি' আর দ্বিতীয়টিকে বলে 'গ্লাস কার্টেন'। প্রথম পর্দার কাজ আব্রু রক্ষা এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বিতীয়টির কাজ জানালার শোভা বর্ধন। তাই জানালাটি রাস্তার দিকে না হইলে 'গ্লাস কার্টেনের' প্রয়োজন হয় না। বড় ভারী পর্দা গৃহসজ্জার পটভূমি রচনা করে। তাই পর্দার ভূমিকা গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার রং নির্বাচনঃ পর্দা কক্ষের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকে।

তাই ইহার রং যতদূর সম্ভব মৃদু এবং নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। দেওয়ালের রং-এর সমগোত্রীয় রং সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উজ্জ্বল বিবাদী রং-এর পর্দার সহিত অন্যান্য সজ্জা-সামগ্রীর রং-এর সমন্বয় সাধন কঠিন হইয়া পড়ে। হালকা ধূসর, মৃদু হলুদ, এলা এবং অতি ফিকা গেরুয়া রং পর্দার পক্ষে উপযুক্ত। গ্লাস কার্টেনের রং উজ্জ্বল হইলে ক্ষতি হয় না। তখন উহা বিশেষ আকর্ষণ (emphasis) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। অবশ্য অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যের রং-এর সহিত উহার সামঞ্জস্য থাকা চাই। পর্দা ছাপা কাপড়েরও হইতে পারে। তবে আসবাবপত্রের আচ্ছাদন যদি ছাপা কাপড়ের হয়, তাহা হইলে পর্দার কাপড় এক রং-এর হইবে। দুইটিই ছাপা হইলে বড় খারাপ লাগে এবং আকর্ষণও কমিয়া যায়। নকশা-কাটা কাপড়ের পর্দা করিলেও নকশাগুলির রং এবং আকার যেন অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণকারী না হয়। তাহা হইলে পর্দা আর পটভূমি হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

পর্দা ঝুলাইবার নিয়ম ঃ সমতা রক্ষা করিতে হইলে জানালার মাপের সহিত পর্দার কাঁটছাটের সামঞ্জস্য থাকা চাই। পর্দা নানা ছাঁটের হইতে পারে, কিন্তু সব ছাঁট সব জানালার উপযোগী নহে। যেমন—ছোট জানালায় বড় ছাঁটের পর্দা লাগানো উচিত নহে। কাপড় কিনিয়া প্রথমে হাতে করিয়া জানালায় ধরিয়া দেখিতে হইবে যে উহা ঠিক হইয়াছে কি-না। তাহার পর ছাঁটিয়া সেলাই করিতে হইবে। আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট লম্বা জানালায় এমন পর্দা লাগাইতে হইবে যাহাতে—(১) পর্দা জানালার নীচের চৌকাঠ স্পর্শ করে। (২) লম্বা লম্বা ভাঁজ পড়ে, ভাঁজের উপরের মাথাগুলি সব এক লাইনে থাকে। (৩) পর্দা গুটাইয়া দুই ধারে সরাইয়া দিলে লম্বা ভাঁজের সরল-রেখাগুলি আপনা হইতে উপরের দিকে ভাঙিয়া ছোট ছোট রেখা সৃষ্টি করিবে। অথচ নীচের দিকের ভাঁজ লম্বাই থাকিবে। কিন্তু চৌকা জানালায় যদি Fig C আকৃতি বিশিষ্ট পর্দা লাগানো যায় তাহা হইলে জানালাটিকে ভারাক্রান্ত দেখাইবে। আবার ছোট চৌকা জানালায় যদি অর্ধেক পর্দা লাগানো যায় তাহা হইলে উহা আরও ছোট দেখাইবে। অতএব (ক) জানালার পর্দার ঝুল জানালার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী স্থির হইবে। (খ) ড্রেপারির ক্ষেত্রে ঝুল সকল সময় মেঝে পর্যন্ত হইবে। মেঝে পর্যন্ত পর্দা করিলে জানালা, দরজাগুলিকে ঘরের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া মনে হয়। আর তাহা

না হইয়া পর্দার ঝুল ছোট হইলে জানালাগুলিকে যেন আলাদা মনে হয়। একমাত্র 'গ্লাস কার্টেনে'র ক্ষেত্রে জানালার চৌকাঠ পর্যন্ত ঝুলের পর্দা করা

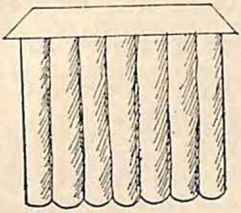


Fig A

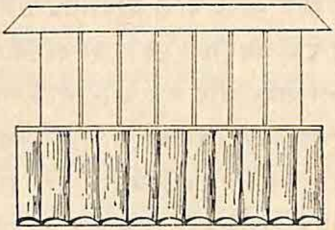


Fig D

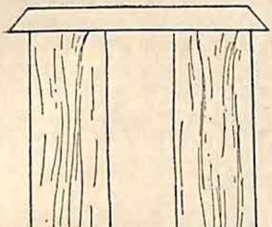


Fig B

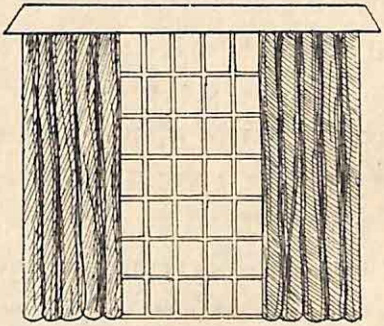


Fig E

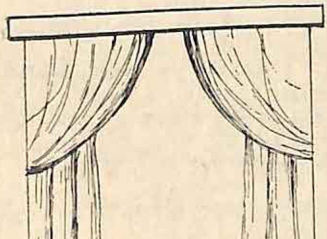


Fig C

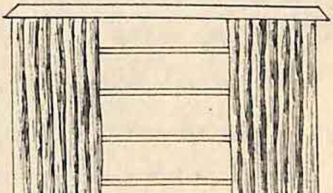


Fig F

চিত্র নং—২০ : পর্দা টাঙ্গাইবার নিয়ম

চলে। (গ) মনে রাখা দরকার, আমাদের পোশাকের মতো পর্দাও জানালার পোশাক। ইহা ফিট-মাপ না হইলে জানালাকে বেমানান দেখায়। পোশাকের

কাট-ছাঁটের কলা-কৌশলে যেমন শীর্ণকায় ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ সবল দেখানো যায় বা খর্বাকৃতিকে দীর্ঘাকৃতি দেখানো যায়, ঠিক তেমনি জানালার পর্দার ডিজাইনের দ্বারা জানালার ত্রুটি ঢাকিয়া দেওয়া যায়। পর্দার কাপড়ে নকশা যদি লম্বা লম্বা হয় তাহা হইলে দর্শকদের চক্ষু উপর হইতে নিচে বার বার পরিভ্রমণ করে এবং জানালাটি লম্বা দেখায় (FigA)। জানালাটি চওড়া দেখানোর প্রয়োজন হইলে পর্দার দণ্ডটি জানালা অপেক্ষা প্রস্থে বড় রাখিতে হয়। পর্দা দুই ধারে ঠেলিয়া দিলে, দণ্ডের বাড়তি অংশে উহা জমা হয় এবং মাঝখানে কেবলমাত্র জানালার অংশটি ফাঁকা থাকে। তখন মনে হয়, পর্দার আড়ালে জানালার খানিকটা অংশ থাকিয়া গিয়াছে। তাই জানালাটি চওড়া দেখায় (Fig F)। পর্দার কাপড় যদি এড়ো ডুরে বা এড়ো নকশার হয়, তাহা হইলেও জানালাটিকে চওড়া দেখায়। (ঘ) পর্দার দ্বারা জানালার অভাব ঢাকা যায়। যদি ঘরে জানালা কম থাকে তাহা হইলে দুইটি জানালার মাঝখানের দেওয়ালে জানালার মাপে বড় ড্রেপারি টাঙ্গাইতে হয়। ইহার ফলে মনে হয় উহার পশ্চাতে একটি জানালা আছে।

পর্দার কাপড় সংগ্রহ ঃ পর্দার কাপড় কিনিবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত—(১) কোন্ পর্দা—ড্রেপারি না গ্লাস কার্টেনের জন্য কাপড় দরকার। দুইটির জন্য সম্পূর্ণ দুই রকম কাপড় কিনিতে হয়। (২) পর্দা পটভূমি বা বিশেষ আকর্ষণ, কি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। (৩) জানালার আকার কিরূপ ও মাপ কত—সেই অনুযায়ী কাপড়ের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। (৪) কাপড়টি জলে পড়িলে কতটা কমিবে। (৫) কাপড়ের রং উপযোগী কি-না। বিশেষ করিয়া গ্লাস কার্টেনের কাপড় কিনিবার সময় আলোর বিরুদ্ধে ধরিয়া দেখিতে হয় আলোক প্রতিফলনে কিরূপ রং সৃষ্টি হইতেছে। (৬) কাপড়ের জমিনের সহিত অন্যান্য আচ্ছাদনের সামঞ্জস্য আছে কি-না। কারণ দুই কাপড়ের জমিনের পার্থক্য বেশী হইলে দৃষ্টিকটু হয়। (৭) কাপড়ের রং পাকা কি-না। (৮) কাপড়ের পরিমাণ স্থির করিবার সময় কেবল জানালার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, উহার ভাঁজ ও সেলাইয়ের কথাও মনে রাখিতে হইবে। জানালার প্রস্থে দুই বা আড়াই গুণ কাপড় লইলে তবে ভাঁজ ঠিক পড়ে। এ ছাড়া সেলাইয়ের জন্য কয়েক ইঞ্চি কাপড় বেশী ধরা উচিত।

পুষ্পবিন্যাস

ফুল সুন্দর—পত্রশোভিত ফুল আরও সুন্দর। অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য এবং সুগন্ধের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সকল মানুষের মনকে ইহা আকর্ষণ করে। সামান্য একগুচ্ছ পত্রশোভিত পুষ্প কক্ষের শোভা ও সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত করে। তাই পত্র-পুষ্প গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ।

পুষ্পবিন্যাসের নীতিঃ পুষ্পবিন্যাস সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে উহা শিল্পসম্মত হওয়া প্রয়োজন। শিল্পসৃষ্টির সাধারণ নিয়মগুলি তাই এ-ক্ষেত্রেও অনুসরণ করিতে হয়। যেমন—

(১) প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্পবিন্যাস—যে ঘরে যেমন প্রয়োজন সেই ঘরে সেইরূপ ফুলপাতা সাজাইতে হইবে। খাইবার টেবিলে চ্যাপটা ফুলদানিতে ভাসমান পুষ্পসজ্জা করিতে হয়। তাহা হইলে ভোজনকারীদের মুখ আড়াল হয় না। তেমনই বাহিরের ঘরের মাঝের টেবিলে বড়



চিত্র নং—২১ঃ পুষ্পবিন্যাস

ফুলদানিতে বড় ও উজ্জ্বল রং-এর ফুলের তোড়া মানানসই হয়। রোগীর ঘরে শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ উপযোগী, শয়ন-কক্ষে পুষ্প অপেক্ষা পত্রসজ্জা করিলে স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে উহা অধিক সাহায্য করে। পড়িবার ঘরে উজ্জ্বল ফুল মনে উৎসাহের সৃষ্টি করে।

(২) একটি ঘরে একাধিক পুষ্পবিন্যাস করা উচিত নহে। তাহাতে দর্শকের আকর্ষণ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়।

(৩) পুষ্পবিন্যাস এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উহা কক্ষ-সজ্জার অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। কক্ষের অন্যান্য সজ্জার রং ও গঠনের সহিত পুষ্পগুচ্ছটির সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে তবে ইহা সম্ভব। পুষ্পবিন্যাসের সময় কক্ষের প্রত্যেকটি ছোটখাটো সজ্জাদ্রব্যের রং ও গঠনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পত্র-পুষ্প নির্বাচন করিতে হইবে এবং পুষ্পগুচ্ছটির আকৃতি স্থির করিতে হইবে।

(৪) পুষ্পাধার নির্বাচন—পুষ্পগুচ্ছের সহিত পুষ্পাধারের রং ও গঠনের মিল থাকিবে। যেমন—লম্বা গঠনের ফুলদানিতে দীর্ঘ বৃন্তের পুষ্প-পত্র অধিক মানানসই হয়। চ্যাপটা ফুলদানিতে সংক্ষিপ্ত বৃন্তের ফুলগুলি মানায়। পুষ্পগুচ্ছ অপেক্ষা পুষ্পাধার কখনও আকর্ষণীয় হইবে না। পুষ্পাধার পুষ্পের পটভূমির কাজ করে। পুষ্প অপেক্ষা উহা অধিক আকর্ষণীয় হইলে পুষ্পবিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যে কোন নিরপেক্ষ রং-এর অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ফুলদানি হইলে আদর্শ পুষ্পবিন্যাস করা যায়। ফুল সাজাইবার জন্য দামী ফুলদানির প্রয়োজন নাই; ছোটখাটো বহু পরিত্যক্ত জিনিস এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন—বাঁশের টুকরা, কাঁচের গ্লাস, হরলিক্সের শিশি, ফলের টিন, জলের বোতল প্রভৃতি।

পুষ্পবিন্যাসের পদ্ধতি ঃ ফুলদানিতে ফুল ও পাতাগুলি সাজাইবার সময় সজ্জাবিন্যাসের পাঁচটি নীতি অনুসরণ করিতে হয়। যথা—(১) যে সকল ফুল সাজানো হইবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে রং ও গঠনের সামঞ্জস্য থাকিবে।

(২) উজ্জ্বল ও মৃদু রং-এর ফুল এবং ছোট ও বড় ফুল এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে পুষ্পবিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

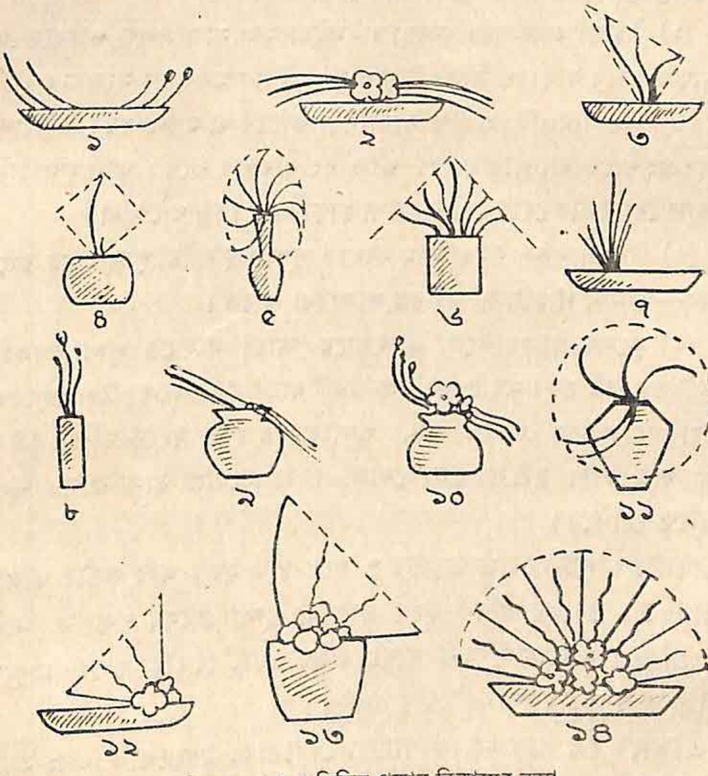
(৩) পুষ্পাধারের সহিত এবং ফুলপাতার পরস্পরের সহিত যেন আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকে। পুষ্প স্তবকটি পুষ্পাধার অপেক্ষা দেড়গুণ উঁচু হইবে। পুষ্পাধারটির বৃত্তের যা মাপ হইবে পুষ্পগুচ্ছটির বৃত্তের মাপ তার দেড়গুণ হইবে।

(৪) একই প্রকার ফুল বা একই রং-এর ফুলের ব্যবহার একটি পুষ্প-

গুচ্ছে একাধিকবার করিতে হইবে। পুনরাবৃত্তি এমনভাবে হইবে যাহাতে বিন্যাস ছন্দোময় হয়।

(৫) একটি বিশেষ আকর্ষণায় ফুল তোড়াটির মাঝামাঝি ব্যবহার করিতে হইবে।

শুধুমাত্র ফুল কখনও ব্যবহার করিতে নাই। সকল সময় পুষ্প পত্র-শোভিত করিতে হয়। প্রকৃতিতে গাছে যেমনভাবে ফুল ফুটিয়া থাকে, সাজাইবার সময় যতদূর সম্ভব সেইরূপ করিতে পারিলে বিন্যাস অধিকতর মনোরম হয়।



চিত্র নং—২২ : বিভিন্ন প্রকার বিন্যাসের নক্সা

ফুল সাজাইবার সময় ফুলদানির প্রান্তভাগ (brim) এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে যে, পুষ্পগুচ্ছটিকে পুষ্পাধারেরই একটি অংশ মনে হইবে।

পুষ্পগুচ্ছটিকে একটি আকৃতি দিতে হইবে—যেমন, চূড়াকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি অর্থাৎ ইংরাজী 'এল' (L) অক্ষরটির মতো, বা দেবীপ্রতিমার চালচিত্রের মতো অথবা কোন জীবজন্তুর মুখের মতো প্রভৃতি।

এজন্য ফুল সাজাইবার যে সমস্ত ফ্রেম পাওয়া যায় তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

জাপানী পুষ্পবিন্যাস রীতিঃ জাপানীরা পুষ্পবিন্যাসে বিশেষ পারদর্শী। তাই তাহাদের ফুল সাজাইবার নিয়ম শিখিবার বিষয়।

(১) গাছে যে ভাবে, যে ছন্দে ফুল ফুটিয়া থাকে জাপানীরা ঠিক সেই-ভাবে ফুলদানিতে ফুলটি সাজাইবার চেষ্টা করে।

(২) উহারা জমকালো ফুলপাতা লইয়া ফুল সাজাইবার পরিবর্তে অতি অনাড়ম্বরভাবে সাধারণ কয়েকটি ফুল সুন্দর রুচিসম্মতভাবে সাজায়।

(৩) ফুলদানিগুলি অত্যন্ত সাদাসিধা কাঠের বা মাটির হয়। উহাতে হয় কোন রং থাকে না, আর না হয় কাল রং ব্যবহার করে। কাল ফুলদানিতে সামান্য সোনালীর ছোট ছোট নকশা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

(৪) উহারা সকল সময় অসম সংখ্যক পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পুষ্পাধারে রাখে। যেমন—তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বৃন্ত সাজাইয়া থাকে।

(৫) ফুলের ডালগুলিকে এমনভাবে কাটে যাহাতে পুষ্প স্তবকটিতে তিনটি স্তর সৃষ্টি হয়। সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্তরটি থাকে কেন্দ্রস্থলে। উহা ঋজুরেখায় উঠিয়া গিয়া সামান্য হেলিয়া পড়ে। পুষ্পাধারের কেন্দ্র হইতে যদি একটি লম্ব টানা যায় তাহা হইলে উহা সোজা গিয়া সর্বোচ্চ ডালটির সর্ব শীর্ষের ফুলটিতে ঠেকিবে।

দ্বিতীয় ডালটি সর্বোচ্চ ডালটির ¾ অংশ দীর্ঘ হয়। আর তৃতীয় ডালটির দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় স্তবকের অর্ধেক হয়। জাপানী পুষ্পবিন্যাসের পশ্চাতে নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। সর্বোচ্চ স্তবকটি স্বর্গের ইঙ্গিত দেয়, দ্বিতীয় গুচ্ছটি মানুষের প্রতীক, আর তৃতীয় বৃন্তটি ধরিত্রীর প্রতীক।

এইভাবে ফুল সাজাইয়া জাপানীরা দেবলোক, মনুষ্যলোক এবং মাটির পৃথিবীকে প্রণতি জানায়।

বিভিন্ন কক্ষের পুষ্প-বিন্যাস

ঘর	স্থান	ফুলপাতা	প্যাটার্ন	মন্তব্য
১। বৈঠকখানা ঘর	মাঝের গোল টেবিল	সুগন্ধি বড় উজ্জ্বল রং-এর ফুল, যেমন—গোলাপ, ডালিয়া, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, পদ্ম, পলাশ	পিরামিড—নং (৬) ত্রিভুজ নং (৩) চূড়া	আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উজ্জ্বল সুগন্ধি ফুল দেওয়া হয়। সকল দিক হইতে তোড়াটি দেখা যায় বলিয়া ঐ তিনটি প্যাটার্ন উপযোগী।
২। শয়ন-কক্ষ	ওয়ার্ডরোবের বা ক্যাবিনেট কেসের মাথায়	অল্প মৃদু গন্ধযুক্ত শান্ত নিরপেক্ষ রং-এর ফুল। পত্র অধিক অথবা কেবলমাত্র বাহারি পাতা, যেমন—অপরাজিতা, করবী, সুইট পি (sweet pea) ও অন্যান্য ফুল	হাতপাখা—নং (১২ ও ১৩) চালচিত্র—নং (১৪)	শয়ন-কক্ষের শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সবুজ পাতা অথবা মৃদু-গন্ধ শান্ত রং-এর ফুল বিশেষ উপযোগী।

ঘর	স্থান	ফুলপাতা	প্যাটার্ন	মন্তব্য
৩। খাইবার ঘর	খাইবার টেবিল	মৃদু গন্ধ, উজ্জ্বল রং-এর পত্রবহুল, সংক্ষিপ্ত বৃন্তের ফুলসজ্জা	চ্যাপ্‌টা ফুলদানিতে ভাসমান পুষ্পসজ্জা —নং ১ এবং নং ২	ফুলের উগ্র গন্ধ খাদ্যদ্রব্যের গন্ধের সহিত মিশাইলে খারাপ লাগে। বড় ফুলের তোড়া ভোজনকারীদের মুখ আড়াল করে। ফুলের উজ্জ্বল রং আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।
৪। রোগীর ঘর	ছোট টেবিল অথবা তে-পায়ার উপর	সুগন্ধি সাদা ফুল—রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, বেল, জুঁই, কুন্দ, চামেলী	ফুলদানি লম্বা হইলে নং ৮ ফুলদানি ছোট হইলে ৯ এবং ১০ (শেষোক্ত ফুল-গুলির ক্ষেত্রে)	সাদা সুগন্ধি ফুল রোগীর রোগ-যন্ত্রণাময় জীবনে বৈচিত্র্য আনে। ফুলের গন্ধ রোগীর ঘরের নানা জীবাণুনাশক দ্রব্যের কটু গন্ধ ঢাকিয়া দেয়।

৫। শিশুর ঘর	ছোট ওয়ার্ডরোব অথবা কোণের টেবিল	সুগন্ধি, উজ্জ্বল বর্ণের ফুল, যেমন—রঙ্গিন সুইট পি, প্যান্সি, লিলি এবং অন্য ঋতুর ফুল। বোগুন-ভিলা, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, ডালিয়া প্রভৃতি	জীবজন্তুর মুখ। তাসের টেক্কা বা ডিম্বাকৃতি। নং ৪, ৫	শিশুরা আনন্দের পূজারী। উজ্জ্বল রং ও গন্ধ তাহাদের ঘরে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। কল্পনাবিলাসী শিশুর ঘরে জীব-জন্তু, মিকিমাউসের অনুকরণে পুষ্প-বিন্যাস তাহাদের আনন্দ দেয়। অমূর্ত কিছু তাহারা ধারণা করিতে পারে না; তাই পুষ্প-বিন্যাস বাস্তব হওয়া দরকার।
৬। পড়িবার ঘর	বুককেসের উপর বা কোণের টেবিল	সাদা বা হালকা রং-এর ফুল। যেমন—রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ অথবা হালকা নানা রং-এর ঋতুর ফুল (season flower)	রজনীগন্ধা হইলে নং ৮ অন্য ফুল—নং ১৪	পড়িবার সময় শান্ত ও স্থির পরিবেশ প্রয়োজন; তাই স্নিগ্ধ রং ও গন্ধের ফুলই উপযোগী।

সজ্জা-সহায়ক
(Accessories Articles)

সজ্জা-দ্রব্যের ত্রুটি বা অভাব ঢাকিবার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয় সেইগুলিকে সজ্জা-সহায়ক বলে। কার্পেট, পর্দা, ছবি, আসবাবপত্র ইত্যাদি কক্ষ-বিন্যাসের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এই সকল সজ্জা-উপকরণের কোন ত্রুটি বা অভাব ঢাকিবার জন্য অথবা বিন্যাস সুষ্ঠু করিবার জন্য বা বর্ণ পরিকল্পনা সঠিক করিবার জন্য সজ্জা-সহায়ক অবশ্য প্রয়োজন। যেমন—আলোর ঢাকনা, বিশেষ ধরনের পুতুল, খেলনা, সংগ্রহ, কিউরিও, ফসিল, ফুল, গাছের ডাল, দেওয়াল-ফুলদানি, রেডিওর ঢাকনা, ছোটখাটো লোক-শিল্পের নিদর্শন, মূর্তি প্রভৃতি সজ্জা-সহায়কের কাজ করে।

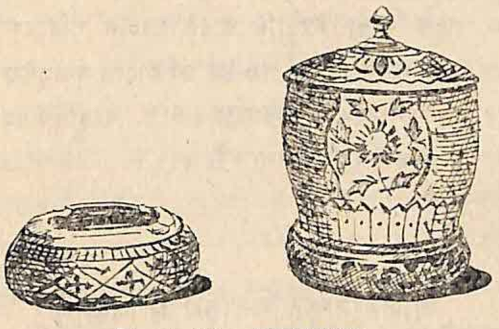


চিত্র নং—২৩ : সজ্জা-সহায়ক

সজ্জা-সহায়কের ভূমিকা : (১) ইহারা সজ্জা-উপকরণের ত্রুটি ঢাকিয়া দেয়। যেমন—যদি কোন পরিবার আর্থিক অসুবিধার জন্য খাটের পরিবর্তে তক্তাপোশ ব্যবহার করে তাহা হইলে একখানি সুদৃশ্য বেড-কভার দিয়া তক্তাপোশটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দিলে, উহা যে খাট নহে উপর হইতে হঠাৎ তাহা বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে বেড-কভারখানি সজ্জা-সহায়কের কাজ করে।

তেমনি পালিশ-উঠা টেবিলটি টেবিল-ক্লথ দ্বারা ঢাকিয়া উহার ত্রুটি আড়াল করা যায়। দেওয়ালের গায়ে কোন স্থানে গর্ত থাকিলে বা রং চটিয়া গেলে ওয়াল-ভাস বা ওয়াল-প্লেট লাগাইলে ত্রুটি ঢাকিয়া যায়।

(২) সজ্জা-সহায়ক সজ্জা-উপকরণের অভাব পূরণ করে। যেমন—ছবির অভাব জীবজন্তুর মুখ, কাঠের বা ধাতুমূর্তির মুখোশ টাঙ্গাইলে পূরণ হয়। ফুলদানির পরিবর্তে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, ফসিল, মূর্তি ইত্যাদি টেবিলে রাখা যায়। খাওয়ার টেবিলে ফুলের পরিবর্তে ফলের বাস্‌কেট রাখিলেও চলিয়া যায়।



চিত্র নং—২৪ : সজ্জা-সহায়ক

সহায়ক-সজ্জাদ্রব্য বর্ণ পরিকল্পনায় সাহায্য করে। বর্ণ পরিকল্পনার সময় বিভিন্ন পর্দার (shade) উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল রংগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, যাহাতে ভারসাম্য রক্ষা পায়। অধিকাংশ স্থানে নিরপেক্ষ রং ব্যবহার করিয়া সংক্ষিপ্ত স্থানে উজ্জ্বল বর্ণালী ব্যবহার করিলে তবেই ভার-সাম্য রক্ষা হয়। যেমন—আলোর ঢাকনা, প্লাস্টিকের ফুলের গুচ্ছ, মূর্তি, মুখোশ প্রভৃতি সজ্জা-সহায়কের রং টকটকে লাল, কমলা, সবুজ ইত্যাদি হইলে বর্ণ-পরিকল্পনা সার্থক হয়।

(৪) ছোটখাটো সজ্জাদ্রব্যগুলি কক্ষ-বিন্যাসে ছন্দ সৃষ্টি করিতে সর্বাধিক সাহায্য করে। একই গঠন অথবা রং-এর ক্ষুদ্র সজ্জাদ্রব্যগুলি ঘরের বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে উহাদের উপর দিয়া বিনা বাধায় চক্ষু বিচরণ করিতে পারে। ঐ দ্রব্যগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে সহজে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দৃষ্টি একটি হইতে আর একটিতে আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে ছন্দোময় রেখার উদ্ভব হয়।

(৫) সজ্জা-সহায়কগুলি সর্বাপেক্ষা সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে তখনই যখন ইহাদিগকে সমগ্র কক্ষসজ্জার আকর্ষণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহাদের রং ও গঠন-নৈপুণ্য সাধারণতঃই আকর্ষণীয় হইয়া থাকে। তাই কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুতুল, ঘোড়া, হাতির অনুকরণে প্রস্তুত জিনিস-গুলি, পাহাড়ী বা আদিবাসীদের শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তুত মুখোশ, অস্ত্র, পর্দার কাপড় প্রভৃতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৬) পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সজ্জা-সহায়কগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কার্পেট, ছবি, অজন্তার ভঙ্গিমায় আঁকা ছবি, ভারতের নিজস্ব রং গেরুয়া-মেরুন, সবুজ সাদা ইত্যাদি ঘরের প্রাচীন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। মুখোশ, অস্ত্র-শস্ত্র, পশু-চর্ম জমকালো মধ্যযুগীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার ফুল-ফল সমেত চেরিগাছের ডাল, আধুনিকতম লোকশিল্পের নিদর্শন, কিউরিও আধুনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আসবাবপত্র নির্বাচন ও বিন্যাস
(Household Furnishings)

প্রত্যেক গৃহেই কিছু না কিছু আসবাবপত্র প্রয়োজন হয়। তাই আসবাব-পত্র নির্বাচন ও বিন্যাস সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মেয়েরই প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আসবাবপত্র রাখার প্রধান উদ্দেশ্য আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা এবং কক্ষের শ্রীবৃদ্ধি করা। তাই আসবাবপত্র সংগ্রহের মূল নীতি হইবে প্রয়োজন রক্ষা এবং সৌন্দর্য-বৃদ্ধি। যে আসবাব কেবলমাত্র দেখিতে সুন্দর কিন্তু ব্যবহারের উপযোগী নহে, তাহা ক্রয় করার কোন অর্থ হয় না। আবার স্থূল দিকটি মাত্র বিচার করিয়াও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা উচিত নয়। মানুষের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করিবে, রুচিবোধ উন্নত করিবে এমন আসবাবই সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রয়োজন—(Utility)—পরিজনবর্গের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আসবাব প্রয়োজন। তাই যে কক্ষে যেরূপ আসবাব থাকিলে মানুষের

সর্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে সেই ঘরে সেইরূপ আসবাব রাখিতে হইবে, যেমন— বসিবার ঘরে আরামদায়ক সোফা-সেট বা চেয়ার-টেবিল অথবা দেশী কায়দায় চৌকি এবং তাহার উপর মোটা গদি, তাকিয়া প্রভৃতি। এই ঘরে বসিয়া বাহিরের অতিথি-অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় এবং নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করা হয়। তাই এই ঘরে রেডিওগ্রাম, অর্গান বা পিয়ানো অথবা গ্রামোফোন প্রভৃতি মনোরঞ্জনের উপযোগী বাদ্যযন্ত্রও থাকিবে। কিন্তু শয়ন-কক্ষে মানুষ বিশ্রাম করে। সেখানকার পরিবেশ হইবে আরামদায়ক কিন্তু স্নিগ্ধ। তাই সে-ঘরে সুনিদ্রার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন খাট বা চৌকি ও বিছানা, তাছাড়া ড্রেসিং-টেবিল, আলমারি এবং আরাম-চেয়ার প্রভৃতি। আবার পড়ার ঘরে চেয়ার-টেবিল এমন হইবে যাহাতে পিঠ সোজা করিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভঙ্গিতে পড়াশোনা করা যায়, সেখানে আলোর ব্যবস্থা এবং বুক কেস বা বই-এর আলমারি থাকিবে।

দাম সস্তা বলিয়া অথবা কেবলমাত্র দেখিতে সুন্দর বলিয়া কোন জিনিস ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উহা অযথা ভীড় বাড়াইয়া কক্ষটিকে ভারাক্রান্ত করে, অন্য আসবাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহাকে কক্ষ-মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রাখাও যায় না। অত্যধিক আসবাবপত্র একই কক্ষ-মধ্যে থাকার ফলে পরিষ্কার করিতেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে অযথা সময় এবং শ্রম নষ্ট হয়।

সৌন্দর্য (Beauty)—আসবাবপত্রগুলি যেমন প্রয়োজন মিটাইবে, তেমনি সৌন্দর্যবোধকেও তৃপ্ত করিবে। তাই আসবাবগুলি সুন্দর হওয়া দরকার। সৌন্দর্যের প্রধান কথা সরলতা। খুব কারুকার্য খচিত জবড়জঙ্গ জিনিস মানুষের রুচিবোধকে পীড়িত করে, চক্ষুকে ক্লান্ত করে, মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই যতদূর সম্ভব আসবাবপত্রগুলি হইবে সরল ও অনাড়ম্বর। উহার সাংগঠনিক রেখাগুলি যতদূর সম্ভব সরল হইলে ভাল হয়। সরল রেখার সমন্বয় সাধন অনেক সহজ। অন্যান্য সজ্জাদ্রব্যের সহিত ঐ বিন্যাস মিলানোও সহজ। কারুকার্যবিহীন আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখা যায়। কারণ ইহাতে ধুলা জমে না। আসবাবপত্রগুলির গঠন-নৈপুণ্য এবং ফিনিশিং (finishing) যেন উন্নত মানের হয়। তবে উহা সুন্দর হইবে। রেখা-বিন্যাসের সময় মিল, ছন্দ, সমতা, সামঞ্জস্য বজায় রাখিলে তবেই উহা সম্ভব।

তাই আসবাব নির্বাচনের সময় শিল্পী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করা প্রয়োজন।

কাঠের আসবাবপত্রের পালিশের উপর ফিনিশিং অনেকখানি নির্ভর করে। পূর্বে যে কোন রং দিয়া পালিশ করা হইত। তাহাতে কাঠের 'গ্রেন' (grain) বা আঁশগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইত না। কিন্তু আজকাল রং ছাড়া কেবলমাত্র চাঁচগালা দিয়া হালকা পালিশ করা হয়—তাহাতে ঐগুলি অনেক বেশী উজ্জ্বল হয় এবং কাঠের নিজস্ব গ্রেনগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাদা পালিশ এইজন্য সুন্দর, অনাড়ম্বর এবং নিরপেক্ষ। ইহার সহিত ঘরের অন্য সজ্জাদ্রব্যের রং মিলানোও সহজ হয়। কাঠের ছাড়া বেতের বা স্টিলের আসবাবও ব্যবহার করা হয়। এইগুলিতে রং ব্যবহার করিতেই হয়। বেতের নিজস্ব রং বজায় রাখিয়া যে কোন ভার্নিশ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। তাহা না হইলে এনামেল পেন্ট ব্যবহার করাও চলে। অন্য জিনিসের রং-এর সহিত মানাইয়া রং নির্বাচন করা উচিত। স্টিলের আসবাবগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ রং লাগানো থাকে।

টেকসই আসবাব—আসবাব ক্রয়ের সময় প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য ছাড়াও আরও দুই-একটি কথা বিবেচনা করিতে হয়, যেমন—আসবাবটি যথেষ্ট মজবুত কিনা দেখা দরকার। সেগুন, শিশু, ওক, মেহগনি প্রভৃতি কাঠের আসবাবপত্র মজবুত অথচ হালকা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব কাঠই আসবাব তৈয়ারির জন্য ব্যবহার হয়। তবে দামে সস্তা করিবার জন্য অনেক সময় কাঁঠাল ও আমকাঠ ব্যবহার করা হয়। ইহারা পলকা নহে, তবে অত্যন্ত ভারী।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায় আমাদের দেশে টীক বা সেগুনের আসবাবপত্রই ভাল। এগুলির দাম সাধ্যের মধ্যে, পালিশ ভাল, হালকা এবং মজবুত হয়। তবে সকল সময় কাঠের উপর আসবাবপত্রের দৃঢ়তা বা দীর্ঘস্থায়িত্ব নির্ভর করে না। তৈয়ারির সময় ঠিকমতো জোড়গুলি লাগাইলে আসবাব সহজে ভাঙে না। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে ঠেস লাগানো অথবা যেখানে যেমন সেইরকম মোটা বা পাতলা তক্তা লাগানোর জন্যও জিনিস মজবুত হয়। কিনিবার সময় এইসব দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তবে আসবাব ক্রয় করা উচিত।

বেতের আসবাব লইবার সময় দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, উহার সবটাই বেতের, না বাখারির উপর পাতলা করিয়া চাঁচা বেত জড়ানো আছে। বাঁশের উপর বেত জড়ানো থাকিলে অল্প দিনে বেত খুলিয়া যায় এবং বাঁশেও ঘূন ধরে। তাই বেতের চেয়ার-টেবিল কিনিতে হইলে সম্পূর্ণ বেতের জিনিসই কেনা উচিত।

স্টিলের আসবাবপত্র সর্বাপেক্ষা টেকসই। আজকাল স্টিলের সকল প্রকার আসবাবই পাওয়া যায়। সামর্থ্যে কুলাইলে স্টিলের আসবাব কেনা যাইতে পারে। তবে অন্য সকল জিনিসের মতো এই আসবাবগুলিও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে হয় যে উহার জোড় বা সংযোগ-স্থলগুলি বেশ ভালভাবে লাগানো হইয়াছে কিনা।

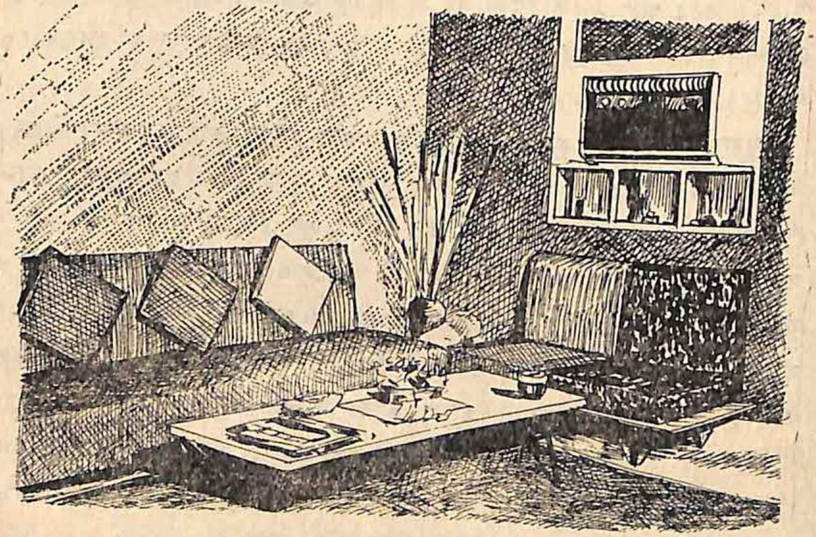
মূল্য—দাম বেশী হইলেই যে জিনিস ভাল হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অনেক সময় বিদেশী জিনিস বলিয়া দাম বেশী হয় অথবা কোন কোম্পানীর বিশেষ সুনাম থাকার জন্য দাম বেশী হয় বা বিশেষ করিয়া ঐ সময় বাজারে ঐ জিনিসটি কম আমদানি হইলেও দাম বেশী হয়। বাজারে আমদানি কম এমন জিনিস ক্রয় না করিয়া যে জিনিসটি প্রচুর পাওয়া যাইতেছে তাহা যদি প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় তাহাই ক্রয় করা উচিত। ইহাতে ন্যায্য মূল্যে ভাল জিনিস কিনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সস্তায় বাজে জিনিস কখনই ক্রয় করিতে নাই। দুইদিন পরেই উহা ভাঙিয়া যায়। তখন আবার ক্রয় করিতে হয়। টাকা কম থাকিলে বরং একটি একটি করিয়া জিনিস কেনা ভাল।

বিভিন্ন ঘরের সজ্জা-বিন্যাস

বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা—প্রবেশ-দ্বারের নিকটে, উদ্যানের পাশে, রাস্তার ধারে এই ঘর হওয়া বাঞ্ছনীয়। গৃহের সর্বাপেক্ষা ভাল ঘর-খানি বসিবার ঘর করিতে হয় ও মূল্যবান রুচিসম্মত আসবাবপত্র দিয়া সাজাইতে হয়। পরিবারের সম্ভ্রম এই কক্ষের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ এই ঘরেই বাহিরের সম্ভ্রান্ত অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়-স্বজনকে অভ্যর্থনা করা হয়। এই ঘর দেখিয়াই তাহারা পরিবারটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা করিয়া লয়।

ঘরের মেঝে সুন্দর মোজাইক করা থাকিলে মেঝেতে পাতিবার জন্য কার্পেটের তেমন প্রয়োজন হয় না। তাহা না হইলে আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কার্পেট, সতরঞ্চি, মাদুর বা দড়ির খেশ যা হয় সংগ্রহ করিতে হয়।

দেওয়াল মসৃণ হইবে। মাটি, কাঠ বা চুন-সুরকির কাজ-করা ইটের দেওয়াল, যাহাই হউক, উহাতে সুন্দর রং বা দেওয়াল-পত্র দিয়া ঢাকিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে মাটির দেওয়াল হয়। পাট, চিটাগুড় এবং এঁটেল মাটি দিয়া তাহারা দেওয়ালে এমনভাবে প্রলেপ দিয়া থাকে যে উহা পঙ্খের কাজ



চিত্র নং—২৫ : বসিবার ঘর

করা পাকা দেওয়াল অপেক্ষা মসৃণ হয়। এইরূপ প্রলেপকে দেওয়ালে উলুটি করা বলা হয়। দেওয়াল শুকাইলে লালমাটি আনিয়া দেওয়াল নিকানো হয়। ঈষৎ লালচে, কমলা রং-এর দেওয়াল ডিসটেম্পার করা দেওয়াল অপেক্ষা কম সুন্দর হয় না।

শীতপ্রধান দেশে বসিবার ঘরের দেওয়াল কাঠেরও হইতে পারে। কাঠের দেওয়ালে দেওয়াল-পত্র লাগাইতে হয়। বসিবার ঘরের দেওয়ালের দেওয়াল-পত্রের রং এবং নকশা উজ্জ্বল ও উৎসাহব্যঞ্জক হইবে। যেমন—সোনালী, কমলা, গোলাপী, হলুদ প্রভৃতি। ইটের দেওয়ালে ডিসটেম্পার দেওয়ার সময়ও এই রংগুলি পছন্দ করিতে হয়।

জানালা দরজাগুলি বড় বড় হইবে। উহাদের রং কালচে সবুজ বা হালকা নীল অথবা ছাই রং-এর হইবে। আবার দেওয়ালের রং-এর ঘন পর্দার (deep shade) রংটি জানালা-দরজার কাঠগুলিতে ব্যবহার করা চলে।

বাহিরের ঘর রাস্তার দিকে হইলে এবং পূর্ব-দক্ষিণ খোলা হইলে জানালা-দরজায় ভারি পর্দা এবং ছোট পাতলা কার্টেন (curtain) দুই-ই লাগাইতে হয়। হালকা পাতলা ছোট পর্দাগুলি আলোক নিয়ন্ত্রণ করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং বড় ড্রেপারী (drapery) আব্রু রক্ষা করে। পর্দার রং দেওয়ালের রং-এর অনুরূপ কোন রং হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে উহা দেওয়ালের সহিত এক সুরে ঘরের পটভূমি রচনা করে। অবশ্য জানালার পর্দা সুন্দর নেট বা পাতলা কোন ছাপা কাপড়ে করিলেই ভাল হয়।

বসিবার ঘরে বসিবার জন্য আরামদায়ক আসবাব থাকিবে। সোফা, সেটী, ডিভান প্রভৃতি ছাড়াও ছোটখাটো টেবিল, কাঁচের আলমারি, বুক-কেস, রেডিও বা অর্গান রাখিতে হয়।

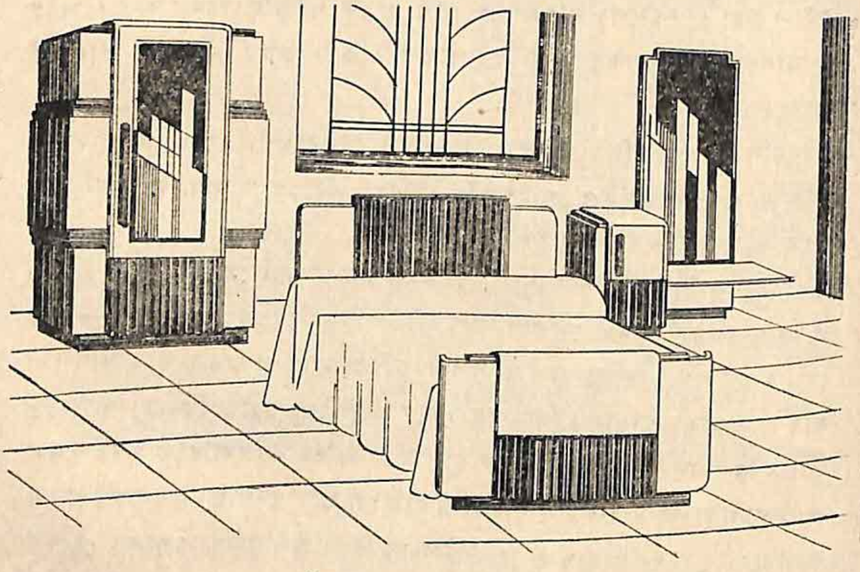
আর্থিক দিক হইতে অসুবিধা থাকিলে তক্তাপোশে মোটা গদি ও তাহার উপর সুন্দর চাদর দিয়া ঢাকিয়া, কয়েকটি তাকিয়া দেওয়া যায় এবং কাঠের চেয়ার রাখিয়া তাহাতে তুলার কুশান করিয়া সুন্দর কুশান-কভার লাগানো যায়। অনেক আধুনিক পরিবার বেতের টেবিল-চেয়ার কিনিয়া তাহাতে তুলার কুশান দিয়া সোফার কাজ চালান। কাঁচের আলমারিতে সুন্দর পুতুল ও দেশবিদেশের সংগ্রহগুলি সাজাইয়া রাখিলে ভাল দেখায়। বুক-কেস অথবা ক্যাবিনেট-কেসের মাথায় বা ছোট টিপয়ের উপর ফুল রাখিলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়া যায়। বাহিরের ঘরের পুষ্প-বিন্যাস যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল রং-এর ফুল দিয়া জমকালো করিতে হয়। যেমন—নানা রং-এর মরসুমী ফুল, গোলাপ প্রভৃতি।

দেওয়ালে দুই-এক খানি ওয়াল-প্লেট বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র রাখিলে ভাল দেখায়, কিন্তু ইহার বেশী ছবি না রাখাই ভাল। এক কথায় ঘরের সমস্ত সজ্জা-বিন্যাসের মধ্য দিয়া যেন আরাম, উৎসাহ, আনন্দ এবং সৌন্দর্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শয়ন-কক্ষ

কর্মক্লান্ত মানুষ ঘরে বিশ্রাম করে। তাই এই ঘর হইবে নির্জন, শান্ত ও স্নিগ্ধ। তবেই মানুষ বিনা বাধায় বিশ্রাম করিয়া আগামী দিনের কাজের জন্য শক্তি ও উৎসাহ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

বড় রাস্তা বা বাড়ীর কোলাহলপূর্ণ স্থান হইতে শয়ন-কক্ষ দূরে হইবে। দেওয়ালের রং নরম আকাশী নীল বা সমুদ্রের মতো ঈষৎ সবুজ হইলে ভাল হয়। তীব্র আলোক যাহাতে না আসে তাহার জন্য দরজায় কোন নিরপেক্ষ রং-এর পর্দা থাকিবে। গরম দেশে শয়ন-কক্ষের মেঝেতে কিছু পাতিবার



চিত্র নং—২৬ : শয়ন-কক্ষ

প্রয়োজন হয় না। শীতের দিনে রঙ্গিন কম্বল পাতা যায়। শয়ন-কক্ষের আসবাব হিসাবে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি এবং বেড-সাইড টেবিল থাকা উচিত। খাটের পরিবর্তে চৌকি অনেকেই ব্যবহার করেন। শয়ন-কক্ষে পুষ্প-বিন্যাসে সবুজের সমারোহ থাকিলে শ্রান্ত চক্ষু তৃপ্ত হয় তাই পত্রবহুল পুষ্পসজ্জাই এই ঘরের উপযোগী।

দুই-একখানি আলোক-চিত্র অথবা স্নিগ্ধ বর্ণালীর সাহায্যে অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা ওয়াল-প্লেট দেওয়ালে টাঙ্গাইতে হইবে। আলোর

শেড, আসবাবপত্রের পালিশ ইত্যাদি কোন কিছুতেই উগ্রতা থাকিবে না। সব কিছু মিলাইয়া যেন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক একটা সরল-স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

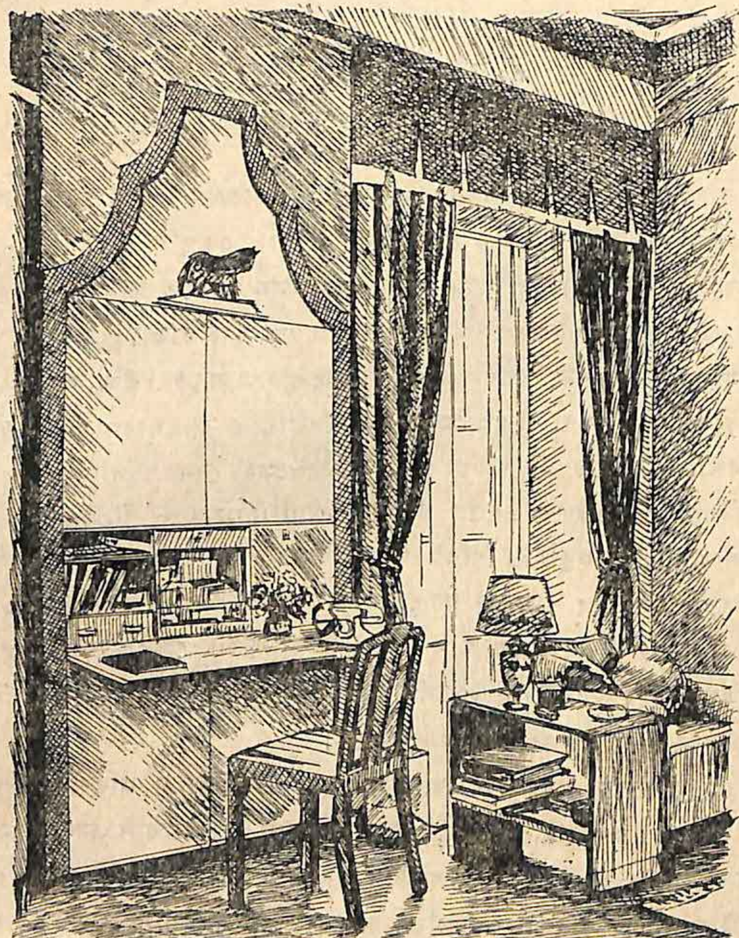
বহুমুখী ঘর
(Multipurpose Room)

বাড়ীটি বড় হইলে সকল প্রকার কাজের জন্য স্বতন্ত্র ঘর রাখা সম্ভব। কিন্তু যে পরিবার ছোট বাড়ীতে বাস করে তাহারা এতগুলি ঘর পায় না। তাহাদের একখানি বা দুইখানি ঘরেই সকল কাজ করিতে হয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শহরাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ছোট বাড়ীতে বাস করে। একমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী পরিবার ছাড়া বাকী সকলে মাত্র দুই-একখানি ঘর লইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সজ্জা-বিন্যাস ও আসবাবপত্রের সংস্থান এমনভাবে করিতে হইবে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই যেন ঘরখানি ব্যবহার করা যায়। ইংরাজীতে এইরূপ ঘরকেই Multipurpose Room বলে। বাংলায় আমরা বহুমুখী বা বিভিন্ন কাজের ঘর বলিতে পারি।

শয়ন-কক্ষ এবং পড়িবার ঘর যে বাড়ীতে স্বতন্ত্র রাখিবার সুযোগ নাই সেই বাড়ীতে শয়ন-কক্ষের জানালার নিকট পড়িবার টেবিল এবং চেয়ার পাতিতে হইবে। একটি টেবিল-বাতি এবং একখানি বুক-কেস রাখিলে নির্জনে পড়াশোনার কাজে কোন অসুবিধা হয় না।

যে পরিবারের শয়ন-কক্ষ এবং বৈঠকখানা ঘর আলাদা করিবার উপায় নাই অর্থাৎ একখানাই মাত্র ঘর, সেই বাড়ীতে আসবাবপত্রগুলি এমন ধরনের সংগ্রহ করিতে হইবে যাহা সহজে ভাঁজ করা যায় এবং একটি আসবাব আর একটি আসবাবে পরিণত করা যায়। অধিকাংশ স্টিলের আসবাব ভাঁজ করা যায়। যেমন—সোফা। পিঠে হেলান দেওয়ার অংশ খুলিয়া নামাইয়া সোজা করিয়া দিলে উহা খাট হিসাবে রাত্রে ব্যবহার করা যায়। সেণ্টার টেবিল ভাঁজ করিয়া রাখা যায়। দিনের বেলা একখানি বড় সোফা এবং দুইখানি ছোট সোফা ও সেণ্টার টেবিল দিয়া বৈঠকখানা সাজানো হইল। দেওয়ালের ভিতর দেওয়াল-আলমারি করিয়া আরশির কাঁচ বা Mirror লাগানো

হইল। তাহার টানা পাল্লা করা হইল এবং উপর দিয়া বড় পর্দা করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বুক-কেস, টেবিল, চেয়ার যথাস্থানে সাজানো হইল। রাত্রে সোফাগুলি খুলিয়া দিলে, ছোট দুইটি জুড়িয়া একখানি খাট হইবে।



চিত্র নং—২৭ : শয়ন-কক্ষে পড়িবার স্থান

আর বড়খানিতে আর একখানি খাট হইবে। পর্দা সরাইয়া দিলে আয়নার কাঁচ দেখা যাইবে। তাহা ড্রেসিং-টেবিলের কাজ করিবে এবং দেওয়াল-আলমারিগুলি পোশাক রাখার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

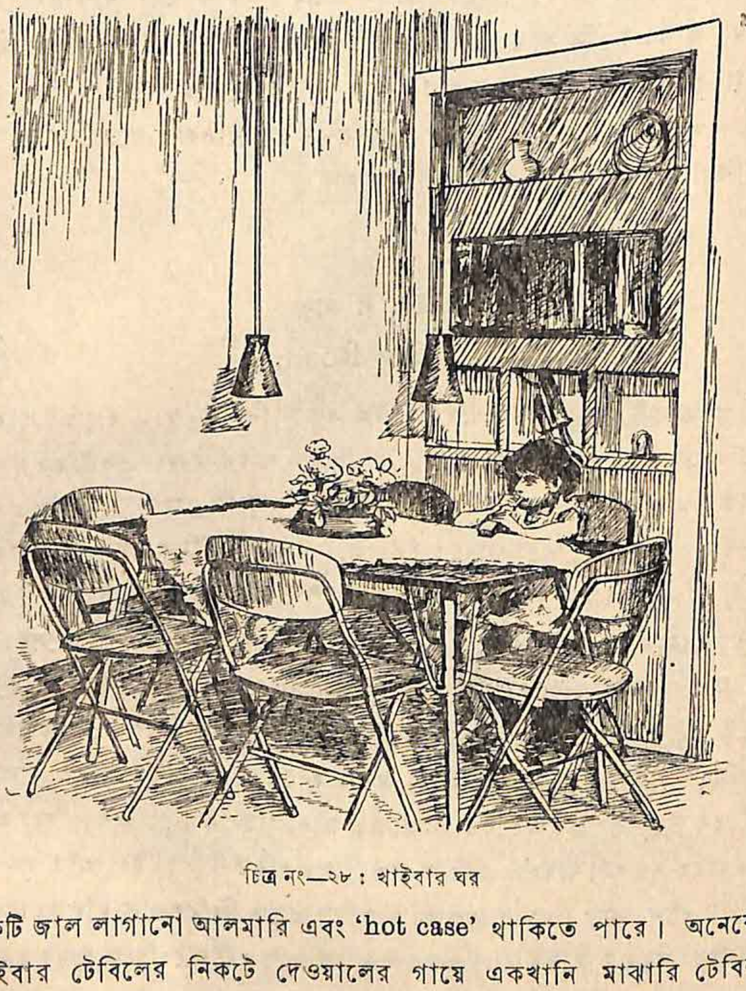
এরূপ গৃহে খাওয়ার ব্যবস্থা রান্নাঘরের একপাশে অথবা রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় করা যাইতে পারে। রান্নাঘরের একদিকের দেওয়ালে যদি কবজা দিয়া চওড়া তক্তা লাগানো থাকে, তাহা হইলে খাইবার সময় তুলিয়া ছিটকানি লাগাইয়া দিলে উহা টেবিলের কাজ করিতে পারে। ভাঁজ করা চেয়ার উহার পাশে খুলিয়া পাতিয়া দিলেই চলে। অনেকে বসিবার ও খাইবার জন্য একটি ঘর ব্যবহার করেন। এই অবস্থায় ঘরের মাঝখান দিয়া ভারী আসবাবগুলি সাজাইয়া যদি ঘরটি দুইভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সম্মুখভাগে বসিবার ঘর ও পিছনদিকে খাইবার ঘর করা যায়। অনেকে স্টিলের ভাঁজ করা চেয়ার-টেবিল বসিবার ঘরের মাঝখানে পাতিয়া খাইবার ঘরের কাজ চালাইয়া লন।

খাইবার ঘর
(Dining Room)

প্রত্যেকটি পরিবারেরই খাইবার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান আছে তাঁহারা নিশ্চয় খাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর ব্যবস্থা করিবেন। তাহা না হইলে রান্নাঘরের সম্মুখের দালান বা রান্নাঘরের একপাশে খাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে রান্নাঘরের নিকটেই খাইবার ঘর হওয়া উচিত। খাইবার ঘরের পরিবেশ সকল সময় আনন্দপূর্ণ, উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া প্রয়োজন। তাই যাহাতে প্রচুর আলো-হাওয়া আসিতে পারে সেইজন্য এই ঘরের জানালা-দরজাগুলি বেশ বড় হইবে। মেঝে পাকা হইবে। মেঝে হইতে তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত দেওয়ালে সিমেন্ট করা থাকিবে। দেওয়ালের রং উজ্জ্বল কমলা, সোনালী অথবা হলুদ হইলে স্বাভাবিক ভাবেই ঘরের পরিবেশ উৎসাহব্যঞ্জক হইবে। দরজায় ও জানালায় ক্রিম রং অথবা হালকা গেরুয়া রং-এর পর্দা ব্যবহার করিলে দেওয়ালের সহিত মিলিয়া ইহা অতি সুন্দর পটভূমি রচনা করে। ঘরের অন্যান্য কাপড়ের প্রস্তুত জিনিসগুলি হালকা নীল বা হালকা সবুজ জমিনের উপর সুন্দর নকশার ছাপ হইলে দেখিতে সুন্দর হয়।

দেওয়ালে পরিবারবর্গের বিভিন্ন ফটো অথবা সুন্দর ফলফুলের ছবি টাঙ্গাইলে ঘরের সজ্জা-বিন্যাসের সহিত খাপ খায়। আসবাবপত্র গৃহস্থের

প্রয়োজন অনুযায়ী রাখিতে হইবে। যে-পরিবারের টেবিলে খাওয়ার অভ্যাস সেই পরিবারের খাওয়ার ঘরে অবশ্য খাইবার জন্য একখানি বড় টেবিল থাকিবে এবং তাহার চারিপাশে চেয়ার থাকিবে। খাইবার বাসনগুলি রাখিবার জন্য একটি side board বা কাঠের ছোট আলমারি থাকিবে। ইহা ভিন্ন ঘরের কোণে ছোট টিপয় রাখা যাইতে পারে। খাবার রাখার জন্য



চিত্র নং—২৮ : খাইবার ঘর

একটি জাল লাগানো আলমারি এবং 'hot case' থাকিতে পারে। অনেকে খাইবার টেবিলের নিকটে দেওয়ালের গায়ে একখানি মাঝারি টেবিল রাখেন এবং পরিবেশনের পূর্বে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া ঐ টেবিলের উপর জমা করেন। ইহা ভিন্ন ধনীর গৃহে খাইবার ঘরে রেফ্রিজারেটার থাকে। খাইবার

ঘরে খাইবার টেবিলের উপর আলোর ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে করা প্রয়োজন। ঘরের একপাশে নরদমার নিকট একটি 'বেসিন' থাকিবে। তাহা হইলে হাত ধুইবার অসুবিধা হইবে না।

খাইবার টেবিলের উপর একটি চ্যাপটা ফুলদানি গন্ধবিহীন নানা রং-এর বাহারি ফুল-পাতার সাহায্যে সাজাইয়া দিলে ঘরের সজ্জা-বিন্যাস আরও আকর্ষণীয় হইবে। অনেকে খাইবার ঘরে একটি ছোটখাটো রেডিও বা ট্রানজিস্টার সেট রাখেন। খাইবার সময় একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা হইলে ভোজন অধিকতর উপভোগ্য হয়।

রন্ধনশালা—(এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় পত্রে পাওয়া যাইবে।)

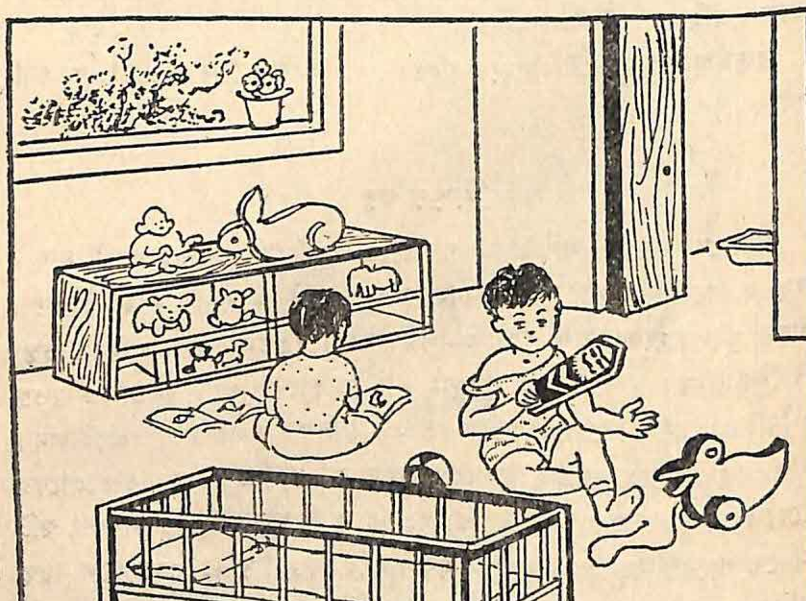
শিশুর ঘর

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে নার্শারী (শিশুর ঘর) নাই। কিন্তু যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের অবশ্যই নার্শারী রাখা উচিত। শিশুরা ফুলের মতো সহজ, সরল ও সুন্দর। তাহাদের চলাফেরা, ভাবনা, চিন্তা সব কিছুই বয়স্ক ব্যক্তি হইতে পৃথক। তাই তাহাদের প্রয়োজনগুলিও স্বতন্ত্র ও বিচিত্র। এই কারণেই শিশুদের জন্য একটি নিজস্ব জগৎ থাকা প্রয়োজন। তাহাদের জন্য গৃহে একটি স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিস রাখিয়া দিলে শিশুরাও নিজেদের জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে। বড়দের মাঝখানে সকল সময় শিশুরা ঘুরিয়া বেড়াইলে বয়স্ক ব্যক্তির চলাফেরা, আচার-ব্যবহার, কলহ শিশু-মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং তাহাতে তাহাদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরাও শিশুদের খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচির মধ্যে শান্তিতে কাজ করিতে পারেন না। তাঁহারা বকিয়া-ধমকাইয়া তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত চঞ্চলতা বন্ধ করিয়া দেন। শিশুদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর থাকিলে তাহারা নিজের মনে সেখানে তাহাদের খেলাধুলা লইয়া থাকিতে পারে।

বাড়ীর সর্বাপেক্ষা আলোবাতাসপূর্ণ ঘরটি শিশুদের ঘর হইবে। ইহা শয়ন কক্ষের সংলগ্ন হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে রাত্রে প্রয়োজন হইলে মা গিয়া শিশুদের তদারক করিতে পারেন।

শিশুদের ঘরের মেঝে কার্পেট, কম্বল অথবা লিনোলিয়াম দিয়া ঢাকা থাকিবে। দেওয়াল সোনালী, হলুদ অথবা গোলাপী হইবে। এই রংগুলি শিশুর আনন্দ ও উৎসাহের প্রতীক। তাহাদের পরিবেশের কোথাও যেন আনন্দের আয়োজনের ত্রুটি না হয়।

জানালা-দরজার পর্দাগুলিতে বড় বড় ব্লকের ছাপা থাকিবে। নকশা ফুল-পাতা, পুতুল, বা জন্তু-জানোয়ারের হইতে পারে। দেওয়ালে জন্তু-জানোয়ার, পরী অথবা পাখির ছবি রাখিতে হইবে।



চিত্র নং—২৯ : শিশুদের ঘর

শিশুর ঘরের আসবাবপত্রগুলি ছোট, নীচু, হালকা এবং মজবুত হইবে। আসবাবপত্রগুলির প্রত্যেকটির ধার বা কোণ গোল হইবে। তাহা হইলে শিশু ধাক্কা খাইলেও খুব আহত হইবে না। হালকা ছোট আসবাবপত্র তাহারা ইচ্ছা মতো নাড়াচাড়া করিতে পারিবে।

ছোট রেলিং-ঘেরা খাট, টেবিল-চেয়ার, নীচু সোফা, নীচু ছোট বুক-কেস প্রভৃতি শিশুর ঘরের উপযোগী আসবাব-পত্র এবং শিশুর খেলনা, গাড়ীঘোড়া,

কাগজ, রং, তুলি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও এই ঘরে রাখা উচিত। এই ঘরের সংলগ্ন একটি কলঘর (Bathroom) থাকিলে ভাল হয়। কলঘরে শিশুদের মলত্যাগের পাত্র বা নীচু চেয়ার-কমোড, ছোট বাথটব এবং নীচু বেসিন থাকিবে।

শিশু ফুল ভালবাসে। পুষ্পপত্রগুলি তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ ও বৈচিত্র্য লইয়া শিশু-মনকে আকর্ষণ করে। তাই শিশুদের ঘরে নানা উজ্জ্বল রং-এর পুষ্প-পত্র দ্বারা জমকালো পুষ্প-বিন্যাস করিতে হইবে।

বুক-কেসের মাথায় বা ঘরের কোণে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া পুষ্পাধারটি রক্ষা করিলে শিশুর কক্ষে আনন্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।

ভাঁড়ার ঘর—দ্বিতীয় পত্রে এ বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

বস্ত্র ধৌতির ঘর—দ্বিতীয় পত্রে আলোচনা করা হইয়াছে।

খেলার ঘর ও লিভিং রুম

এই সকল ঘর ছাড়াও দরদালান, হল অথবা বারান্দায় খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করার জন্য একটি স্থান স্থির করিলে ভাল হয়। পরিবারের প্রতিটি মানুষেরই খানিকটা অবসর সময় থাকে। সেই সময়টুকু তাহারা নানাভাবে আনন্দ করিয়া কাটাইতে চাহে। এজন্য যদি একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে তাহা হইলে সকলে এক জায়গায় সহজেই তাহাদের প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম পায়। টেবিল-টেনিস, তাস, পাশা, ক্যারম প্রভৃতি খেলা সকল বয়সেরই উপযোগী। এই ঘরটিতে আরামদায়ক আসন, বইয়ের আলমারি, খেলাধুলার জিনিসপত্র ছাড়াও রেডিও, টেলিভিশান অথবা গ্রামোফোন, অর্গ্যান, পিয়ানো অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র থাকিবে। সেলাই-ফোঁড়াই করিবার জিনিস, ছোটখাটো মেরামতি কাজের সরঞ্জামও এই ঘরের আলমারিতে থাকিতে পারে।

বসিবার জন্য আরাম-চেয়ার, সোফা, তক্তাপোশ, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবই এইরূপ কক্ষের জন্য উপযোগী।

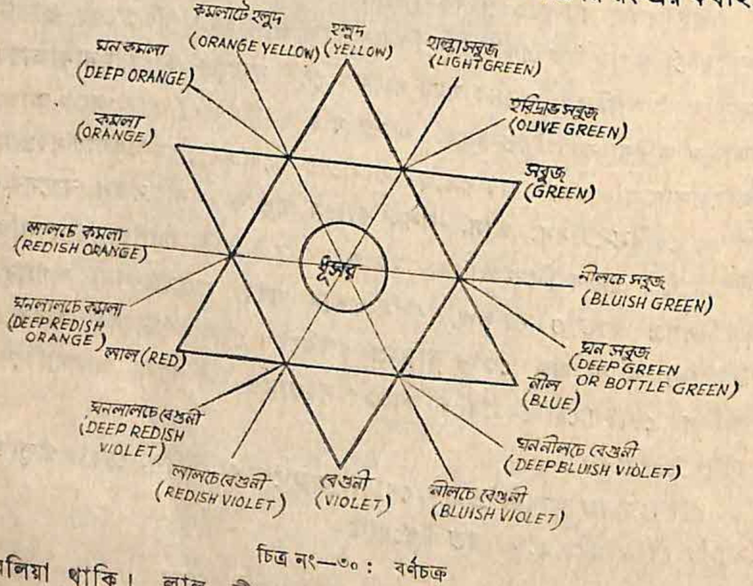
বর্ণ-বিন্যাস (Colour Arrangement)

প্রকৃতি বর্ণময়ী। প্রকৃতির কোন জিনিসের ধারণা বর্ণ ব্যতীত হয় না। প্রতিটি সজ্জাদ্রব্যেরও নিজস্ব বর্ণ আছে। তাই গৃহসজ্জার ক্ষেত্রেও রং-এর

ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহখানিকে সজীব, সতেজ, সুন্দর, বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন জিনিসের রং বিভিন্ন প্রকার। মানুষের মনের উপর প্রত্যেকটি বর্ণের নিজস্ব প্রভাব আছে। সকল বর্ণের সহিত সকল বর্ণ খাপ খায় না। কোন কোন রং পরস্পরের পরিপূরক, আবার কোন কোন রং বিবাদী। পরিপূরক রং চক্ষুকে তৃপ্তি দান করে। বিবাদী রং মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অতএব যে কোন কক্ষের বর্ণ-বিন্যাস করিতে হইলে গৃহিণীর বিভিন্ন বর্ণ, উহাদের নানাপ্রকার পর্দা (shade) এবং মানব-মনের উপর উহাদের প্রভাব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

রং-এর বৈশিষ্ট্য তিনটি—(১) বর্ণ বা রং, (২) মূল্য (value), এবং (৩) রং-এর পর্দা।

বর্ণ বা Hue—যে কোন জিনিসের রং-এর নামকে 'hue' বলা হয়। যেমন—যখন আমরা বলি আকাশ নীল তখন আমরা আকাশের রং-এর কথাই



চিত্র নং—৩০ : বর্ণচক্র

বলিয়া থাকি। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি বহু প্রকার রং আছে। প্রত্যেকটি রং-এর নিজস্ব বর্ণের নামকরণ করা হয় এবং তাহাদের 'hue' বলা হয়। প্রাথমিক রং তিনটি—হলুদ, লাল ও নীল। দ্বিতীয় পর্যায়ের রং

তিনটি—কমলা, সবুজ ও বেগুনী। আবার যদি পাশাপাশি রং মিশানো যায় তাহা হইলে তৃতীয় পর্যায়ে বারটি রং পাওয়া যাইবে। আবার পাশাপাশি রংগুলি হইতে চতুর্থ পর্যায়ের রং পাওয়া যায়। এইভাবে আমরা বহু প্রকারের রং পাইতে পারি।

রং-এর shade বা পর্দা—প্রত্যেক রং-এর নয়টি করিয়া পর্দা আছে। এই পর্দাগুলি ঘন হইতে ক্রমশঃ ফিকা হইয়া যায়। যেমন—লাল রং। ইহা ঘন লাল বা ox-blood red হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নয়টি ধাপে নামিয়া হালকা গোলাপীতে পরিণত হয়। রামধনু লক্ষ্য করিলে রং-এর বিভিন্ন পর্দা বেশ বোঝা যায়। সাদা, ধূসর এবং কালো রং কোন বর্ণশ্রেণীতে পড়ে না। তাই ইহাদের নিরপেক্ষ রং বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কোন রং নাই। এই রং তিনটিকে কোন রং-এর সহিত মিশাইলে রং-এর পর্দা পরিবর্তিত হয়। কালো মিশাইলে রংটি ঘন হয়। সাদা মিশাইলে রংটি ফিকা হয়।

বর্ণালী রং ও নিরপেক্ষ রং

(Spectrum colours and neutral colours)

পরকলা বা শিউলি কাঁচের মধ্য দিয়া সূর্যালোক প্রতিস্থত হইলে যে সাতটি রং পাওয়া যায়, তাহাকেই বর্ণালী বা spectrum বলে। রামধনুতে ঐ সাতটি রং দেখা যায়।

স্পেকট্রাম বনাম নিরপেক্ষ রং—স্পেকট্রামে যে সাতটি রং আছে তাহা লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনীতে নামিয়া আসিয়াছে। ঐ রংগুলিই হইল প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রং। ইহা ভিন্ন সাদা, কালো এবং ধূসর রংও প্রকৃতিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা কোন বর্ণশ্রেণীতে পড়ে না। ইহাদের নিজস্ব কোন বর্ণ নাই। তাই ইহাদের নিরপেক্ষ রং বলা হয়। যখনই স্পেকট্রামের যে কোন রং-এর সহিত ইহাদের মিশানো যায় তখনই উহাদের ঔজ্জ্বল্য খর্ব হয় এবং তাহারা আর স্পেকট্রাম রং হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। তখন উহারা নিরপেক্ষ রং হয়। এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতির অধিকাংশ রং নিরপেক্ষ রং-এ পরিণত হইয়াছে। যেমন—(১) লাল + কালো —অক্স-ব্লাড বা রক্তলাল। (২) কমলা + কালো—ব্রাউন। এ ছাড়া লালচে,

বেগুনী, নীলচে সবুজ, ব্রাউন, হরিণ রং, কচি কলাপাতা, ঘন হলুদ, অলিভ গ্রীন ইত্যাদি প্রত্যেকটি নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ রং-এর উদাহরণ।

উষ্ণ ও শীতল রং—বিভিন্ন বর্ণ আমাদের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহারই প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা বর্ণসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) উষ্ণ বর্ণালী এবং (২) স্নিগ্ধ বর্ণালী। লাল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি উষ্ণ রং এবং সবুজ, নীল স্নিগ্ধ রং আর বেগুনী ইহাদের মধ্যবর্তী। নীলচে বেগুনী স্নিগ্ধতা আনে, আর লালচে বেগুনী উষ্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। আগুনে, জ্বলন্ত অঙ্গারে, গলিত ধাতুতে, সূর্য উদয় ও অস্তের সময় আমরা আকাশে লাল, হলুদ, কমলা রং-এর সমাবেশ দেখি বলিয়াই হয় তো আমরা এই রংগুলিকে উষ্ণ রং-এর পর্যায়ে ফেলি। অপর পক্ষে আকাশে, অরণ্যে, সমুদ্রে, নদীতে যে রংগুলি দেখি সেগুলি নীল ও সবুজ এবং উহাদেরই বিভিন্ন পর্দা। তাই উহারা আমাদের মনে স্নিগ্ধ ভাব সঞ্চার করে। সমস্ত নিরপেক্ষ রং স্নিগ্ধ। যেমন—হালকা গোলাপী, এলা, হলুদ, ট্যান, নীল, ল্যাভেণ্ডার এবং সবুজ। উষ্ণ রংগুলি উগ্র এবং স্নিগ্ধ রংগুলি শান্ত।

রং-এর মূল্য—ঔজ্জ্বল্য ও অনুজ্জ্বলতার দিক বিচার করিয়া রং-এর মূল্য স্থির হয়। যে কোন বর্ণের আলোক ও অন্ধকারের দিক বিচার করিয়া উহার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যেদিকে আলো যত বেশী পড়ে তাহা তত বেশী উজ্জ্বল দেখায়। আর যে রং-এ আলো যত কম সে ততই অনুজ্জ্বল। অনেক সময় হালকা উজ্জ্বলতাকে ইংরাজীতে tins এবং ঘন উজ্জ্বলতাকে tones বলা হয়। আলোর ধর্ম স্পষ্ট করা, সাদা করা, স্বচ্ছ করা। আর অন্ধকারের ধর্ম কালো করা। তাই মূল্য নির্ধারক মাপকাঠির সর্বাপেক্ষা উপরের দিককে যদি সাদা এবং সর্বাপেক্ষা নিম্ন ধাপটিকে যদি কালো ধরা হয় তাহা হইলে রং-এর উজ্জ্বলতার মূল্য নির্ধারণে সুবিধা হয়। সাদার নিকটবর্তী বর্ণগুলি উজ্জ্বল এবং কালোর নিকটবর্তী রংগুলি অনুজ্জ্বল হয়। এইভাবে আমরা অতি উজ্জ্বল, মাঝারি উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল এই তিনটি মূল্য পাই।

অনেক গৃহিণী মনে করেন মেঝের রং হইবে অনুজ্জ্বল, দেওয়াল মাঝারি উজ্জ্বল এবং ছাদ হইবে উজ্জ্বল। প্রকৃতির মধ্যে আমরা এইরূপ বর্ণ-বিন্যাসই দেখিতে পাই। মাটি, গাছপালা, ঘাস প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠ ঘোর অনুজ্জ্বল, দিগন্ত হালকা ও মাঝারি উজ্জ্বল এবং আকাশ হালকা উজ্জ্বল।

বর্ণ-বিন্যাসের পদ্ধতি

বিভিন্ন রং, উহাদের পর্দা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম। এখন গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে কি ভাবে উহাদের ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিব।

দেওয়াল, মেঝে, জানালা, দরজা, আসবাব-পত্র, পর্দা, টেবিল-ক্লথ, সোফা-সেটীর ঢাকনা সব কিছুই রঙ্গিন। বর্ণ পরিকল্পনার সময় রংগুলির ব্যবহার এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উহাদের আনুপাতিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, মিল, ছন্দ প্রভৃতি বজায় থাকে।

আনুপাতিক সমতা—আনুপাতিক সমতা রক্ষা করিয়া বর্ণ-বণ্টন করিতে হইলে কক্ষটির দেওয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র প্রভৃতির মাপের কথা প্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে। ঘন ও প্রখর রংগুলি দৃষ্টির পরিধিকে সংকুচিত করে। হালকা রংগুলি দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। এইজন্য ছোট ঘরের দেওয়াল, মেঝে এবং পর্দায় হালকা রং ব্যবহার করিলে ঘরখানি অপেক্ষাকৃত বড় দেখাইবে। বড় ঘরে অপেক্ষাকৃত ঘন রং ব্যবহার করিলে ঘরখানি মানানসই রকম ছোট দেখাইবে। অথবা বড় ঘরের দেওয়াল বা মেঝেতে যদি হালকা রং-এর চারিপাশ দিয়া ঘোর রং-এর সীমারেখা টানা যায় তাহা হইলে দৃষ্টি বাধা পায় এবং উহারা তখন স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত ছোট দেখায়। এই কারণেই ছোট ঘরের দেওয়াল বা মেঝেতে সীমারেখা টানিলে আনুপাতিক সমতা নষ্ট হয়।

এছাড়া প্রত্যেকটি সজ্জা উপকরণে যে সকল রং ব্যবহার করা হইবে তাহাদের অনুপাত যেন ঠিক হয়, তাহাদের পারস্পরিক দূরত্বের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে ; যেমন—ধরা যাক, লাল হলুদ সবুজ—তিন রং-এর তিনটি করিয়া নয়টি বাতি আছে। এখন যদি উহাদের সমান দূরত্বে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো যায় তাহা হইলে আনুপাতিক সমতা থাকিবে না। কিন্তু তিনটি লাল বাতি ঘেঁষাঘেঁষি সাজাইয়া, একটু ছাড়িয়া হলুদ তিনটি এবং আবার একটু স্থান ছাড়িয়া সবুজ তিনটি রাখিলে বর্ণ-বণ্টনে আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হইবে।

ভারসাম্য—বর্ণবিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষা করিতে হইলে রং-এর মূল্যের (উজ্জ্বলতা ও অনুজ্জ্বলতা) কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। অনেকখানি

অনুজ্জ্বল রং-এর সহিত একটুখানি উজ্জ্বল রং ব্যবহার করিলে তবেই ভারসাম্য রক্ষা হয়। এইজন্য কক্ষের বৃহৎ স্থানগুলিতে অনুজ্জ্বল নিরপেক্ষ রং ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—মেঝে, ছাদ, দেওয়াল, জানালা, দরজা, পর্দা প্রভৃতিতে নিরপেক্ষ রং ব্যবহার করা উচিত। তাহার সহিত ছোটখাটো সজ্জা-উপকরণগুলিতে উজ্জ্বল বর্ণালী ব্যবহার করিলে ভারসাম্য রক্ষা হয়। যেমন—গ্লাস কার্টেন বা পর্দা, আলোর ঢাকনা, টেবিল ঢাকনা, অ্যাশট্রে, পুষ্পগুচ্ছ প্রভৃতি কমলা, লাল, আগুন প্রভৃতি রং-এর ব্যবহার করিলে এবং অনুজ্জ্বল সবুজ বা নীল পর্দা দিলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। অবশ্য উজ্জ্বল রং-এর সজ্জা-উপকরণগুলি কক্ষের উভয় দিকে সমভাবে বন্টন করিতে হয়।

ছন্দ—বর্ণপরিকল্পনা ছন্দোবদ্ধ হওয়া উচিত। যে কয়টি রং সজ্জা-উপকরণে ব্যবহার করা হইবে তাহাদের প্রত্যেকের পুনরাবৃত্তি এমনভাবে করিতে হইবে যে দর্শকের দৃষ্টি বিনা বাধায় ঘুরিয়া আসিতে পারিবে। দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ছন্দ পতন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নিরপেক্ষ রংগুলির ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে চক্ষু ক্লান্ত হয় না। পর্দা এবং টেবিল-ক্লথের রংগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া ছন্দ স্থষ্টি করা সহজ। পুনরাবৃত্তির সময় মনে রাখা উচিত যে কোন ক্রমেই যেন আনুপাতিক সমতা ক্ষুণ্ণ না হয়। রং-এর পরিমাণ আর রঙ্গিন জিনিসগুলির দূরত্ব যদি সঠিক হয় তাহা হইলে এই ভয় থাকে না।

বিশেষ আকর্ষণ—কক্ষসজ্জার সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে আকর্ষণের কেন্দ্রটির উপর। উহার আকর্ষণী ক্ষমতা যত বেশী হইবে বিন্যাস তত সার্থক হইবে। আকর্ষণের কেন্দ্রটি তাই হইবে উজ্জ্বলতম বর্ণের। মৃদু অনুজ্জ্বল সজ্জাদ্রব্যের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণের বস্তুটি স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন—অনুজ্জ্বল বাদামী সবুজ সজ্জা-উপকরণগুলির মধ্যে যদি একটি উজ্জ্বল কমলা বা সোনালী ওয়াল-প্লেট রাখা যায় তাহা হইলে উহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্ণ-সমন্বয় বা রং মিলানো

যে কোন কক্ষের সজ্জা-বিন্যাসের সময় আমরা একাধিক রং ব্যবহার করি। বিভিন্ন রং-এর মধ্যে যদি ঠিকমতো সমন্বয় সাধন না করিতে পারা যায় তাহা

হইলে মিল থাকে না। সব কিছু যেন খাপছাড়া মনে হয়। তাই যে রং-এর সহিত যে রং-এর মিল আছে সেই রংগুলি ব্যবহার করিতে হয়। যে রং-এর সহিত যে রং-এর মিল নাই তাহারা বিবাদী রং এবং তাহা মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

সুতরাং কক্ষসজ্জার সময় রং মিলানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করাই সুবিবেচনার কাজ।

রং মিলানোর পদ্ধতি

(১) **'মনোক্রমেটিক হারমনি'** (Monochromatic harmony) —এই পদ্ধতিতে একই পরিবারভুক্ত রং-এর বিভিন্ন পর্দা মিলানো হয়। যেমন—কমলা, হরিণ রং (ট্যান) এবং বাদামী রং-এর বিভিন্ন পর্দা যদি ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতিতে রং মিলানো হইবে। অবশ্য ইহার সহিত কাল, সাদা এবং ধূসর রং ব্যবহার করা চলে।

(২) **'এ্যাড্জেসেন্ট হারমনি'** (Adjacent harmony)—এই পদ্ধতিতে রং মিলাইবার সময় বর্ণচক্রের পাশাপাশি দুইটি রং বা তিনটি রং মিলানো হয়। যেমন—সবুজ, হলুদ এবং কমলা রং-এর বিভিন্ন পর্দা যদি ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতিতে রং মিলানো হইবে। সকল পাশাপাশি রং কিন্তু মেলে না। যেমন—লালের সহিত লালচে কমলা বা লালচে বেগুনী মেলে না। পাশাপাশি রংগুলি যদি সবগুলিই উগ্র অথবা সবগুলিই স্নিগ্ধ হয় তাহা হইলে মিলানো কঠিন হয়। একটি উগ্রের সহিত দু-তিনটি স্নিগ্ধ পাশাপাশি রং মিলানো সহজ। আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় ভিন্ন পরিবারের পাশাপাশি রংগুলি মিলাইলে ভাল হয়।

(৩) **বিপরীত বর্ণের মিলন** (Contrast colour harmony)—এই পদ্ধতিতে বর্ণচক্রের পরস্পরের বিপরীত দিকে যে রং দুইটি থাকে তাহাদের মিল করা হয়।

প্রত্যেকটি বিপরীত রং তাহার বিপরীত রং-এর অংশীদার। কারণ দুইটি বিপরীত রং মিশাইলে একটি নিরপেক্ষ রং উৎপন্ন হয়। যেমন—নীলের সহিত সামান্য কমলা মিশাইলে ধূসর রং পাওয়া যায়। কমলার পরিমাণ বাড়াইয়া

দিলে বাদামী রং উৎপন্ন হয়। সুতরাং কমলার সহিত নীল মিশাইলে যে প্রভাব সৃষ্টি হইবে তাহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। উহাতে কাহারও আধিপত্য অধিক বলিয়া মনে হইবে না। এইজন্য বিপরীত রংগুলিকে পরিপূরক বা Complementary রং বলা হয়।

গৃহসজ্জায় পরিপূরক রংগুলি ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। যেমন—কোন কক্ষের দেওয়ালের রং আকাশী নীল, লালচে কমলা আসবাবপত্রের ঢাকনা, তাম্রবর্ণের ছোটখাটো সজ্জাদ্রব্য, অনুজ্জ্বল হালকা হলুদ রং-এর পর্দা এবং আগুন রং-এর ফুল রাখিলে বর্ণসমন্বয় অতি উত্তম হয়।

(৪) **ত্রৈমিলন** (Triad)—এই পদ্ধতিতে তিনটি প্রাথমিক রং-এর মিল করা হয়। অর্থাৎ লাল, নীল ও হলুদ রং-এর সমন্বয় সাধন করা হয়। সঠিক অনুপাতে ইহাদের মিশাইলে ধূসর রং উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহারা পরিপূরক। তাই অনুপাত সঠিক হইলে সমন্বয় অপূর্ব হয়। তবে মনে রাখা উচিত ইহারা Spectrum colour, তাই অতিশয় উজ্জ্বল। বর্ণ পরিকল্পনার সময় ইহাদের হালকা পর্দাগুলি বাছিতে হইবে। যেমন—আকাশী নীল দেওয়াল, ঈষৎ হলুদ আসবাবের পালিশ, গোলাপী কার্পেট রাখিলে সুন্দর বর্ণসমন্বয় হয়।

অনুশীলনী

'E' ১৯৬০—(৮) একটি কক্ষের সজ্জা-বিন্যাসের মূল নীতি কি কি ? তোমার বসিবার ঘরে যে যে সজ্জা-উপকরণ রাখিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় পর্দার ভূমিকা কি ?

উঃ সং—(১) কক্ষের সজ্জা-বিন্যাসের নীতি—সুবিধা, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, আনুপাতিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, মিল, ছন্দ, আকর্ষণ, সরলতা প্রভৃতি।

(২) বসিবার ঘরের সজ্জা-উপকরণ—কার্পেট, আসবাব, পর্দা, ছবি, ফুল, সজ্জা-সহায়ক।

(৩) পর্দার প্রয়োজন।

E. ১৯৬১—(৮) 'সুখী সুবিন্যস্ত গৃহেই সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা বিরাজ করে।—আলোচনা কর।

উঃ সং— (১) সুখী সুবিন্যস্ত গৃহ কাহাকে বলে?

(২) সৌন্দর্য আরাম এবং সুবিধা ঐরূপ গৃহে কেন বিরাজ করে? এই দুইটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

E. ১৯৬৩—(৯) আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় রং ও নকশার প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর। উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

উঃ সং— (১) আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় রং-এর ভূমিকা কি তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

(২) আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় নকশার ভূমিকা কি তাহাও বলিতে হইবে।

E. ১৯৬৪—(৯) উষ্ণ ও শীতল রং বলিতে কি বোঝ? শয়ন-কক্ষ অথবা বসিবার ঘরের দেওয়াল, মেঝে, সোফা-সেট, পর্দার কাপড় এবং ছবিতে ঐ সকল রং-এর কোন্‌টি কোথায় দিবে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি বর্ণ পরিকল্পনা কর।

উঃ সং—(১) উষ্ণ ও শীতল রং-এর সংজ্ঞা। (২) বসিবার ঘরের অথবা শয়ন-কক্ষের বর্ণ পরিকল্পনা ('বসিবার ঘর'-শীর্ষক আলোচনা দেখ)।

E. ১৯৬৫—(১০) আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার নীতি কি কি? আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় পর্দার ভূমিকা বর্ণনা কর। একটি ক্ষুদ্র কক্ষকে বৃহৎ দেখাইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

উঃ সং—(১) আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার নীতি। (২) পর্দার ভূমিকা। (৩) ক্ষুদ্র কক্ষকে বৃহৎ দেখাইবার উপায়—নিরপেক্ষ রং-এর ঘর-জোড়া কার্পেট, জানালা-দরজায় বড় ড্রেপারী, আসবাবপত্র অল্পসংখ্যক, দেওয়ালে পর্দায় মেঝেতে হালকা রং-এর ব্যবহার এবং আসবাবপত্রের মাপ মাঝারি, বিন্যাস যতদূর সম্ভব দেওয়াল ঘেঁষিয়া ও মেঝে ছাড়িয়া।

E. ১৯৬৬—(১১) (b)
E. ১৯৬৮—(৪) (c) } সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা।

E. ১৯৬৬ (৭) বসিবার ঘরের আসবাব নির্বাচনের সময় তুমি কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিবে? বসিবার ঘরে কেমন করিয়া আসবাব-বিন্যাস করিবে?

উঃ সং—(১) আসবাব নির্বাচন—প্রয়োজন, সৌন্দর্য, মজবুত, দাম।

(২) আসবাব-বিন্যাস—প্রয়োজন, সৌন্দর্য।

E. ১৯৬৭—(৮) একটি কক্ষ-বিন্যাসের নীতি কি কি? তুমি তোমার বৈঠকখানা ঘরটি কেমন করিয়া সাজাইবে?

উঃ সং—(১) আভ্যন্তরীণ সজ্জার নীতি। (২) বসিবার ঘর সাজাইবার পদ্ধতি—মেঝে, দেওয়াল, পর্দা, আসবাব, পুষ্প-বিন্যাস ও অন্যান্য সজ্জা-উপকরণ।

E. ১৯৬৮—(১০) আভ্যন্তরীণ সজ্জা-বিন্যাসের নীতি কি কি? তোমার খাইবার ঘর কেমন করিয়া সাজাইবে?

উঃ সং—(১) আভ্যন্তরীণ সজ্জার নীতি। (২) খাইবার ঘর সাজাইবার পদ্ধতি—মেঝে, দেওয়াল, পর্দা, আসবাব, পুষ্প-বিন্যাস ও অন্যান্য সজ্জার উপকরণ কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে তাহা লিখিতে হইবে।

E. Possible—আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় মণ্ডনশিল্পের নীতিগুলি কতদূর প্রযোজ্য ?

উঃ সং—(১) মণ্ডনশিল্পের পাঁচটি নীতি।

(২) গৃহসজ্জায় উহাদের প্রয়োগ (বই-এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখ)।

গৃহ তৈজসাদি নির্বাচন

(Selection and use of household equipments)

প্রাত্যহিক গৃহকর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য কিছু বাসনপত্র প্রত্যকটি পরিবারের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধাতু ও উপাদান দ্বারা নানাপ্রকার তৈজস আমাদের দেশে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ধাতুর বাসনই সব কাজের জন্য ব্যবহার করা যায় না।

উপাদান বৈশিষ্ট্যের উপর ইহাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগিতা নির্ভর করে। কারণ বিভিন্ন উপাদানের উপর ক্ষার, অম্ল, বায়ু, জল, উত্তাপ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হইয়া থাকে।

তাই সংসারের কোন্ কাজের জন্য কোন্ ধাতুর বাসন উপযোগী হইবে তাহা দেখিতে গেলে, যে সকল ধাতুর বাসন আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি তাহাদের উপর ক্ষার, অম্ল, বায়ু, জল, উত্তাপ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয় তাহা দেখা প্রয়োজন।

মিশ্র ও অমিশ্র ধাতুর ব্যবহার—আমরা কতকগুলি মিশ্র এবং কতকগুলি অমিশ্র ধাতুর তৈজস ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন—লৌহ, তাম্র, রূপা, কাঁচ, এ্যালুমিনিয়াম, পাথর, মাটি, চিনামাটি, টিন, জিঙ্ক, নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি অমিশ্র ধাতু। আর পিতল, কাঁসা, স্টেনলেস্ স্টিল প্রভৃতি মিশ্র ধাতু।

লৌহপাত্র—লৌহপাত্র রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ক্ষার দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু যে কোন জৈব মৃদু অম্লের সহিত লৌহের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। উহার ফলে যে অজৈব লৌহঘটিত লবণ খাদ্যের সহিত মিশিয়া যায় তাহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তো নয়ই বরং উপকারী। কিন্তু লৌহে অতি সহজে মরিচা পড়ে। ভিজা লৌহ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে বায়ুস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর (CO_2) উপস্থিতিতে O_2-র লৌহের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং তাহার ফলে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহাই মরিচা (Ferric oxide)। মরিচা পড়ে বলিয়া লৌহপাত্র পরিষ্কার রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন লৌহপাত্র দীর্ঘস্থায়ী, অথচ দাম কম। ইহা একবার

উত্তপ্ত হইলে বহুক্ষণ তাপ ধরিয়া রাখে। অস্বচ্ছ কালো উপরিতল হইতে তাপ বিচ্ছুরণ কম হয়। লৌহপাত্রে রন্ধন করিলে লৌহের কষে ব্যঞ্জনাদি কালো হয়। এইজন্য লৌহপাত্রের ভিতর নিকেল বা টিন দিয়া প্লেটিং (plating) করিয়া লইতে পারিলে উহা আদর্শ রন্ধনপাত্র হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে।

পাথর—যন্ত্র-সভ্যতার অগ্রগতির পূর্বে ভারতের অধিকাংশ মানুষই পাথরের বাসন ব্যবহার করিত। আজও বিধবারা বা শুদ্ধাচারে আহার গ্রহণ করিতে চান এমন ব্যক্তি পাথরের পাত্রে আহার করেন। পূজার নৈবেদ্য সাজানোর জন্য কিংবা আচার বা আমসত্ত্ব দিবার জন্য এখনও আমাদের ঘরে পাথরের বাসন আদৃত। কারণ পাথরের উপর ক্ষার, অম্ল, বায়ু, জল প্রভৃতির কোন প্রতিক্রিয়া নাই। ইহা পরিষ্কার করা সহজ কিন্তু অত্যন্ত ভারী এবং পড়িলে ভাঙিয়া যায়। দামও কাঁচ অথবা এ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই ইহার প্রচলন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ইহা রন্ধনের জন্য কোনদিনই ব্যবহার হয় নাই, হইবেও না। কারণ ইহা গরম হইতে অত্যন্ত দেরি হয় এবং তাপ বিচ্ছুরণ হয় না।

তাম্র—তামার বাসনের ব্যবহার বাংলা দেশের গৃহগুলিতে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। একমাত্র পূজার বাসন হিসাবেই ইহা আজও ব্যবহৃত হয়। তাহার প্রধান কারণ ইহার দাম বেশী এবং ইহাতে অতি সহজে কলঙ্ক পড়ে। বায়ুর জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন (O_2) এবং গন্ধকের গ্যাসের সংস্পর্শে আসিলে তাম্রপাত্রে সবুজ কলঙ্ক পড়ে। এই সবুজ কলঙ্ক গন্ধকঘটিত লবণ। ইহা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সামান্যমাত্র অম্লের সংস্পর্শেও তাম্রের প্রতিক্রিয়া হয়। তাম্র গলিয়া অম্লাক্ত পদার্থের সহিত মিশিয়া যায়। এই লবণ স্বাস্থ্যের উপর বিষবৎ ক্রিয়া করে। তাই তামার বাসন ব্যবহার করিতে হইলে ভিতরে টিনের পলস্তারা লাগাইয়া লওয়া উচিত। তামার পাত্র boiler বা ফুটানোর পাত্র হিসাবে আদর্শ। ইহা সহজে গরম হয় এবং অধিকক্ষণ উত্তাপ ধরিয়া রাখিতে পারে।

রূপা—রূপার বাসন আজও ভারতের বহু ধনী-গৃহে ব্যবহৃত হয়। রূপার বাসনে সহজে কোন ক্ষার বা অম্লের প্রতিক্রিয়া হয় না। একমাত্র হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস যদি বাতাসে থাকে তাহা হইলে রূপার

বাসন কাল হইয়া যায়। তাই রূপার পাত্রে ডিম খাইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া ফেলিতে হয়। ডিম-মাখা অবস্থায় বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে রূপার পাত্রে দাগ হয়। ইহা ভিন্ন কোন সময়েই রূপার জিনিসে নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করিতে নাই। অবশ্য দৈনন্দিন গৃহকর্মের ক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড ব্যবহারের কোন প্রশ্নও আসে না। তবুও জানিয়া রাখা ভাল যে নাইট্রিক এসিডের সংস্পর্শে আসিলে রূপা গলিয়া যায়। রূপার বাসনের দাম বেশী, তাই ইহা সকলের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু খাওয়ার বা পরিবেশন করার বাসন হিসাবে ইহা আদর্শ। দেখিতে সুন্দর, সহজে পরিষ্কার করা যায়, হালকা অথচ মজবুত। ঘর্ষণেও সহজে ইহা ক্ষয় হয় না। রূপার চামচ, ছুরি, কাঁটা, জলাধার প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাঁসা—কাঁসার কদর অধিকাংশ বাঙালী পরিবারেই আছে। কিন্তু শহরাঞ্চলে কাঁচ ও স্টেনলেস স্টীল ক্রমশঃ উহার স্থান দখল করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ ক্ষার কাঁসার উপর বিশেষ কোন বিক্রিয়া সৃষ্টি না করিলেও অম্ল পদার্থ ইহার বিক্রিয়া ঘটায় এবং তাহার ফলে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহা ভিন্ন কাঁসার বাসন ভারী এবং পড়িলে ভাঙিয়া যায়। উনানে বসানো যায় না, একমাত্র খাওয়ার বাসন হিসাবে ইহা ব্যবহার করা যায়। ভিজা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে নীলচে কলঙ্ক পড়ে। কাঁসার বাসন পরিষ্কার করা এবং পালিশ করা কঠিন কিন্তু তবুও ইহা উজ্জ্বল এবং দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া ইহার থালা বাটি ঘটি গ্লাস প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে যতদূর সম্ভব খাগড়াই কাঁসাই ব্যবহার করা উচিত। ভরন কাঁসা নামে আর একপ্রকার কাঁসা বাজারে পাওয়া যায়। তাহা দামে কিছু সস্তা। তাহাতে পিতল বেশী মিশানো থাকে বলিয়া অম্লের বিক্রিয়া দ্রুত হয়। তাহা দেখিতেও অপেক্ষাকৃত মলিন এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র তাহাতে কলঙ্ক পড়ে। এমন কি অল্পক্ষণ জল রাখিলেও ধাতু আক্রান্ত হয় এবং উহা জলে কিছুটা দ্রবীভূত হয়। ঐ কলঙ্ক বিষাক্ত এবং উহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

পিতল—সেকালে ভারতবর্ষে পিতলই ছিল একমাত্র ধাতু, যাহার বাসনপত্র সকল শ্রেণীর মানুষই অল্পবিস্তর ব্যবহার করিত। পিতল তামা

এবং জিঙ্ক মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ইহা বায়ু, জল এবং অম্ল দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উহাতে নীলাভ কলঙ্ক পড়ে। জলে দ্রবীভূত কার্বনিক এসিড থাকে বলিয়া পিতল আক্রান্ত হয় এবং জলের সহিত দ্রবীভূত হয়। পিতলের কলঙ্ক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই পিতলের বাসনে জল রাখা বা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা উচিত নয়। একমাত্র boiler বা ফুটানোর পাত্র হিসাবে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার উপরিভাগ উজ্জ্বল হয় বলিয়া তাপ বিচ্ছুরণ দ্রুত হয়। নিকেল প্লেটিং করিয়া লইলে পিতলের পাত্র সকল প্রকার কাজে লাগিতে পারে। ইহা যেমন দামে সস্তা তেমনি টেকসই, তাই দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী। মুর্শিদাবাদে, কাশীতে পিতলের উপর পলস্তারা লাগানো বা প্লেটিং করা বাসন প্রচুর বিক্রয় হয়। নিয়মিত ব্যবহারের ফলে নিকেলের প্লেটিং নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু উহা পুনরায় প্লেটিং করিয়া লওয়া খুবই সহজ। প্লেটিং করা বাসন পরিষ্কার করাও সহজ।

কাঁচ—আধুনিক যুগে শহরাঞ্চলে অধিকাংশ গৃহেই কাঁচ পিতল ও কাঁসার স্থান দখল করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ ইহা ভঙ্গুর হইলেও অতি সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং দামে খুব সস্তা। ইহা ছাড়া কাঁচের বাসন বায়ু, জল, ক্ষার, অম্ল ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। একমাত্র অসুবিধা ইহা অতিরিক্ত গরমে ফাটিয়া যায়। তাও আজকাল তাপসহ (heat-proof) কাঁচ বাহির হইয়াছে এবং ক্রমশঃ কাঁচের বাসন অন্য সকল ধাতুকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া চলিতেছে। ইহা দেখিতে সুদৃশ্য এবং পালিশের কোন প্রয়োজন হয় না। কাঁচ উত্তাপের কুপরিবাহী বলিয়া গরম পানীয় পরিবেশনের জন্য বিশেষ উপযোগী। চুন, বালি এবং কাপড়-কাচা সোডা প্রচণ্ড উত্তাপে গলাইয়া কাঁচ প্রস্তুত করা হয়। সোডার পরিমাণ যত বেশী হয়, কাঁচ তত খারাপ হয় এবং ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। তাই উপাদানগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর কাঁচের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে। বিশেষ করিয়া মোটা কাঁচের বাসন গরম পাইলে তাড়াতাড়ি ফাটে, কারণ এইরূপ কাঁচ প্রস্তুতের সময় তাপ-বণ্টন অসমান হয়, ফলে প্রসার বা expansion সমান হয় না। দুই অসমান তলের মাঝখানে ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আজকাল কাঁচশিল্পের এত উন্নতি হইতেছে যে রন্ধন পাত্র পর্যন্ত কাঁচের প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দেশে এখনও রন্ধনের জন্য সেরূপ তাপসহ (heat-proof) কাঁচ পাওয়া যায় না। তাই খাইবার পাত্র এবং পানপাত্র হিসাবেই কাঁচের বাসনের উপযোগিতা দেখা যায়। একমাত্র গবেষণাগারের কাঁচের পাত্রগুলিই heat-proof।

মাটি—দুই প্রকার মাটির বাসন হয়—১। চীনামাটি বা সাদামাটির এবং ২। দেশী এঁটেল মাটির বাসন।

চীনামাটির বাসন—ইহা সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং উপরে অতি সুন্দর পালিশ ও নকশা কাটা থাকে। ইহাতে জল, বায়ু, জৈব অম্ল ক্ষারের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। একমাত্র ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করিলে উপরের পালিশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনামাটি উত্তাপের কুপরিবাহী এবং কাঁচ অপেক্ষা অধিক তাপ-সহ। তাই চা, কফি, কোকো প্রভৃতি গরম পানীয়ের পাত্র হিসাবে ইহা বিশেষ উপযোগী। কাঁচের চেয়েও ইহা পরিষ্কার করা সহজ এবং দামও সস্তা। কাঁচ এবং চীনামাটি উভয় প্রকার বাসনই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উপযোগী।

নিকেল—আমরা নিকেলের চামচ, কাঁটা, ছুরি প্রভৃতি ব্যবহার করি। শুকনো বাতাসে নিকেলের উপর কোন কলঙ্ক পড়ে না, কিন্তু বাতাসে যদি হাইড্রোজেন সালফাইড থাকে তাহা হইলে নিকেলের বাসনের উপর কালচে ছোপ পড়ে। একমাত্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ছাড়া আর সকল প্রকার অমিশ্রিত তীব্র অম্ল (con. acid) দ্বারা ইহা আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু মৃদু জৈব অম্লে ইহার উপর কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না। নিকেল পরিষ্কার করা সহজ এবং ইহাতে খুব ভাল পালিশ হয়। তাই খাইবার কাঁটা, চামচ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পিতল বা তামার উপর নিকেলের পলস্তারা লাগাইয়া লইলে রান্নার বাসন হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। নিকেলের কালো কলঙ্ক গাঢ় ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে সহজেই উঠানো যায়।

ক্রোমিয়াম—ক্রোমিয়ামের বাসন আমরা ব্যবহার করি না, কিন্তু ক্রোমিয়াম দ্বারা প্লেটিং করা বাসন আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ক্রোমিয়াম বায়ু বা জল দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ক্ষারও ইহার সহিত

কোনরূপ বিক্রিয়া ঘটায় না। কিন্তু অ্যাসিড দ্বারা ইহা আক্রান্ত হয়। ক্রোমিয়াম প্লেটিং বহুদিন টেকে। প্রথমে নিকেল প্লেটিং করিয়া, তাহার পর ক্রোমিয়াম প্লেটিং করিতে হয়। ইহা অতিশয় উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্ন।

স্টেনলেস স্টীল—ইহা মিশ্রধাতু। নিকেল, ক্রোমিয়াম এবং লৌহ এই তিনটি ধাতুর মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। কোন মৃদু রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ইহা আক্রান্ত হয় না। বায়ু বা জল দ্বারাও ইহা আক্রান্ত হয় না। এইজন্য স্টেনলেস স্টীলের বাসন রন্ধন, পরিবেশন এবং খাইবার পাত্র হিসাবে উপযোগী। ইহা অতিশয় উজ্জ্বল এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়। টেকসই, হাত হইতে পড়িয়া গেলে ইহা সহজে ভাঙে না। তবে অতিশয় উজ্জ্বল বলিয়া ইহা খুব দ্রুত তাপ বিকিরণ করে। তাই রন্ধনের পূর্বে বাহিরের অংশে মাটির প্রলেপ দিয়া লইলে আর কোন অসুবিধা হয় না। কাঁসা ও পিতলের বাসন অপেক্ষা ইহার দাম কিছু বেশী হইলেও, অন্যান্য সুবিধার দিকগুলি বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে ঐ সুবিধার তুলনায় দাম কিছুই নহে।

এ্যালুমিনিয়াম—আজকাল এ্যালুমিনিয়ামের নানাপ্রকার বাসনপত্র এবং অন্যান্য অনেক জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। অধিকাংশ গৃহেই এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়া, ডেকচি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন বাটি, টিফিন কৌটা, রং করা এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস, প্লেট, সাবান-দানি প্রভৃতিও পাওয়া যায়। এই সকল বাসন দামে সস্তা, সহজে ভাঙে না, পরিষ্কার করা সহজ এবং হালকা। উনানে বসানো মাত্র গরম হইয়া উঠে, কিন্তু স্বচ্ছ তলবিশিষ্ট বলিয়া উত্তাপ বিচ্ছুরণ অতি দ্রুত হয়। ফলে উত্তাপ বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি গরম হয় তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া যায়। শুষ্ক বাতাসে এ্যালুমিনিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভিজা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে অক্সাইড প্রস্তুত হয়। উহা একটি মোটা স্তর প্রস্তুত করিয়া পাত্রের গায়ে এমনভাবে লাগিয়া থাকে যে ভবিষ্যতে পাত্রটি আর অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। উহা দুর্ভেদ্য আবরক হিসাবে কাজ করে। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে জল গরম করিলেও এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রস্তুত হয়, আর হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে এবং ইহাতে এ্যালুমিনিয়াম পাত্রটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অর্গানিক এসিড বা জৈব অম্লের সংস্পর্শে আসিলে এ্যালুমিনিয়াম সামান্য আক্রান্ত হয়, তাই অম্ল পদার্থ ইহাতে রন্ধন না করাই

ভাল। ক্ষারের সংস্পর্শে আসিলে এ্যালুমিনিয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইজন্য কাপড় কাচা সোডা কখনও এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখিয়া ফুটানো উচিত নয়। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিলেও রন্ধনের জন্য বা কাপড় সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার না করাই ভাল। একমাত্র এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে তাপের অপচয় ঘটে।

টিন—আমরা যাহাকে 'টিন' আখ্যা দিয়া থাকি (যেমন—করগেট শীট, ক্যানাস্তারা টিন প্রভৃতি) ঐগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিন নামক ধাতু দ্বারা প্রস্তুত নয়। টিন হইল একপ্রকার রাং। বাসনপত্র ঝালাই করিবার জন্য ইহা হামেশাই ব্যবহৃত হয়। টিনের বিশেষত্ব এই যে ইহা বাঁকাইলে শব্দ হয়। অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এমন কি অতিরিক্ত শীতল জল না হইলে জলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহার দ্বারা কোন বাসন প্রস্তুত হয় না। বাসনে পলস্তারা লাগাইবার জন্য এই ধাতু ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে পড়িলে টিন গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। অজৈব অম্ল দ্বারা ইহা আক্রান্ত হইলেও সাধারণ ক্ষারের দ্বারা ইহা আক্রান্ত হয় না।

মাটির বাসন—গ্রামাঞ্চলে আজও মাটির বাসন প্রচলিত আছে। মাটির হাঁড়ি, কড়া, চাটু, গামলা প্রভৃতি রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয়। গ্রামাঞ্চলে কাঠের জ্বালে রান্না হয় বলিয়া মাটির বাসন সহজে ফাটিয়া যায় না। মাটিতে ক্ষার, অম্ল, জল, বায়ু কোন কিছুরই প্রতিক্রিয়া হয় না। সেইজন্য যে কোন ব্যঞ্জনাদি ইহাতে রন্ধন করা চলে। মাটির বাসন গরম হইতে দেরি হয়। ইহা তাপের কুপরিবাহী। ইহার তল অস্বচ্ছ বলিয়া উত্তাপ বিকিরণ কম হয়। তাই রন্ধন-পাত্র হিসাবে ইহা বিশেষ উপযোগী এবং দামেও সস্তা কিন্তু সহজে ভাঙিয়া যায়। পরিষ্কার করা বা পরিষ্কার রাখারও নানারূপ অসুবিধা আছে। মাটির বাসন মাজা-ঘষা করা চলে না। ইহা নরম কাপড়ের সাহায্যে গরম জল বা সোডার জল দিয়া রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও খুব ভাল পরিষ্কার হয় না। তাই ক্রমশঃ মাটির রন্ধন-পাত্রের প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। তবে আজও ভারতের সর্বত্র পানীয় জলের পাত্র হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাটির কলসী, কুঁজা, জালা প্রভৃতিতে জল রাখিলে জল সুস্বাদু

ও সুশীতল হয়। তাহার কারণ মাটির পাত্রের গায়ে অজস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় জলকণা পাত্রের বহির্গাত্রে আসিয়া জমা হয়। তাহাতে বাতাস লাগিয়া তাপ হরণ করে। ফলে জল শীতল হয়।

এনামেল করা বাসন—তিনপ্রকার এনামেল করা বাসন আমরা বাজারে দেখিতে পাই—নিকেল প্লেটিং, ক্রোমিয়াম প্লেটিং, কলাই করা। এনামেল দেওয়ার উদ্দেশ্য ধাতুটিকে ক্ষার, অম্ল, অক্সিজেন প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। এনামেল বা প্লেটিং করা থাকিলে অম্ল, ক্ষার, জল বা বায়ু উহার উপর কোনরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইতে পারে না। কিছু পরিমাণ উত্তাপও ইহা সহিতে পারে। তামা, পিতল এবং লৌহের পাত্রের উপর এনামেলিং হয়। সাধারণতঃ পিতলের ও তামার উপর নিকেল ও ক্রোমিয়াম প্লেটিং করা হয়। আর লৌহের উপর কলাই করা হয়।

কলাই বা এনামেল অস্বচ্ছ কাঁচ বিশেষ। ইহাতে অম্ল, ক্ষার, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন এবং কিছু পরিমাণ উত্তাপ সহ্য হয়। কিন্তু এইরূপ এনামেল করা পাত্রে রান্না করা উচিত নহে। অনেকক্ষণ উত্তাপ পাইলে এনামেল চটিয়া ভাত বা তরকারির সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। খাওয়ার বাসন হিসাবে বা পরিবেশনের জন্য ইহা ব্যবহার করা যায়। তবে পাত্রের ভিতর দিকে একবার চটা উঠিতে শুরু করিলে উহা বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। এই পাত্রগুলির দাম সস্তা, দেখিতে ভাল ও পরিষ্কার করা খুবই সহজ। কিন্তু পড়িয়া গেলে বা ঠোকা লাগিলে চটা উঠিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। টিনের কোটিংও দেওয়া হয়। টিনের কোটিং দেওয়া থাকিলে ধাতুটি অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কারণ টিনের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। সাধারণতঃ মোরাদাবাদী বাসনে টিনের পলস্তারা দেওয়া থাকে। টিনের এনামেল দেওয়া থাকিলে, একবার এনামেল উঠিয়া গেলে পুনরায় এনামেল করানো যায়। কিন্তু কলাই করা বাসনের এনামেল একবার উঠিয়া গেলে দ্বিতীয়বার করানো যায় না। টিনের কোটিং লাগানো খুব সহজ। গলিত টিনের মধ্যে হয় পাত্রটি ডুবাইয়া দিতে হয় অথবা ব্রাশের সাহায্যে টিনের কোটিং পাত্রের গায়ে লাগাইয়া দিতে হয়।

গ্যালভানাইজিং (Galvanizing)—যখন জিঙ্ক বা দস্তা দ্বারা

পলস্তারা লাগানো হয় তখন তাহাকে "গ্যালভানাইজিং" করা বলা হয়। সাধারণতঃ লোহার উপর দস্তার পলস্তারা দেওয়া হয়। এই সকল পাত্র রান্নার কাজে লাগে না। বালতিতে এইভাবে দস্তার পলস্তারা দেওয়া থাকে। তবে লৌহের চাদর দ্বারা তৈয়ারী বালতিটি প্রথমে সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া পরিষ্কার করিয়া, তারপর দস্তার কোটিং (আবরণ) দেওয়া হয়। এই কোটিং তীব্র ক্ষার বা অম্লের সংস্পর্শে আসিলে আক্রান্ত হয়। এইজন্য বালতিতে ব্লিচিং পাউডার অথবা চুন ব্যবহার করিতে নাই। শুকনা থাকিলে বায়ু দ্বারা ইহা আক্রান্ত হয় না। কিন্তু ভিজা অবস্থায় বায়ুর অক্সিজেনের সহিত দস্তার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং জিঙ্ক অক্সাইড প্রস্তুত হয়। ইহা দুর্ভেদ্য কোটিং-এর (আবরণের) কাজ করে।

গৃহ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ

আমরা যদি বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার জিনিস যথাস্থানে রাখিতে চাই তাহা হইলে ঐগুলি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রত্যেকটি ব্যবহার্য জিনিস সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে একমাত্র খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ভাঁড়ার ঘর ছাড়া সাধারণতঃ আর কোন জিনিস সুন্দরভাবে গুছাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকে না। অনেক বাড়িতে ছোট-বড় ঢেওঢাকনা রাখিবার জন্য গুদাম ঘর থাকে, আবার অনেক বাড়িতে তাও থাকে না। এছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, ঝাঁটা-বালতি, কয়লা-ঘুঁটে প্রভৃতি বিভিন্ন ঘরের কোথাও না কোথাও রাখা হয়। এইগুলি সংরক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্তের কথা কেহই ভাবেন না। তাহার ফলে কাজের সময় অনেক জিনিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যত্রতত্র জিনিসপত্র রাখার জন্য গৃহটি বিশৃঙ্খল দেখায়। ইহাতে অযথা সময় ও শ্রম নষ্ট হয়; তাই গৃহের প্রত্যেকটি জিনিসের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র সংস্থাপনের সুব্যবস্থার জন্য তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিলে সুবিধা হয়। যেমন—

(১) পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধন দ্রব্য এবং অন্যান্য ছোটখাটো জিনিস।

(২) বইপত্র, খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি।

(৩) খাদ্যদ্রব্য।

(৪) ঘরবাড়ি পরিষ্কার করিবার জিনিসপত্র—ঝাঁটা, বালতি, ফিনাইল ইত্যাদি।

(৫) বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ, পরদা প্রভৃতি।

(৬) বাসনপত্র।

(৭) কাপড় কাচার সরঞ্জাম।

(৮) কয়লা, ঘুঁটে, অন্য জ্বালানী, উনুন প্রভৃতি।

(৯) সাইকেল, প্যারাম্বুলেটার ইত্যাদি।

(১০) আবশ্যকীয় ঢেওঢাকনা যেগুলি প্রতিদিন কাজে লাগে না কিন্তু মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়, যেমন—রাজমিস্ত্রীর কাজের জিনিস, টিন, থলে, কাঠের তক্তা ইত্যাদি।

আগেকার দিনে উদ্‌বৃত্ত জিনিসপত্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চিলের ছাদের চোরকুঠুরি ব্যবহার করা হইত অথবা বাটির অর্ধেক তলায় বা মাটির নীচে বড় বড় গুদাম ঘর এবং ভাঁড়ার ঘর করা হইত। এই সব জায়গায় অধিকাংশ জিনিস গুদাম জাত করা হইত। একবার এইরূপ গুদামে রাখিলে তারপর আর সহজে তাহা বাহির করা যাইত না। কেবল তাহাই নহে। এই গুদাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিতে পারিলে জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যাইত। আধুনিক যুগে তাই এইরূপ বৃহৎ অন্ধকার গুদাম ঘর করিবার রেওয়াজ চলিয়া গিয়াছে। আজকাল বাড়ির নকশা প্রস্তুত করিবার সময় এমনভাবে করা হয় যাহাতে প্রত্যেকটি ঘরের দেওয়াল, দেউড়ি, সিঁড়ির তলা, উঁচু রকের তলা, গ্যারেজ প্রভৃতিকে গুদাম করিবার কাজে লাগানো যাইতে পারে। এ ছাড়া খাট প্রভৃতি আসবাবপত্রগুলিতে ড্রয়ার (টানা) রাখিলেও সুবিধা হয়।

এখন আমরা দেখিব, কোন্ জিনিস কোথায় রাখিতে পারা যায়।

(১) **পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন দ্রব্য ও অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবহারের জিনিস**—শয়ন-কক্ষের দেওয়ালগুলিতে দেওয়াল-আলমারি করিয়া দরজা বসাইয়া দিলে পোশাক-পরিচ্ছদ রাখা যায়। কাঠের বা স্টীলের আলমারিতেও কাপড়-জামা রাখা যাইতে পারে। স্টীলের তোরঙ্গ, বাক্স,

চামড়ার সুটকেশ প্রভৃতিতে পোশাক-পরিচ্ছদ রাখা যায়। বিশেষ করিয়া দামী রেশমী বা পশমী জিনিসের জন্য স্টীলের তোরঙ্গ অথবা স্টীলের আলমারি ভাল। আজকাল শহরাঞ্চলে জমির দাম অতিরিক্ত হওয়ায় লোকে শয়ন-কক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকারের করিতে বাধ্য হয়। ছোট ঘরে বেশী আলমারি বা বাক্স রাখিলে মেঝে জোড়া হইয়া যায়, তাই ছোট ঘরের পক্ষে দেওয়াল-আলমারিই ভাল। স্থান থাকিলে শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর করিতে পারিলে সেই ঘরে পোশাক-পরিচ্ছদ রাখা যাইতে পারে।

প্রসাধন-সামগ্রী ও অন্যান্য ছোটখাটো জিনিশ ড্রেসিং টেবিলের টানা বা তাকে রাখা যাইতে পারে।

(২) **বই-পত্র, দৈনিক-পত্র এবং মাসিক-পত্রিকা**—এইগুলি পড়িবার ঘরের দেওয়াল-আলমারিতে বা কাঠের সেলফে রাখা যাইতে পারে। যে বাড়িতে পড়িবার জন্য স্বতন্ত্র ঘর নাই সেই বাড়িতে দরদালান বা যাতায়াতের জন্য লম্বা বারান্দা প্রভৃতি স্থানের দেওয়াল-আলমারিতে ঐগুলি রাখিলে সুবিধা হয়।

(৩) **খাদ্যদ্রব্য**—রান্না ঘরে অথবা উহার সংলগ্ন ভাঁড়ার ঘরে রাখাই ভাল। রান্না ঘর ও ভাঁড়ার ঘরে প্রচুর দেওয়াল-আলমারি এবং তাক করিতে হইবে। সেই তাকগুলিতে জাল লাগানো দরজা লাগাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে পোকা-মাকড় ঢুকিতে পারিবে না।

(৪) **ঝাঁটা, বালতি প্রভৃতি**—উঠানে পাঁচিলের গায়ে বড় কুলুঙ্গি বা তাক করিলে সেখানে রাখা যাইতে পারে, অথবা উঁচু রকের তলায় যে স্থান থাকে সেখানেও রাখা যায়।

(৫) **কাপড় কাচিবার সরঞ্জামগুলি**—কাপড় কাচিবার ঘরে বা কাপড় যেখানে কাচা হয় সেইখানে দেওয়ালের তাকে রাখাই সুবিধা। তবে ইস্ত্রি করিবার জিনিসগুলি যেখানে প্লাগ পয়েন্ট (plug-point আছে) সেইখানে অথবা রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দার একদিকে রাখা যায়।

এখন দেখা যাক, কিভাবে এই সকল জিনিস প্রস্তুত করিলে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে সব কিছু রাখা যায়।

(১) **আলমারি বা তাক**—আগেকার দিনে বড় বড় ঘর-জোড়া কাঠের আলমারি ব্যবহার করা হইত। ইহার মধ্যে জামা-কাপড় হইতে আরম্ভ

করিয়া যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা হইত। কিন্তু আজকাল ঐরূপ বৃহৎ আলমারির রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট অনেকগুলি আলমারি বা তাক করা হয়। যেমন—শয়ন-কক্ষের দেওয়ালে দেওয়াল-আলমারি করা হয়। এই আলমারিগুলির মাপ ১'৮ × ১'২ মিটার হইবে। আবার সরু দেওয়াল হইলে ১'২ × '৬ মি. মাপ হইতে পারে। প্রথমটিতে দুইটি দরজা ও দ্বিতীয়টিতে একটি দরজা থাকিবে। আলমারিগুলির গভীরতা ন্যূনপক্ষে '৫/'৫২ হইবে। তাহা না হইলে হ্যাঙ্গার (hanger) রাখা যাইবে না। আজকাল অধিকাংশ বাড়ির দেওয়াল '২৫ মি. হয়। তাই '১২ মি.-এর

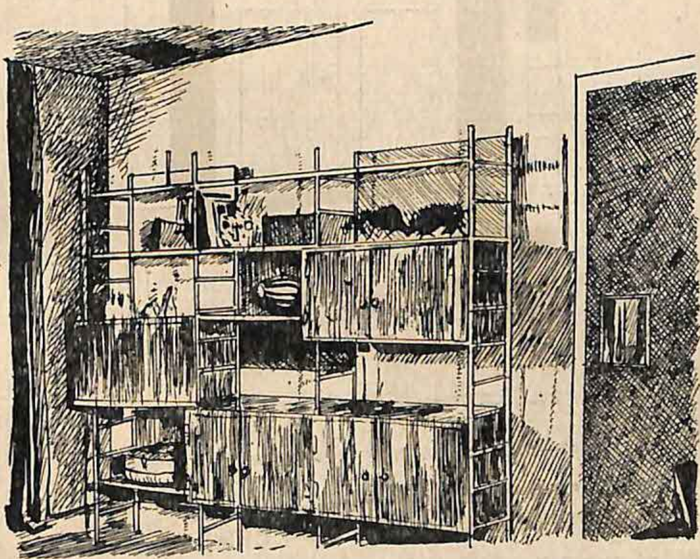


চিত্র নং—৩২ (ক) : জিনিসপত্র সংরক্ষণের আধুনিক আসবাব

অধিক স্থান দেওয়ালের ভিতর থাকে না। এই সকল ক্ষেত্রে বাকী '৩৮/'৪৩ মি.-এর দেওয়াল হইতে বাহির হইয়া থাকিবে। মেঝের '২৫ মি. উপরে দেওয়ালের গায়ে আলমারি করা উচিত। তাহা না হইলে মেঝে পরিষ্কার করিতে অসুবিধা হয়। আলমারির ভিতর দিকে দরজার পাল্লায় জুতা

রাখার র‍্যাক থাকিবে। ইহা ভিন্ন আলমারির মধ্যে তাক ও হ্যাঙ্গার রাখার জন্য রড লাগানো থাকিবে [ছবি নং ৩২(ক)]। দরজার গায়ে জুতার র‍্যাকের উপরে আরও দুই-একটি র‍্যাক করিতে পারিলে হাতব্যাগ, মোজা ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখা যায়।

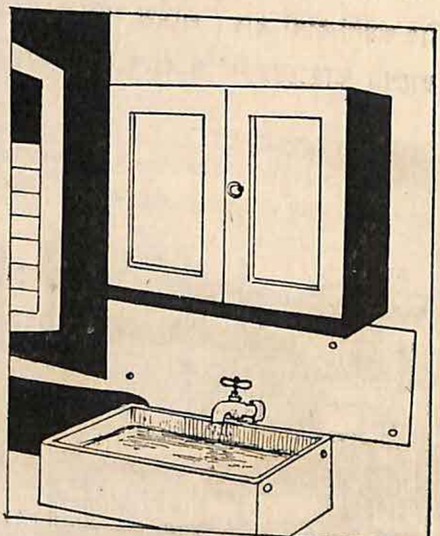
জ্বালানী—উনানের উপর দেওয়ালের গায়ে তক্তা লাগাইয়া তাক করিয়া লইলে ঘুঁটে বা কাঠ রাখার সুবিধা হয়। উনানের গরমে ঐগুলি বেশ শুকনা খটখটে থাকে। উনানের পাশে একটি ঢাকা চৌবাচ্চা করিয়া তাহার ভিতর প্রয়োজনীয় কয়লা রাখা যায়। অনেক পরিবার একসঙ্গে একমাসের কয়লা কিনিয়া রাখে। তাহাদের সিঁড়ি বা রকের তলায়ও কয়লা রাখিলে



চিত্র নং—৩২ (খ) : জিনিসপত্র সংরক্ষণের আধুনিক আসবাব

সুবিধা হয়। অনেক বাড়িতে উঠানের একপাশে বড় চৌবাচ্চা গাঁথা থাকে। উহার মধ্যে কয়লা ঢালিয়া রাখা হয়। ইহাতে কয়লার গুঁড়া ছড়ায় না, অথচ প্রয়োজনমতো কয়লা বাহির করিয়া ভাঙিয়া লওয়া চলে। এইরূপ চৌবাচ্চায় ঢাকা দিয়া লইতে পারিলে শুকনা গুল এবং ঘুঁটেও রাখা যায়। যাহাদের উঠান নাই তাহারা ছাদে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে।

অন্যান্য জিনিসপত্র—প্রত্যেক সংসারেই একটি গুদাম ঘর রাখা উচিত। এই গুদাম ঘরটি একতলার কোন একটি ঘর অথবা সিঁড়ির মাথার ঘর হইতে পারে। এই ঘরটিতে প্রচুর তাক লাগাইয়া বা দেওয়ালে পেরেক লাগাইয়া লইতে হয় এবং ছাদ হইতে চালি ঝুলাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে প্রচুর জিনিসপত্র রাখার স্থান হয়। যাহাদের এইরূপ সুবিধা নাই তাহারা উপরের সিঁড়িতে হাফ-ছাদ করিয়া লইলে তাহার উপর বহু জিনিস রাখিতে পারে।



চিত্র নং—৩২ (গ): জিনিসপত্র সংরক্ষণের আধুনিক আসবাব

বিছানার চাদর প্রভৃতি—খাটের তলায় টানা লাগাইয়া লইলে এই সকল জিনিস রাখার সুবিধা হয়। বাড়তি বিছানা চালির উপর রাখা যাইতে পারে অথবা খাটে বা চৌকির উপরও পাতিয়া রাখা যায়। একমাত্র বালিশগুলি হয় চালিতে, না হয় খাটের টানায় রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

বাসনপত্র—রান্নার বাসন রান্নাঘরে এবং খাইবার বাসন খাইবার ঘরের দেওয়ালের তাকে রাখা যায়। বড় বড় বাসন যাহা প্রত্যহ প্রয়োজন হয় না সেগুলি গুদামে রাখা উচিত।

সাইকেল, প্যারাম্বুলেটার প্রভৃতি গ্যারেজে রাখাই সুবিধা। কিন্তু যাহাদের গ্যারেজ নাই তাহারা সিঁড়ির নীচে বা একতলার ঘরে রাখিতে পারে। সাইকেল মাটিতে না রাখিয়া কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর রাখিলে ভাল হয়। মাটিতে রাখিলে চাকার টায়ার-টিউবে চাপ পড়ে, ফলে তাড়াতাড়ি চাকার হাওয়া কমিয়া যায়।

অনুশীলনী

E. ১৯৬০ (১০)। নিম্নলিখিত যে কোন একটি কেমন করিয়া পালিশ করিবে?—(a) কাঠের চেয়ার, (b) হাড়ের বাঁটের স্টীলের ছুরি, (c) কারুকার্যখচিত তাম্রপাত্র।

উঃ সং—(১) উপকরণ, (২) পদ্ধতি।

E. ১৯৬১ (১১)। নিম্নলিখিত যে কোন একটি কেমন করিয়া প্রতিরোধ করিবে তাহা কারণসহ ব্যাখ্যা কর—(a) লৌহে মরিচা পড়া, (b) পিতলে কলঙ্ক পড়া।

উঃ সং—সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখ।

E. ১৯৬৩ (১১)। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(a) এ্যালুমিনিয়ামে সোডার প্রতিক্রিয়া, (b) নরম ধাতুর উপর কঠিন ঘর্ষক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া।

উঃ সং—(a) সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখ।
(b) কঠিন ঘর্ষক ব্যবহার করিলে নরম ধাতুর উপর আঁচড় পড়ে এবং উহা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

E. ১৯৬৪ (১১)। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—
(a) মপ (ন্যাতা) এবং ঝাড়ন।
(b) পরিষ্করণ ও পালিশ।

উঃ সং—সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখ।

E. ১৯৬৫ (১১)। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—
(a) এ্যালুমিনিয়াম সস্‌প্যান পরিষ্কার ও পালিশ করা।
(b) শ্রম সংক্ষেপকারী উপায়সমূহ।

উঃ সং—(a) [১] পরিষ্করণ ও পালিশের উপকরণ এবং [২] পদ্ধতি।
(b) সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখ।

Objective type questions—

E. 1962 (10). Select the suitable cleansing agents for each of the articles from the list given against them :—

Articles	Cleansing agents—
(a) Ornamental silver tray.	Silvo, lemon, soapy water.
(b) Porcelain flower vase.	Washing soda, vim-powder, ash.
(c) Cut glass tumblers.	Bran water, ammonia, water.
(d) Brass cooking spoon.	Washing soda, tamarind, brasso.
(e) Enamel mixing bowls.	Fine sand, vim-powder, soapy water.

উঃ—রেখাঙ্কিত অংশগুলি সঠিক উত্তর।

গৃহমার্জনার সরঞ্জাম

ঘর-দ্বার এবং গৃহ-তৈজসাদি পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন—ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করিবার জন্য প্রয়োজন হয় ঝাঁটা, ঝাড়ু, বুরুশ, ঝাড়ন বা মোটা কাপড়ের টুকরা, খবরের কাগজ প্রভৃতি। গৃহ-তৈজসাদি পরিষ্কার করিবার জন্য প্রয়োজন হয় সাবান, সোডা, এ্যামোনিয়া, ভিনিগার, তেঁতুল, লেবু, নুন, মিহি ইটের গুঁড়ো, খড়ির গুঁড়ো, কাঠের চামচ, কাঁচের রড, শালপাতা, মিহি ছাই, ভীম-পাউডার প্রভৃতি।

ঝাঁটা ও ঝাড়ু—নারিকেল কাঠি দিয়া ঝাঁটা প্রস্তুত হয়, আর পাহাড়ী ঘাস দিয়া ঝাড়ু প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া আমাদের দেশে খেজুর পাতার ঝাড়ুরও প্রচলন আছে। ঝাঁটা শক্ত, কিন্তু ঝাড়ু নরম। ঝাঁটার সাহায্যে বসিয়া যাওয়া ময়লা ও কঠিন পদার্থ পরিষ্কার করার সুবিধা হয়। ঝুল ঝাড়িবার জন্য এবং ঘর-দ্বার ধুইবার জন্যও ঝাঁটা প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঝাড়ু দিয়া ধুলা ঝাড়িতে ও ঘর ঝাঁট দিতে সুবিধা হয়। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বড় জায়গা ঝাঁট দিবার সময় একটি বংশদণ্ডের এক প্রান্তে নারিকেল কাঠি বাঁধিয়া লইয়া ঝাঁট দেওয়া হয়। ইহাতে কাজ অনেক সহজ হয়। ঝুল ঝাড়িবার জন্য বংশ-দণ্ডের মাথায় খেজুরপাতা অথবা পাট বাঁধিয়া লওয়া হয়।



চিত্র নং—৩৩ : পরিষ্করণ সরঞ্জাম

মপ (Mop)—লম্বা লাঠির মাথায় পাট, সুতার টুকরা অথবা রবারের টুকরা বাঁধিয়া মপ প্রস্তুত করা হয়। পাট বাঁধিয়া যে মপ হয় তাহার সাহায্যে ঝুল ঝাড়া হয়। সুতার টুকরা বাঁধা মপগুলি ঘর মোছার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতার মপে লাঠির পরিবর্তে মোটা লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে

আর রবার মপের সাহায্যে বড় বড় জায়গা জল দিয়া ধোয়ার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়।

বুরুশ—বসিয়া যাওয়া ধূলা বা ময়লা ঘষিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বুরুশ প্রয়োজন হয়। বুরুশ নানা জিনিসের হয়। এক-একটি বুরুশ এক-এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন শক্ত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ (fibre) দিয়া যে বুরুশ প্রস্তুত হয় তাহা পায়খানার প্যান, শেওলা ধরা দেওয়াল প্রভৃতি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। সরু তার দিয়া যে বুরুশ প্রস্তুত হয় তাহা জমিয়া কঠিন হইয়া যাওয়া ময়লা পরিষ্কার করিবার কাজে লাগে। এই জন্য এই বুরুশ রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। লোমের বুরুশগুলি জামা-কাপড়, জুতা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিসগুলি ঝাড়িবার জন্য প্রয়োজন হয়। এইগুলি প্রথম দুটির তুলনায় নরম, তাই আলগা ধুলা-ময়লা পরিষ্কারে ইহা উপযোগী।

ঝাড়ন—কাপড় অথবা পালকের ঝাড়ন ধুলা ঝাড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সরু কাঠির মাথায় পাখির পালক বাঁধিয়া পালকের ঝাড়ন তৈয়ারী হয়। এই-গুলি নরম বলিয়া দামী আসবাব-পত্রের এবং কাচের উপরের ধুলা ঝাড়িলে আসবাব বা কাচে আঁচড় পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কাপড়ের ঝাড়ন জলে ভিজাইয়া মোছার কাজ হয়। নূতন ঝাড়নের পরিবর্তে পুরাতন কাপড়েও এই কাজ হইতে পারে।

ডাস্টপ্যান—হাতল লাগানো ধুলা তুলিবার প্যানগুলি টিনের তৈয়ারী। বড় জায়গা ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে ধুলাবালি জড়ো করিয়া ডাস্ট-প্যানের সাহায্যে তুলিয়া লইতে হয়। অল্প ময়লা হাতে উঠানো যায়, কিন্তু বেশী হইলেই ডাস্ট-প্যান প্রয়োজন হয়।

বালতি, মগ—গ্যালভানাইজড শীটের, পিতলের, স্টীলের বা প্লাস্টিকের অথবা এ্যালুমিনিয়ামের হইতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ জল তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয়। আবার অন্য কাজেও লাগে।

পরিষ্করণ উপকরণ—তৈজসাদি পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন—

(১) সাবান-সোডা—যে কোন জিনিসের তেল, ময়লা ইত্যাদি তুলিবার জন্য ব্যবহার হয়।

(২) ভীম পাউডার—পোড়া বাসনের কালি তুলিবার জন্য ইহা প্রয়োজন।

(৩) তেঁতুল ও ভিনিগার বা লেবু—পিতল, কাঁসা, তামা প্রভৃতির কলঙ্ক তুলিবার জন্য ঐগুলি দরকার।

(৪) মিহি ছাই বা ইটের গুঁড়া—এইগুলি ঘর্ষক দ্রব্য। বসিয়া যাওয়া তেল বা কালি উহাদের সাহায্যে ঘষিয়া উঠানো হয়। এ ছাড়া খড়ির গুঁড়া, হোয়াইটিং, স্টিলউল, স্যাময় লেদার প্রভৃতি ধাতুর বাসন পালিশ করিবার জন্য প্রয়োজন হয়।

গৃহমার্জনা

প্রত্যেকটি গৃহিণীকেই গৃহমার্জনা এবং গৃহের তৈজসপত্র পরিষ্কার করিতে হয়। স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। তাই সকল গৃহিণীরই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা উচিত। গৃহমার্জনা ও তৈজসাদি পরিষ্করণের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিলে অল্প সময়ে এবং শ্রমে সুচারুরূপে গৃহ-মার্জনা সম্ভব হয়। গৃহমার্জনার সঠিক পদ্ধতি জানিতে হইলে মালিন্যের কারণ, উহাদের বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথমেই জানিতে হইবে।

অপরিচ্ছন্নতার কারণ—অপরিচ্ছন্নতার কারণ মোট চারিটি। যথা—(১) ধুলা, (২) ময়লা, (৩) কলঙ্ক ও (৪) দাগ।

(১) **ধুলা**—ধুলা বায়ুর সহিত বাহিত হইয়া আসবাবপত্র, মেঝে, জানালা-দরজা, দেওয়াল প্রভৃতির উপর জমা হয়। ধুলার মধ্যে জৈব, অজৈব সকল প্রকার পদার্থ চূর্ণ অবস্থায় মিশ্রিত থাকে ; যেমন—পাথর, বালি মাটি, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ এবং নানা জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ শুষ্ক ও চূর্ণ হইয়া ধুলার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। ছাই, শন বা পাটের গুঁড়া প্রভৃতিও থাকে। এছাড়া অজস্র জীবাণুও ধুলা-ময়লার সহিত মিশ্রিত থাকে। মানুষের কফ বা থুতু, মলমূত্র ইত্যাদি রৌদ্রে শুকাইয়া ধুলার সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাদের মধ্যে অজস্র রোগজীবাণু বর্তমান থাকে এবং উপযুক্ত মাধ্যম ও পরিবেশ পাইলে সক্রিয় হইয়া উঠে ও স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

প্রথমতঃ, ধুলা খুব হালকা হইলেও উহা বায়ু অপেক্ষা ভারী। এই জন্য বায়ু দ্বারা উহা তাড়িত হইলেও বায়ুর গতি মন্দীভূত হওয়া মাত্র বসিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ধুলা শুকনা তাই যে কোন ভিজা দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে উহাতে আটকাইয়া যায়; ঝাড়িলেও যায় না। তৃতীয়তঃ, তৈলাক্ত পদার্থ পড়িলে ধুলা চিট হইয়া যায়। তখন উহা পরিষ্কার করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, মসৃণ স্থান অপেক্ষা অসমতলে ধুলা বেশী জমা হয় এবং ঐ ধুলা পরিষ্কার করাও কঠিন।

(২) **ময়লা**—ধুলা এবং ময়লার মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। ধুলা দ্বারাই ময়লা সৃষ্টি হয়। আলগা ধুলা যখন তৈলাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া কোন জিনিসের উপর বসিয়া যায় তখন তাহাকে ময়লা বলা হয়। ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প, মনুষ্য শরীর হইতে নির্গত ঘামের দ্বারাই ময়লা সৃষ্টি হয়।

(৩) **কলঙ্ক**—ধুলা-ময়লা ছাড়াও অপরিচ্ছন্নতার আরো একটি কারণ আছে। তাহা হইল কলঙ্ক। বায়ু, জলীয় বাষ্প, অম্ল ও ক্ষার পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া ধাতব-তৈজসাদির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে কলঙ্ক ও মরিচা পড়ে। উহা কেবল পদার্থটিকেই মলিন করে না, উহাকে জীর্ণ করিয়াও ফেলে। কলঙ্ক ঐ ধাতব পাত্রের অক্সিজেন বা গন্ধক ঘটিত লবণ (Oxide or sulphide)। এই লবণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, তাই উহা বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তবে ধুলা-ময়লা পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি হইতে এই পদ্ধতি ভিন্ন হইবে।

(৪) **দাগ**—এই সকল কারণ ছাড়াও বিভিন্ন জিনিসের দাগ লাগিয়াও জিনিসপত্র অপরিষ্কার হয়। দাগ ধুলা, ময়লা বা কলঙ্ক নহে। কাপড় জামা বা অন্য কিছু হঠাৎ কোন জৈব, অজৈব বা ধাতব পদার্থ অথবা অন্য কোন জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে ঐ জিনিসের খানিকটা চিহ্ন থাকিয়া যায়, তখন উহাকে দাগ বলে। যেমন—চা খাইবার সময় যদি একটু চা পড়িয়া যায় তাহা হইলে কাপড়ে চায়ের দাগ পড়িবে। এই ভাবে কোন কোন তরল বা অর্ধতরল পদার্থ শুকনা জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে দাগ হয়।

গৃহমার্জনার প্রয়োজনীয়তা—যে কোন কারণেই ময়লা হউক, তাহা পরিষ্কার করা উচিত। তাহার কারণ—

(১) ময়লা হইলে অতি সুন্দর জিনিসকেও অসুন্দর দেখায়। তাই সৌন্দর্যরক্ষার জন্যই পরিচ্ছন্নতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

(২) ইহা ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা

হইয়াছে, ধুলা-ময়লার সহিত অসংখ্য রোগজীবাণু থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই এই সকল রোগজীবাণুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গৃহের প্রত্যেকটি জিনিস এবং প্রত্যেকটি স্থান পরিষ্কার করা ও রোগজীবাণু নির্জীবন করা প্রয়োজন। বাসনপত্রের কলঙ্ক স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। তাই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ব্যঞ্জনাদি যে সকল বাসনপত্রে রাখা হয় তাহা কলঙ্কমুক্ত করা কর্তব্য।

(৩) যে যে জিনিস অপরিচ্ছন্নভাবে ফেলিয়া রাখা হয় সেই সেই জিনিসই অল্পদিনে নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ধুলা-ময়লা নির্দিষ্ট জিনিসটি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেমন—কার্পেট যদি নিয়মিত পরিষ্কার করা না হয় তাহা হইলে ধুলা জমিতে থাকে এবং লোমের মধ্যে ক্রমশঃ ধুলা জড়ো হয়। তারপর ঐ কার্পেটের উপর চলা-ফেরা করিলে ঘর্ষণে লোম কাটিয়া যায়; ক্রমশঃ কার্পেটের উপরের লোমগুলি উঠিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত কার্পেটখানি নষ্ট হইয়া যায়। যখন ধুলা তৈলাক্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাপড়ে বা যে কোন জিনিসে বসিয়া যায় তখন উহার সহিত ঐ জিনিসটির তন্তুর এক প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। তাহার ফলে তন্তুর সহিত ময়লার রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে। এই অবস্থার সৃষ্টি হইলে ঐ পোশাক পরিষ্কার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরিষ্কার করিবার জন্য তীব্র ক্ষার ব্যবহার করিতে হয় এবং বস্ত্রের সুতা জীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ বার বার ঘটিতে থাকিলে অচিরে বস্ত্রটি ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। যে কোন জিনিস অতিরিক্ত ময়লা হইতে দিলে অথবা ময়লা অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখিলে তেলের মধ্যে যে অম্ল পদার্থ থাকে তাহা কাপড়ের তন্তুকে দুর্বল করিয়া ফেলে।

পরিষ্করণের নীতি (Principles of cleaning)

(১) মালিন্য এবং মলিন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ময়লা অপসরণের পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে।

(২) ময়লা হওয়া মাত্র উহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৩) পরিষ্কার করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, একটি জিনিসের ময়লা যেন অপর জিনিসের উপর গিয়া জড়ো না হয়। যেমন—ঘরের মেঝে সাবধানে ঝাঁট দিতে না পারিলে উহার ধুলা আসবাবপত্রের উপর আসিয়া জমে।

(৪) ধুলা-ময়লা তৎক্ষণাৎ বাড়ীর বাহিরে ডাস্টবিনে অথবা কোন ঢাকা পাত্রে ফেলিয়া দিতে হইবে। যে সকল স্থানে সেরূপ ব্যবস্থা নাই সেই সকল স্থানে পোড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

(৫) এমন কোন পরিষ্করণ দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত নহে যাহা ময়লা জিনিসটিকে পরিষ্কার করার বিনিময়ে নষ্ট করিয়া দিবে। যেমন—কাপড় ধুইতে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করিলে কাপড়টি পরিষ্কার হইবে বটে কিন্তু উহা পচিয়া যাইবে।

(৬) সকল সময় যে কোন জিনিস পরিষ্কার করিবার জন্য প্রথমে সাধারণ মৃদু সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং ক্রমশঃ খর বা উগ্র দ্রাবক ব্যবহার করিতে হয়। একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া বিশেষ পরিষ্করণ দ্রব্য ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আলগা ধুলা পরিষ্কার করিবার উপায়—আলগা ধুলা পরিষ্কার করিবার জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা হয় ; যথা—

(১) অপসারণ (Dispersal)—কোন কিছুর সাহায্যে পিটাইয়া, বুরুশের সাহায্যে ঝাড়িয়া অথবা হাতে করিয়া ধরিয়া ঝাড়িয়া আলগা ধুলা পরিষ্কার করা হয়। ঘরের মধ্যে এইভাবে ধুলা ঝাড়িলে অন্য জিনিসে উড়িয়া পড়ে। তাই এই কাজ বাহিরে করিতে হয়। পাপোশ, কার্পেট, কম্বল, সতরঞ্চি, গরম জামা প্রভৃতি জানালার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া হাওয়ার উলটা দিকে ঝাড়িতে হয়, যাহাতে হাওয়ার সহিত ধুলা পুনরায় ঘরে প্রবেশ না করে।

(২) ধুলা জড়ো করা—ঝাঁট দিয়া ধুলা জড়ো করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঘরের মেঝে এই ভাবে পরিষ্কার করা হয়। কার্পেটের ধুলাও কার্পেট-ঝাড়া বুরুশ বা যন্ত্রের সাহায্যে জড় করা হয়।

(৩) ঘর মোছা—ছেঁড়া কাপড় জলে ভিজাইয়া ঘরের জানালা, দরজা ও মেঝে মুছিয়া ফেলিলেও ধুলা যায়।

ঝাঁট দিবার সাধারণ নিয়মাবলী—

(১) উপর হইতে ধুলা ঝাড়িতে শুরু করিতে হয় এবং ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে হয়। ইহাতে যে অংশের ধুলা পরিষ্কার করা হইল তাহাতে আর ধুলা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

(২) ঘরের ধুলা ঝাড়িবার পূর্বে ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে হাওয়ায় ধুলা ছড়াইতে পারে না।

(৩) দরজার দিক হইতে ধুলা ঝাঁট দিয়া জানালার দিকে লইতে হয়। তাহা না হইলে ধুলা দরজার দিকে জড়ো করিবার চেষ্টা করিলে দরজার দিক হইতে হাওয়া আসিয়া পুনরায় ঘরে ছড়াইয়া পড়ে।

(৪) ধুলা জড়ো করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাস্টপ্যানে তুলিয়া বাহিরে ঢাকা-পাত্রে জড়ো করিতে হয়।

(৫) খুব বড় জায়গা পরিষ্কার করিবার সময় সামনের দিকে ধুলা ঠেলিয়া জড়ো করিতে হয় এবং অল্প জড়ো হওয়া মাত্র তুলিয়া লইতে হয়। সমস্ত ধুলা একসঙ্গে জড়ো করিবার চেষ্টা করিলে ধুলা ছড়াইয়া যায়।

(৬) ঘরের কোণগুলি ঝাড়িবার সময় একদিক হইতে ধুলা ঝাঁট দিতে হয় এবং কখনও নিজের দিকে ধুলা টানিতে নাই, সম্মুখের দিকে ধুলা ঠেলিতে হয়।

গৃহমার্জনা

বাড়ীর প্রতিটি ঘর-দালান, আসবাব, বিছানাপত্র, বাসন-কোসন ও অন্যান্য জিনিস পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু সব কিছুই প্রত্যহ পরিষ্কার করিবার দরকার নাই। কতকগুলি জিনিস প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হয়, আবার কতকগুলি প্রতি সপ্তাহে করিলেও চলে। আবার এমন কতকগুলি পরিষ্কারের কাজ আছে যেগুলি বৎসরে দুই-একবার করিলেই যথেষ্ট। তাই পরিষ্কারের কাজগুলিকে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা ঋতুর পরিষ্করণ—এইভাবে ভাগ করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়।

দৈনন্দিন মার্জনা (Daily Cleaning)

দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি, যথা—(১) পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করা। (২) শ্রম ও সময় বাঁচানো, কারণ বেশী অপরিষ্কার হইলে পরিষ্কার করিতে সময়ও লাগে বেশী। (৩) জিনিসপত্র দীর্ঘস্থায়ী করা। অপরিষ্কার থাকিলে জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য জিনিসপত্র অধিকদিন অক্ষত রাখার জন্য পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

বিভিন্ন গৃহ পরিষ্করণের নিয়ম

(ক) **রন্ধন-গৃহ ঃ**

(১) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হয় বাহির করিয়া দিতে হইবে, না হইলে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

(২) রান্নার সমস্ত হাঁড়ি, কড়া ইত্যাদি তৈজসপত্র মাজিবার জন্য বাহির করিয়া দিতে হইবে। সেইগুলি পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া ফেলিতে হইবে।

(৩) উনানের ছাই বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৪) রান্নাঘরের তাকগুলি ও মিট্‌সেফ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) টেবিল ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৬) জল দিয়া ঘরের মেঝে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৭) পুনরায় সমস্ত জিনিস ভালভাবে মুছিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে।

(খ) **বসিবার ঘর ঃ**

(১) টেবিল-ক্লথ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সজ্জাদ্রব্য, ফুলদানি ইত্যাদি বাহিরে রাখিতে হইবে।

(২) জানালার পরদাগুলি গুটাইয়া দিতে হইবে।

(৩) জানালা, দরজা, আসবাবপত্র, ছবি—সব কিছু ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। আয়নার কাঁচ এবং ছবির কাঁচ জলে স্পিরিট মিশাইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৪) দেওয়ালের কোণ, জানালার পাশ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে হইবে এবং মুছিতে হইবে।

(৬) শেষে প্রত্যেকটি জিনিস পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হইবে, যেমন—টেবিলে ঢাকনা দেওয়া, ফুলদানিগুলিতে ফুল রাখা, পরদা ঠিক করিয়া দেওয়া, ছোট সাজাইবার জিনিসগুলি ঠিক করিয়া রাখা ইত্যাদি।

(গ) **শয়ন-কক্ষ ঃ**

(১) ঘরের সমস্ত জানালা ও দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।

(২) বিছানা ঝাড়িয়া, বেড-কভার দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে।

(৩) ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে এবং কাঁচ ও আয়না মুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৪) তারপর জানালা, দরজা, দেওয়াল যতটা সম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

বিছানা পাতার নিয়ম—বেড কভার, চাদর, বালিশ সব তুলিয়া এক জায়গায় জড়ো করিতে হইবে। চাদরখানি ভালভাবে ঝাড়িয়া পুনরায় টান করিয়া পাতিতে হইবে। চারিদিক এমনভাবে গুঁজিতে হইবে যাহাতে কোথায়ও না কুঁচকাইয়া থাকে। কোণগুলি ঠিকমতো ভাঁজ করিয়া গুঁজিতে হইবে। চাদরের সোজা দিক উপর দিকে থাকিবে। বালিশগুলি খুব ভাল করিয়া পিটাইয়া তুলাগুলি নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে বালিশটি উঁচু ও নরম হইবে। দ্বিতীয় চাদরখানি যেটি গায়ে দিবার জন্য পায়ের কাছে রাখা হয় সেইখানির উলটা দিক উপর দিকে থাকিবে। চাদরের পায়ের দিকটির সকল অংশ তোশকের তলায় গুঁজিয়া দিতে হইবে, আর উপরের অংশ ভাঁজ করিয়া তলার অংশের উপর রাখিতে হইবে। শীতের সময় যখন কম্বল বা লেপ রাখা হইবে তখন পায়ের কাছে ভাঁজ করিয়া রাখিতে হইবে, তলার দিক গুঁজিবার প্রয়োজন নাই। তারপর বেডকভার দিয়া ঢাকা দিতে হইবে। বেডকভার গুঁজিতে নাই। উহা চারিদিক দিয়া ঝুলিয়া থাকিবে।

(ঘ) বাথরুম বা স্নানের ঘর ঃ

(১) পায়খানা ও প্রস্রাবখানার প্যানগুলি ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর পরিষ্কার জল ঢালিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

(২) ভিম পাউডার ও নরম ব্রাশের সাহায্যে বেসিন ও বাথটব পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর ধুইয়া ও মুছিয়া শুকাইতে হইবে।

(৩) কাঠের আলনা, তাক প্রভৃতি যাহা আছে তাহা ঝাড়িতে এবং আয়নার কাঁচ মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৪) বাথরুমের মেঝে প্রথমে ঝাঁট দিয়া, পরে ভাল করিয়া রগড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। শেষে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(ঙ) হলঘর এবং সিঁড়ি ঃ

প্রথমে জানালা ও দরজা খুলিয়া আসবাবপত্রগুলি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ছবি ও আয়নার কাঁচ মুছিতে হইবে। তারপর হলঘর, সিঁড়ি

ঝাঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সিঁড়ির উপর হইতে নীচের দিকে মুছিতে মুছিতে নামিতে হইবে। মোছা হইলে পুষ্পাধার প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

(চ) বাহিরের সিঁড়ি ও উঠান :

প্রথমে সিঁড়ি, তারপর উঠান ঝাঁট দিতে হইবে এবং জল ঢালিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

সাপ্তাহিক পরিষ্কার
(Weekly Cleaning)

এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি প্রতিদিন পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সেগুলি পরিষ্কার করিতে হয়। সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি দৈনিক পদ্ধতি হইতে বিশেষ পৃথক নহে, তবুও নিখুঁত ভাবে বা যত্নের সহিত কাজগুলি করিতে হয় বলিয়া একটি পূর্ব-পরিকল্পনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ইহার তিনটি স্তর আছে—(১) প্রস্তুতিকরণ, (২) পরিষ্কারকরণ এবং (৩) পরিশেষ ক্রিয়া।

(১) প্রস্তুতিকরণ : (ক) প্রথমে ঘরের সমস্ত জানালা, দরজা, ভেন্টিলেটার প্রভৃতি খুলিয়া দিতে হইবে।

(খ) যে সমস্ত জিনিস আলাদাভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। যেমন —ছোটখাটো সজ্জা উপকরণ, টেবিল-ক্লথ, কুশান, কম্বল প্রভৃতি ঘরের বাহিরে আনিয়া রাখিতে হইবে।

(গ) ঘর ঝাড়িবার জন্য যে সমস্ত ঝাঁটা প্রভৃতি লাগিবে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।

(ঘ) আসবাবপত্র সমস্ত জড়ো করিয়া একধারে রাখিতে হইবে, এবং মোটা কাপড় বা dust sheet দিয়া ঢাকা দিতে হইবে।

(ঙ) ছোট ছোট পরদাগুলি খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং বড় পরদাগুলি গুটাইয়া রাখিতে হইবে।

(২) **পরিষ্কারকরণ** : (ক) যদি ঘরে ফায়ার প্লেস (fire place) থাকে তাহা হইলে সর্বপ্রথম সেইটি পরিষ্কার করিতে হইবে।

(খ) অতঃপর ঘরের ঝুল ঝাড়িতে হইবে।

(গ) পরে ঘরের দেওয়াল, কোণ, ছবির পিছন, বড় আয়নার পিছন প্রভৃতি ঝাড়িতে হইবে ; তারপর জানালা, দরজা, ছবির ফ্রেম, ঘরের আলমারির মাথা প্রভৃতি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

(ঘ) সর্বশেষে ঘরের মেঝের ধূলা পরিষ্কার করিতে হইবে।

(ঙ) যেগুলি ঘরের বাহিরে রাখা হইয়াছিল সেগুলিকে ভাল করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। পাপোশ, কম্বল, কুশন প্রভৃতি পিটাইয়া ঝাড়িয়া আনিতে হইবে। যেগুলি পালিশ করা প্রয়োজন সেগুলি পালিশ করিতে হইবে।

(চ) যদি ঘরের মেঝে কাঠের হয় এবং পালিশ করার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে বড় বড় আসবাবগুলি আনিয়া রাখিয়া তবে পালিশ করিতে হইবে, নতুবা ঘরে পায়ের ছাপ পড়িবে।

(৩) **পরিশেষ-ক্রিয়া** (Finishing) : গোটানো পরদাগুলি খুলিয়া দিতে হইবে, জানালার ছোট পরদাগুলি জানালায় টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। আসবাবপত্রগুলি যেখানে যাহা ছিল সেখানে সেইভাবে রাখিয়া দিতে হইবে।

শয়ন-কক্ষের সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—শয়ন-কক্ষের বিছানাপত্রের ক্ষেত্রে সপ্তাহান্তে করণীয় কিছু কাজ থাকে। তোশক বা বিছানাগুলি রৌদ্রে দিবার পর খাটখানি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। গদির চারিপাশ তুলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। গদির নীচে পাতা কম্বল বা সতরঞ্চি বাহির হইতে ঝাড়িয়া লইয়া আসিতে হয়। তারপর বিছানা পাতিয়া, তাহার উপর একটি কাগজ বিছাইয়া, শয়ন-কক্ষের ছোট-খাটো জিনিসগুলি ঐ কাগজের উপর রাখিয়া বড় বিছানার চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। ঘরের বাকী জিনিসগুলি অন্যান্য ঘরের মতো করিয়াই পরিষ্কার করিতে হয়। সাপ্তাহিক পরিষ্কারের সময় যত নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হইবে বৎসরান্তে পরিষ্কার করিবার সময় পরিশ্রমের ততই লাঘব হইবে।

বাৎসরিক পরিষ্কার বা ঋতুর পরিষ্কার

(Spring Cleaning)

শীতের শেষ ও বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করিয়া ঘরদোর সাজানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। ইহাকে বসন্তকালীন পরিষ্কার করা বলা হয়। ১৫ দিনের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিয়া লইলে অযথা শ্রম ও সময়ের অপচয় হয় না এবং গৃহিণীদেরও দুশ্চিন্তা অনেক কমে।

বসন্তকালীন পরিষ্কারের কাজগুলি ঠিক শীতের শেষে ও গ্রীষ্মের আরম্ভের পূর্বে করিয়া ফেলিতে হয়। তিনটি স্তরে কাজগুলি ভাগ করিয়া লইলে সুবিধা হয়, যথা—(১) প্রস্তুতিকরণ, (২) পরিষ্করণ এবং (৩) পরিশেষ ক্রিয়া।

(১) **প্রস্তুতিকরণ ঃ** (ক) বাড়ীর ও আসবাবপত্রের কোনরূপ পরিবর্তন বা রদবদল করিবার জন্য যদি কোন কারিগরের বা মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পূর্ব হইতেই তাহাদের খবর দিতে হয় বা ব্যবস্থা করিতে হয়। ঝাড়ামোছা প্রভৃতির জন্য যদি কোন সাহায্যকারিণীর বা লোকের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থাও পূর্ব হইতে করিতে হয়। তারপর কোন্ ড্রয়ারে বা কোন্ আলমারিতে কী জিনিস আছে তাহার একটি তালিকাও প্রস্তুত করিতে হয়।

(খ) অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাতিল করিয়া দিতে হয়। যেগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে সেগুলি এমনভাবে এক জায়গায় জড়ো করিতে হয় যে তাহা যেন পরিষ্কারের সময় সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালীন পোশাকগুলি এক জায়গায় রাখিতে হয়। রঙ-চটা পরদা ও অন্যান্য জিনিসগুলি রং করিবার জন্য আলাদা রাখিতে হয়। শিশি-বোতল, জার প্রভৃতি হইতে জিনিসপত্র ঢালিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ও লেবেল লাগাইবার জন্য আলাদা করিয়া জড়ো করিতে হয়। যে সমস্ত ঘর্ষক পদার্থ পালিশ পরিষ্কার করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে সেগুলি হয় বাড়ীতে প্রস্তুত করিতে হয়, অথবা বাজার হইতে কিনিয়া আনিতে হয়। প্রত্যেকটি ছবি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় যে উহাদের পিছনের পিসবোর্ড বদল করার প্রয়োজন কিনা। মাঝে মাঝে সমস্ত বই বাহির করিয়া ছেঁড়াগুলি বাছিয়া ফেলিতে হয়। বই-এর সেলফগুলির সংস্কার, পরিষ্করণ ও পালিশের ব্যবস্থা করিতে হয়।

(গ) শীতের সমস্ত পোশাক, কম্বল প্রভৃতি কাচিয়া, কীটনাশক পদার্থ দিয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়; বিছানার চাদর, কম্বল, বেডকভার প্রভৃতি কাচিয়া ফেলিতে হয়। যদি কোন জিনিস মেরামত করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে হয় উহা বাড়ীতে করিতে হয় অথবা কারখানায় পাঠাইতে হয়।

গ্যাস-স্টোভের বারনারগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত বাড়ীটিকে একসঙ্গে পরিষ্কার করিবার পরিকল্পনা করিতে নাই। এক-একটি অংশ পৃথক পৃথক ভাবে পরিষ্কার করিতে হয়। তাহা হইলে খাওয়া ও বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়। যে সমস্ত লোক কাজ করিতে আসিবে তাহাদের কাজের জোগাড় পূর্বাহ্ণেই করিয়া রাখিতে হয়, এবং যতদূর সম্ভব সকালেই কাজ আরম্ভ করিতে হয়। কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করিলে সুবিধা হয় তাহার একটি ছক মনে মনে ঠিক করিয়া লইতে হয়। যেমন—

প্রথমে ধোঁয়া বাহির হইবার চিমনিগুলি পরিষ্কার করিতে হয়। অতঃপর সমস্ত ছোট বা বড় জিনিস শ্রেণীবদ্ধভাবে আলাদা করিয়া রাখিতে হয় কিংবা ঢাকা দিতে হয়। ছোটগুলি ঘরের বাহিরে লইতে হয়। বড় আসবাবগুলি ঘরের মাঝখানে রাখিয়া ঢাকা দিতে হয়। ইহার পর সিঁড়ির কার্পেট তুলিয়া ফেলিতে হয়। সিলিং হইতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াল, ছাদ, জানালা, দরজা প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার পর সর্বশেষে মেঝে পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর মেঝের পালিশ প্রভৃতির কাজ করিতে হয় এবং পরে ঘরের লাগোয়া বারান্দা, সিঁড়ি, হল, রান্নাঘর, পড়ার ঘর, বৈঠকখানাঘর (outhouse) প্রভৃতি পর পর পরিষ্কার করিতে হয়।

পরিষ্করণ—সাপ্তাহিক পরিষ্কারের মতোই একই পদ্ধতিতে বসন্তকালীন পরিষ্কারও করিতে হইবে। কেবল দেওয়ালে ডিসটেম্পার বা কলি অথবা ওয়ালপেপার নতুন করিয়া লাগাইতে হইবে। ছবির দড়ি বদলাইয়া, কাঁচ ও ফ্রেম পালিশ করিতে হইবে। যদি আসবাবপত্রের ফ্রেমগুলি গিল্‌টি-করা (gilded) হয় তাহা হইলে পিঁয়াজের জল দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। (১টি পিঁয়াজ ১ পাঁইট জলে ফুটাইয়া জলটি ছাঁকিয়া লইতে হয়।) প্রত্যেকটি ছবির পিছনে নতুন কাগজ দিতে হইবে যাহাতে ড্যাম্প বা পোকা না লাগে। আসবাবপত্র পালিশ করিতে এবং জানালা-দরজায় রং দিতে হইবে। ময়লা পরদা ও অন্যান্য ঢাকনাগুলি বদলাইতে হইবে।

পরিশেষ-ক্রিয়া—প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্রগুলি নূতন করিয়া সাজাইতে হইবে। অর্থাৎ আগের বৎসরে যেভাবে সাজানো ছিল পরিষ্কার করার সময় তাহার কিছু পরিবর্তন করিলে দেখিতে ভাল লাগে। পরদাগুলি এবং টেবিলক্লথগুলি বদলাইয়া দিলে বা আসবাবপত্রের ও জানালা-দরজার রং পরিবর্তন করিলে কিছুটা নূতনত্ব আসে। সারা বছর একই জিনিস এক ভাবে দেখিতে দেখিতে গৃহ-পরিবেশ বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। বাৎসরিক পরিষ্করণের সময় তাই যতদূর সম্ভব একঘেয়েমি দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হয়।

গৃহের বিভিন্ন তৈজসাদি ও জিনিস-পত্র পরিষ্কার করা
(Cleaning of Household Equipments)

বিভিন্ন ধাতুর বাসন-পত্র পরিষ্কার করা ও পালিশ করা

যে কোন ধাতব পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত ব্যবহার্য জিনিসগুলি পরিষ্কার করিবার সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে—(১) সাধারণ তেল-ময়লা গরম সাবানজল দিয়া ঘষিয়া তুলিলেই পরিষ্কার হয়। (২) পোড়া কালি যাহা পাত্রে বসিয়া গিয়াছে তাহা উঠাইবার জন্য উগ্র ক্ষারপদার্থ এবং ঘর্ষক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। (৩) এমন কোন ঘর্ষক ব্যবহার করিতে নাই যাহাতে পাত্রের উপরে আঁচড় পড়ে অথবা এনামেল নষ্ট হয়। (৪) একমাত্র লৌহ এবং স্টীলের বাসনে প্যারাফিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রণালী ঃ (১) পাত্রটি প্রথমে ভিজাইয়া দিতে হয়। (২) পাত্রের গাত্রে কোন প্রকার কারুকার্য বা নকশা থাকিলে উহা যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য যত্ন লওয়া উচিত। (৩) কলঙ্ক উঠাইতে হয়। (৪) তাহার পর আলগা তেল-ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। (৫) পোড়াকালি বা দৃঢ়ভাবে বসিয়া যাওয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। (৬) শেষে পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়। (৭) প্রয়োজন হইলে পালিশ করিতে হয়।

প্রস্তুতি ঃ বিভিন্ন ধাতুর বাসন পরিষ্কার করিবার পূর্বে উহাদের আলাদা করিয়া লওয়া উচিত। যেমন—(১) সাদা ধাতু—রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, ইলেকট্রোপ্লেটিং করা বাসন, স্টেনলেস্ স্টীল। (২) হলুদ ধাতু—কাঁসা, পিতল,

ইত্যাদি। (৩) লাল ধাতু—তাম্র। (৪) কালোধাতু—লৌহ। ইহা ভিন্ন কাঁচ, চীনামাটি এবং কাঠের বাসনও পরিষ্কার করা হয়।

পরিষ্করণ ঃ (১) রূপার বাসন—কাঁটা, চামচ, ছুরি এবং চায়ের বাসন রূপার হইতে পারে। ধনী-গৃহে উৎসবাদিতে অনেক ক্ষেত্রে খাওয়ার জন্যও রূপার বাসন ব্যবহৃত হয়। খাওয়ার পর প্রথমেই গরম জলে বাসনগুলি ভিজাইয়া দিতে হয়। রূপার পাত্রে ডিম খাইলে উহাতে ডিম লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। ডিমে গন্ধক আছে। তাই অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে রূপার পাত্রে কালো দাগ হয়। লবণ-জলে ডিমের দাগ উঠিয়া যায়। যে কোন প্রাণিজ দাগই লবণ-জলে উঠিয়া যায়, তাই লবণ-জলে রূপার পাত্র ভিজাইয়া রাখা নিরাপদ। তারপর বাসনগুলি সোডা-সাবানের জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। কাঁটা, ছুরি, চামচ ইত্যাদিও গরম সাবান-জলে ধুইলে পরিষ্কার হইয়া যায়। চায়ের বাসনগুলি কিন্তু উগ্র সোডার দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তবেই চায়ের ট্যানিনের দাগ উঠে। তারপর গরম জল ও মোটা কাপড়ের টুকরা দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। বাসনগুলি পরিষ্কার করা হইলে শ্যাময় লেদার দ্বারা ঘষিয়া ঔজ্জ্বল্য পুনরুদ্ধার করা উচিত। শ্যাময় লেদার ছাড়া হোয়াইটিং-এর সাহায্যেও পালিশ করা যায়।

হোয়াইটিং-এর পালিশ—হোয়াইটিং প্রথমে জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। তারপর উহাতে অ্যামোনিয়া অথবা মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া পালিশ প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ লেই (পেস্ট) পাত্রের গায়ে তুলা বা ছেঁড়া কাপড় দিয়া লাগাইয়া লইতে হয়। শুকাইয়া গেলে নরম কাপড় দ্বারা ঘষিয়া পালিশ করিতে হয়। কারুকার্য-করা বাসনের ক্ষেত্রে বুরুশ দিয়া ঘষা বাঞ্ছনীয়।

সিলভো নামক একপ্রকার রূপা-পালিশ বাজারে বিক্রয় হয়। ইহার সাহায্যেও রূপার বাসন পরিষ্কার করা যায়।

অ্যালুমিনিয়াম—অ্যালুমিনিয়ামের বাসন পরিষ্করণের জন্য সোডা ব্যবহার করিতে নাই। প্রথমে ভিনিগার বা লেবুর জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হয়। তারপর অত্যন্ত মিহি ঘর্ষক পদার্থ দিয়া ঘষিয়া মাজিতে হয়। অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত নরম ধাতু। তাই সহজেই আঁচড় পড়িয়া যাইবার

সম্ভাবনা থাকে। পোড়া বাসন না হইলে গরম সাবান-জল ও মোটা কাপড় দিয়া ঘষিলেই পরিষ্কার হয়। মুছিয়া মিহি গুঁড়া হোয়াইটিং এবং স্টীল-উল দিয়া ঘষিয়া পালিশ করিতে হয়। স্টীল-উল হইল অত্যন্ত নরম একপ্রকার ধাতব আঁশ। যে সকল পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রাখা হয় তাহার ভিতরের অংশ পালিশ করিতে নাই বা করিলেও গরম জলে ধুইয়া মুছিয়া রাখিতে হয়।

স্টেনলেস স্টীল—রূপার বাসনের মতোই পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা যথেষ্ট কঠিন,তাই ইহাতে ঘর্ষক দ্রব্য এবং ভিম-পাউডার ব্যবহার করা যাইতে পারে। পালিশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মাজার পর শুকনা খবরের কাগজ বা কাপড় ও সামান্য পাউডার দিয়া ঘষিলেই পালিশ হইয়া যায়।

ক্রোমিয়াম বা ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং করা বাসন রূপার মতো পরিষ্কার করিতে হয়। হোয়াইটিং দিয়া পালিশ করা হয়।

পিতল—প্রথমে গরম জলে বা মৃদু অম্ল-জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর তেঁতুল বা লেবু বা যে কোন টক পদার্থ মাখাইয়া ঘষিতে হয়। ঘষিবার জন্য মিহি ইটের গুঁড়া, ছাই বা মাটি ব্যবহার করা যায়। পোড়া থাকিলে ভিমও ব্যবহার করা যাইতে পারে। শালপাতা, ঘাস, খড় অথবা মোটা কাপড়ের টুকরা দিয়া ঘষিতে পারিলে সুবিধা হয়। তারপর পরিষ্কার জলে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। ফুলদানি, ছাইদানি বা ঐরূপ কোন কারুকার্যখচিত পিতলের জিনিস প্রথমে অম্ল পদার্থ দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। ব্রাসো কাপড়ের টুকরার সাহায্যে পাত্রের গায়ে লাগাইয়া শুকনা কাপড় দিয়া ঘষিতে পারিলে পিতলের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসে এবং চমৎকার পালিশ হয়।

কাঁসা—কাঁসা পিতলের মতোই পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর শ্যাময় লেদার বা শুষ্ক কাপড় দিয়া ঘষিয়া মুছিলেই পালিশ ভাল হয়। সামান্য হোয়াইটিং দিয়া ঘষিতে পারিলে পালিশ আরও ভাল হয়।

তামা—তামার বাসনের কলঙ্ক প্রথমে তেঁতুল-জল দিয়া ঘষিয়া তুলিতে হয়। তারপর পিতল ও কাঁসার মতো করিয়াই ইহা পরিষ্কার করিয়া মাজিতে হয় এবং মাজার পরই ভালভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

কারুকার্য-করা তামার সজ্জাদ্রব্য পরিষ্কার করিবার জন্য মিহি ইঁটের গুঁড়া এবং প্যারাফিন অথবা মিহি নরম পাথরের গুঁড়া এবং সুইট অয়েল

সাবান জলের পরিবর্তে প্যারাফিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরে ভাল-ভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয়। তবে কখনও জল সমেত ফেলিয়া রাখিতে নাই। উহার গায়ে জল লাগিয়া থাকিলে বাতাসের অক্সিজেনের সহিত জিঙ্ক-এর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া জিঙ্ক অকসাইড প্রস্তুত হয়। অবশ্য উহা দুর্ভেদ্য আবরণের কাজ করে। পরে আর ধাতুটি অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

কাঠের বাসনপত্র—চাকি, বেলুন, নুনের কেঠো, ডালের কাঁটা, বঁটি, কাটারির বাঁট প্রভৃতি কাঠের হয়। এইগুলি পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে গরম জলে অল্পক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ময়লা আলগা হইয়া যায়। তাহার পর গরম সাবান-জল দিয়া মোটা কাপড় অথবা শালপাতা বা ফাইবারের ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। সর্বশেষে জলে ধুইয়া মুছিয়া সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়।

কাঁচ ও চীনামাটির বাসনপত্র—কাঁচ ও চীনামাটির বাসন পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি প্রায়ই একই রূপ।

(১) কাঁচের বাসনগুলি কাঠ বা প্লাস্টিকের গামলায় ভিজাইয়া দিতে হয়। পরে একটুকরা নরম কাপড় এবং সোডা-সাবানের জল দিয়া রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু যে সকল চীনামাটির বাসনে গিলটি করা থাকে বা রঙিন ফুলপাতার নকশা থাকে অথবা সোনালী কারুকার্য থাকে সেইগুলিতে ঘন সোডার জল ব্যবহার না করাই ভাল।

(২) ধুইবার পূর্বে ময়লা অনুযায়ী বাসনগুলিকে ভাগ করিয়া লইতে হয়। প্রথমে অল্প অপরিষ্কার বাসন, তারপর বেশী অপরিষ্কার বাসনগুলি ধুইতে হয়।

(৩) যে সকল স্থানে ময়লা অধিক জমিয়া থাকার সম্ভাবনা সেই স্থানগুলি বিশেষভাবে নজর দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। যেমন—চায়ের কেটলির বা টিপটের নল, টিপটের সংযোগস্থলের খাঁজ, কাপের হাণ্ডেল ও অন্যান্য বাঁকা ও খাঁজকাটা অংশগুলি। প্রয়োজন হইলে ঐ সকল জায়গা ছোট বুরুশের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়।

(৪) শেষ বারের মতো পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হয়। কারণ ইহাতে বাসন অধিক উজ্জ্বল দেখায়। ধোয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়া ফেলিতে হয়।

(৫) তাপসহ করিয়া চীনামাটির রন্ধন-পাত্র প্রস্তুত হয়। তাই আগুনে বসাইলে ইহারা ফাটে না। লবণ এবং মিহি ছাই দিয়া ঘষিলে ইহাদের পোড়া দাগ উঠিয়া যায়। তারপর উপরোক্ত উপায়ে পরিষ্কার করিতে হয়।

(৬) যে সকল কাঁচের বাসন তাপসহ (heat proof) করিয়া তৈয়ারী নহে সেগুলি পরিষ্কার করিবার সময় কখনও ফুটন্ত জল ব্যবহার করিতে নাই ; কারণ ফুটন্ত জল ব্যবহারের ফলে ফাটিয়া যাইতে পারে। মাঝারি গরম জল দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কাঁচ তাপের কুপরিবাহী, তাই উত্তাপ পাইলে উহা অসমভাবে বিস্তার লাভ করে (expansion) এবং ফাটিয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে গরম হইতে থাকিলে সাধারণতঃ ফাটে না।

(৭) ধুইবার পর পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া, নরম লিনেনের টুকরা দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া পালিশ করিতে হয়।

কাঁচের অন্যান্য বাসনের মতোই মাঝারি গরম সোডা-সাবানের জল দিয়া কাঁচের শিশি-বোতল ধুইতে হয়। তবে পরিষ্কার করিবার জন্য সর্বদা নরম বট্‌ল্‌-ব্রাশ ব্যবহার করিতে হয়। শেষ ধোয়াটা কখনও গরম জলে করিতে নাই, তাহা হইলে সাদা অস্বচ্ছ দাগ হয়।

দুধ খাওয়াইবার বোতল (feeding bottle) ধুইবার পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ ঈষদুষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখা প্রয়োজন। অতিরিক্ত গরম জলে ভিজাইলে বোতলের গায়ে লাগিয়া থাকা দুধের প্রোটিন অংশ আরো কামড়াইয়া ধরে। ইহার পর গরম সাবান-জলে পূর্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কার করিবার পর ঠাণ্ডা জলে ভিনিগার মিশাইয়া (১০% দ্রবণ) বোতলটি ধুইয়া ফেলিতে হয়। মুছিয়া শুকনা কাপড় দিয়া ঘষিয়া পালিশ করিবার সময় আঙুলের দাগ যেন না পড়ে।

কাঁচের জলপাত্র, গ্লাস এবং ফুলদানি—এই সকল পাত্রে জলের দাগ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তাই প্রথমেই ঐ দাগগুলি তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ভিজা চায়ের পাতা পাত্রগুলির মধ্যে দিয়া, ব্লটিং বা মোটা কাগজ দ্বারা চাপিয়া ঘষিতে হইবে, তাহা হইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। অবশ্য যে সকল পাত্রের মুখ ছোট, হাত ঢুকিবে না—সেইগুলির ক্ষেত্রে মুখটি হাতের চেটো দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে হইবে। তারপর পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পরও যদি পাত্রে জলের দাগ থাকে তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে উহা কঠিন জলের চক বা খনিজ পদার্থের দাগ। তখন যে কোন অম্ল-দ্রবণে পাত্রটি ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। শতকরা দশভাগ ভিনিগারের জলে ভিজাইয়া রাখিলেই দাগ উঠিয়া যায়। ঐ দুই পদ্ধতিতে দাগ না উঠিলে মিহি বালি বা মিহি ছাই দিয়া ঘষিতে হইবে। পরিষ্কার জলে ধুইয়া শেষ বারের মতো শীতল ভিনিগার-দ্রবণে পুনরায় ধুইতে হইবে।

কাঁচের ছিপি যদি আঁটিয়া যায় তাহা হইলে অল্প তেল মাখাইয়া গরম করিলেই খুলিয়া যাইবে। তারপর যথারীতি অন্যান্য কাঁচের বাসনের মতো পরিষ্কার করিতে হইবে।

কাঠের জিনিসপত্র এবং আসবাবাদি পরিষ্কার করা ও যত্ন লওয়া—প্রত্যেক বাড়ীতেই কাঠের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস আছে। তাই এই সকল জিনিসপত্র পরিষ্কার ও পালিশ করিবার সাধারণ কয়েকটি পদ্ধতি সকল মেয়েরই জানিয়া রাখা উচিত।

সাধারণতঃ দুই প্রকার কাঠের জিনিস থাকে—(১) খুব বেশী কারুকার্য বা পালিশ না-করা দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী আসবাব; যেমন—রান্না-ঘরের পিঁড়ি বা টুল, টেবিল, মিটসেফ, তাক, কাঠের মেঝে প্রভৃতি। (২) কারুকার্য-করা বা উজ্জ্বল পালিশ-করা আসবাবপত্র। দুই শ্রেণীর জিনিসের জন্য দুইরকম পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তবে কতকগুলি সাধারণ সাবধানতা উভয় ক্ষেত্রেই অবলম্বন করিতে হয়; যেমন—(১) অতিরিক্ত গরম জল বা কড়া (hard) বুরুশ ব্যবহার করিতে নাই, তাহা হইলে কাঠের উপরিভাগ খসখসে হইয়া যায়। (২) খুব বেশী ক্ষার ও উত্তপ্ত জল দিয়া ধুইলে রং ও পালিশ দুইই উঠিয়া যাইতে পারে, তাই এরূপ করা উচিত নহে। (৩) রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে, জলে অনেকক্ষণ ভিজাইলে বা বহুক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত গরম জল ঢালিলে কাঠ সংকুচিত হইয়া ফাটিয়া যায়। এই জন্য কাঠের কোন চৌকি বা তক্তাপোশ অথবা বেঞ্চি বা যে কোন বড়-ছোট আসবাব বাহিরে রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। পরিষ্কার করিবার সময়ও বেশী গরম জল ঢালিতে নাই। (৪) বার্নিশ করা কাঠ শীতল জলে ধুইতে হয়।

সাদাসিধা কাঠের আসবাব পরিষ্কারের নিয়ম—(১) প্রথমে একটি শুকনা ঝাড়ন দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। (২) তেলের সহিত বা অন্য কোন জলীয় পদার্থের সহিত যখন ধুলা চিট হইয়া বসিয়া যায় তখন ভোঁতা ছুরি বা ঐ ধরনের কোন জিনিস দিয়া চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। বিশেষ ভাবে রান্নাঘরের আসবাবপত্র এইরূপে পরিষ্কার করা হয়। (৩) গরম সাবান-জলের মধ্যে মোটা খসখসে ঝাড়ন ভিজাইয়া এক-একটি করিয়া কাঠের আসবাবগুলি ধুইতে হয়। শক্ত কাঠের আসবাবগুলিতে ঝাড়নের পরিবর্তে ফাইবারের বুরুশ বা নারিকেল ছোবড়া ব্যবহার করা যায়। বড় বড় আসবাবের ক্ষেত্রে এক-একটি অংশ ধুইয়া শুকাইতে দিয়া, তারপর অপর অংশ ধুইতে হয়। এক সঙ্গে সমস্তটা ভিজাইতে নাই। (৪) সব শেষে পালিশ করিতে হয়।

সাদাসিধা কাঠের আসবাব ও অন্যান্য জিনিস পালিশ করিবার নিয়ম—কাঠের জিনিস, যেমন—জানালা, দরজা প্রভৃতিতে রং বা পালিশ দেওয়া থাকে, আবার হয়ত কিছুই দেওয়া থাকে না। যেটিতে যেমন প্রয়োজন তাহাতে সেইভাবে রঙ বা পালিশ লাগাইতে হয়।

রং-লাগানো কাঠগুলিকে পুনরায় রং করিতে হইলে তিসির তৈলে জানালা-দরজার রং গুলিয়া পুরাতন কাপড়ের টুকরার সাহায্যে লাগানো যায়। ইহা বৎসরে একবার করিলেই যথেষ্ট। ইহা ভিন্ন নিয়মিত পরিষ্কারের পর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা তিসির তৈলে ভিজাইয়া রং-করা কাঠগুলি ঘষিয়া দিলে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বার্নিশ করা কাঠগুলিতে বাজার হইতে বার্নিশ আনাইয়া এক পোঁছ লাগাইয়া দেওয়া যায়। বার্নিশ করা না থাকিলে বাড়ীতে তিসির তৈল (লিনসিড অয়েল) দুই ভাগ, তার্পিন তৈল এক ভাগ এবং স্পিরিট এক ভাগ দিয়া পালিশ তৈয়ারী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অল্প একটু তুলা বা কাপড় দিয়া আসবাবটিতে মাখাইয়া ঘষিয়া পালিশ তুলিতে হয়।

কারুকার্যময় উজ্জ্বল পালিশযুক্ত আসবাব পরিষ্কারের নিয়ম—এই সকল আসবাবপত্রে গরম জল, সাবান বা কোন ঘর্ষক ব্যবহার করিতে নাই। ঐসব ব্যবহার করিলে পালিশ নষ্ট হইয়া যায়। অতিরিক্ত অপরিষ্কার হইলে জলের সাহায্যে সাবধানে পরিষ্কার করিতে

হয়। (১) প্রথমে একটি পরিষ্কার ঝাড়ন দিয়া সমস্ত ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। (২) দুইটি গামলার একটিতে ঈষদুষ্ণ বা শীতল ও মৃদু সাবান জল ও আর একটিতে পরিষ্কার শীতল জল লইতে হয়। একটু নরম চামড়া বা পুরাতন পাতলা কাপড়ের টুকরা সাবান জলে ভিজাইয়া অল্প জায়গা পরিষ্কার করিতে হয় এবং তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জলে ঝাড়ন ভিজাইয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে হয়। পরিষ্কার জলের গামলায় ভিনিগার মিশাইলে ভাল হয়। এক পাঁইট জলে দুই টেবিল-চামচ ভিনিগার—এই হিসাবে ভিনিগার মিশাইলে আসবাবটির ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। (৩) তারপর এক টুকরা শুকনা নরম কাপড় দিয়া সমস্ত জল মুছিয়া, আর এক টুকরা শুকনা কাপড় দিয়া খানিকক্ষণ ঘষিতে পারিলে বেশ পালিশ উঠে। (৪) ইহা ভিন্ন আসবাবপত্র পালিশ করিবার জন্য ফার্নিচার ক্রিম ব্যবহার করা যাইতে পারে। অল্প পরিমাণ ফার্নিচার ক্রিম মাখাইয়া খুব হালকা হাতে ঘষিয়া উহা আসবাবের গায়ে শুকাইয়া ফেলিতে হয়। আসবাবে উহা শীঘ্র সম্পূর্ণ শুষিয়া না গেলে, উহাতে ধূলা আটকাইয়া চিট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

আসবাবপত্র পালিশ করা—যখন আসবাবপত্রের পালিশ নষ্ট হইয়া যায় তখন পুরাতন পালিশ ধুইয়া নূতন পালিশ করিতে হয়। পালিশ করিবার সময়—(১) প্রথমে সোডা-সাবানের ঈষদুষ্ণ জল দিয়া ধুইয়া পুরাতন পালিশ তুলিয়া ফেলিতে হয়। (২) তারপর আসবাবটি শুকাইলে এক নম্বর শিরিষ কাগজ দিয়া ঘষিয়া উহা মসৃণ করিতে হয়। (৩) এক-একটি অংশে পালিশ লাগাইয়া তুলা বা পুরাতন কাপড়ের টুকরা দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া পালিশ তুলিতে হয়। কাঠের পালিশ নানারূপ হইতে পারে। তাহার মধ্যে কয়েকটি বাড়ীতেও প্রস্তুত করা যায়, যেমন—চাঁচগালা স্পিরিটে ভিজাইয়া উহার সহিত কিছু মৌ-এর মোম ও সামান্য রঞ্জক পদার্থ মিশাইয়া পালিশ প্রস্তুত হয়। তার্পিন তেল, লিনসিড অয়েল ও স্পিরিট দিয়াও পাতলা একপ্রকার পালিশ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তবে প্রথমটির দ্বারাই পালিশ ভাল হয়।

ঘর-সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র পরিষ্কার করা

জানালার বা শার্সির কাঁচ পরিষ্কারের নিয়ম—কুয়াশার দিনে ভিজা অবস্থায় জানালার কাঁচ পরিষ্কার করিতে নাই। কারণ তখন কাঁচগুলি ভঙ্গুর হইয়া থাকে। একটু অসাবধান হইলেই উহা ভাঙিয়া যাইতে পারে। আবার অতিরিক্ত রৌদ্র যখন কাঁচের উপর পড়িতেছে তখনও পরিষ্কার করিতে নাই, জলের ছোপ পড়িয়া যায়। এ ছাড়া অন্য সময় জানালা পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

পরিষ্কার করিবার সময়—(১) প্রথমেই পরদা সরাইয়া দিতে হইবে। (২) তারপর খড়খড়ি থাকিলে খুলিয়া দিতে হইবে। (৩) জানালার নিকটবর্তী দেওয়াল ও মেঝে ঢাকিয়া দিতে হইবে। (৪) এইবার শুকনা ঝাড়ন বা ব্রাশের সাহায্যে জানালার প্রত্যেকটি অংশ উপর হইতে নীচে পর্যন্ত ঝাড়িতে হইবে। (৫) ঠাণ্ডা জলে ঝাড়ন ভিজাইয়া জানালার ফ্রেম, গরাদ বা গ্রিল এবং খড়খড়িগুলি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার পর জানালার কাঁচে যদি কোন দাগ থাকে তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে। অবশ্য প্রথমে জানালার কাঁচের ভিতরের অংশ এবং পরে বাহিরের অংশ পরিষ্কার করিতে হইবে। জানালার কাঁচে মাছি বসার দাগ বা রং-এর দাগ হয়। তার্পিন তৈল বা তিসির তৈল দিয়া ঘষিলেই ঐ সমস্ত দাগ উঠিয়া যায়। তারপর খবরের কাগজ জলে ভিজাইয়া কাঁচগুলি মুছিতে হইবে। অথবা চুন পাতলা করিয়া গুলিয়া প্রথমে লাগাইয়া দিতে হইবে। তারপর শুকাইলে সামান্য-ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

আয়না ও ছবির কাঁচ—আয়না বা ছবির কাঁচের পিছনের দিকে জল ঢুকিলে আয়না ও ছবি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। তাই ভিজা কাপড় ভাল করিয়া নিংড়াইয়া মুছিয়া লইতে হয়। পরে শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কয়েক ফোঁটা মেথিলেটেড স্পিরিট টুকরা কাপড় বা টিস্যু কাগজে লাগাইয়া কাঁচে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়। তবে আগে ফ্রেমটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, পরে কাঁচটি পরিষ্কার করিতে হয়।

মোজেইকের ও পাথরের মেঝে—পাথরের মেঝেতে অম্লজাতীয় পদার্থ প'ড়লে পালিশ নষ্ট হইয়া যায়। তাই মেঝেটি গরম সাবান-জল দিয়া ভালো করিয়া ঘষিয়া নরম বুরুশের সাহায্যে খাঁজের ময়লা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। ফার্নিচার ক্রীম দিয়া ঘষিলে বেশ ভাল পালিশ হয়। যে সব মার্বেল নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেগুলি একরাত্রি মার্বেল মিক্সচারের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া পরের দিন পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

দাগ—যতক্ষণ পাথরে পালিশ থাকে ততক্ষণ কোনো দাগ পড়ে না। পালিশ উঠিয়া গেলে মরিচা বা ঔষধের দাগ পড়িতে পারে। সামান্য লেবুর রস দিয়া ঐ ধরনের দাগ তুলিয়া ফেলিতে হয়। নতুবা মার্বেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চর্বির দাগ—চর্বির দাগ পড়িলে পালিশ নষ্ট হইয়া যায়। ফুলার্স আর্থ (fullers earth) সারারাত্রি লাগাইয়া রাখিয়া পরের দিন ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়। ফ্রেঞ্চ চকের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলেও কাজ হইতে পারে।

সাধারণ পাথর বা সিমেন্টের মেঝে—সাধারণ পাথরের মেঝে, সিমেন্টের মেঝে প্রভৃতি সাবান-সোডার সাহায্যে কোন শক্ত ঘর্ষক পদার্থের দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

সিঙ্ক (Sink)—প্রতিদিন সিঙ্ক (sink) পরিষ্কার করা প্রয়োজন। সিঙ্ক-এর মধ্যে যাহা কিছু থাকে প্রথমে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া, গরম জল দিয়া সাবান অথবা ভিম-পাউডারের সাহায্যে ঘষিয়া, পরে পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

কলের মুখ ও সিঙ্ক-এর পাইপ প্রভৃতি—কলের মুখ ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করিতে হয়। যদি সিঙ্ক-এর কলের মুখে তেল ধরে তাহা হইলে গরম জল, সোডা, সাবান, ও মৃদু ঘর্ষক দ্রব্য ব্যবহার করা চলে। অতিরিক্ত তেল ধরিলে সাবানের পরিবর্তে প্যারাফিনে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। সিঙ্ক-এর পাইপটির ভিতর যে ময়লা জমিয়া থাকে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য কেটলি করিয়া গরম জল কল ও ঝাঝরির মুখে ঢালিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহ অন্তর ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড ২০ ভাগ জলে মিশাইয়া পাইপের ভিতর পরিষ্কার করিতে হয়।

যদি চা-এর পাতা বা শক্ত কোন চর্বির টুকরা প্রভৃতির দ্বারা পাইপের মুখ বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে পাইপটি খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

পায়খানার প্যান—প্রতিদিন শক্ত ফাইবারের ব্রাশের (lavatory brush) সাহায্যে প্রচুর জল দিয়া পরিষ্কার করা উচিত। সপ্তাহে একদিন করিয়া সোডার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়।

চামড়া-ঢাকা সোফা-সেট পরিষ্কার করা—যে সব আসবাব চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে তাহাতে যেন ধুলা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে furniture cream দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। পালিশে তেল এবং মোম থাকার জন্য চামড়া মসৃণ হইবে এবং ফাটিবে না। চামড়া পরিষ্কার করিতে হইলে ভিজা কাপড়ের টুকরা দিয়া প্রথমে মুছিয়া, চা-এর চামচের দুই চামচ লিনসিড অয়েলের সহিত এক চামচ ভিনিগার মিশাইয়া একটুকরা কাপড়ে করিয়া চামড়ায় ঘসিয়া লাগাইতে হইবে।

কয়লার উনান পরিষ্কার করা—রান্নাঘর পরিষ্কার করিবার পূর্বে উনানের ছাই পরিষ্কার করিতে হয়। উনান ঝাড়িবার সময় অন্যান্য জিনিসপত্র চাপা দিয়া রাখিতে হয়। উনানের বাহিরের ও ভিতরের অংশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হয়। তেলের ছিটা ও খাবারের টুকরা পরিষ্কার করিবার জন্য গোবর-মাটি দিয়া লেপিয়া দিতে হয়।

গ্যাস-স্টোভ—প্রতিদিন তেল-ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। চকচকে অংশগুলি প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হয়। স্টোভের সমস্ত আলগা অংশ খুলিয়া ফেলিয়া, পুরাতন খবরের কাগজের সাহায্যে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। বোনার কাঁটা দিয়া 'বারনার'-এর (burner) গর্তগুলি পরিষ্কার করিতে পারিলে ভাল হয়। স্টোভের ভিতরের অংশ ভাল করিয়া ঘষিয়া জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। বাহিরের অংশ বুট পালিশ বা মেঝে পালিশ দিয়া ঘষিলে পরিষ্কার হয়। যদি নিকেলের বা ক্রোমিয়ামের এনামেল করা থাকে তাহা হইলে শুকনা কাপড় দিয়া ঘষিলেই পরিষ্কার হইবে।

ইলেকট্রিক স্টোভ—ইলেকট্রিক স্টোভের উপরের অংশ স্টীলের কিংবা নিকেলের হয়। কাজেই সামান্য ভিজা কাপড় দিয়া মুছিলেই পরিষ্কার

হইয়া যায়। মাঝে মাঝে whiting দিয়া পালিশ করিতে হয়। স্টোভের ভিতর এবং বাহির উভয় অংশই পরিষ্কার করিতে হয় এবং রন্ধনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে ভিতরে জল না ঢোকে।

তেলের স্টোভ—স্টোভগুলি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তেল-ময়লা মুক্ত করিয়া রাখা উচিত। বাহিরের অংশ প্রথমে ভিজা ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া, পরে শুকনা ন্যাকড়া দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। স্টোভের পলতে উঠাইয়া পোড়া অংশ ভাঙিয়া বা কাটিয়া ফেলিতে হয়।

সুগৃহিণীর গুণাবলী

গৃহের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে গৃহিণীর সুপরিচালনার উপর। তাই সুপরিচালিকার সকল গুণ গৃহিণীর থাকা প্রয়োজন। সুপরিচালিকার মুখ্য গুণগুলি হইতেছে—

(ক) **দায়িত্বশীলতা**ঃ পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর সাফল্য নির্ভর করে সুপরিচালনার উপর। তাই গৃহিণীর দায়িত্ব অনেক। তিনি যদি সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন তবে ঐ গুরু দায়িত্ব পালন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

(খ) **বুদ্ধিমত্তা**ঃ নির্বোধ মানুষ কোন কাজই সঠিকভাবে করিতে পারে না। অতি সাধারণ সামান্য কাজের জন্যও বুদ্ধির প্রয়োজন। গৃহ পরিচালনার মতো জটিল কাজ কোন বুদ্ধিহীনের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধিমতী গৃহিণী পারিবারিক জীবনের বহু সমস্যার সুকৌশলে সমাধান করেন। তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন গৃহিণীই তাই পরিবারের সার্থক কর্ণধার হইতে পারেন।

(গ) **সহানুভূতি**ঃ স্নেহ এবং সহানুভূতি দ্বারাই অন্যের হৃদয় সহজে জয় করা যায়। গৃহিণী যদি সহানুভূতিশীল হন তাহা হইলে সহজেই সকলের মন জয় করিতে পারেন। সকলেই তাঁহার অনুগত হয় এবং তাঁহার সহিত সহযোগিতা করে। তখন তাঁহার পক্ষে সংসার চালনা করা অনেক সহজ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া যে সংসারে বা গৃহে স্নেহ এবং সহানুভূতি নাই সে-সংসার বা গৃহ মরুভূমি তুল্য। স্নেহের অভাব হইলে সংসারের সব কিছুই যেন ব্যর্থ ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) **উদারতা ঃ** বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও গৃহিণী যদি নিঃস্বার্থ এবং উদার মনোভাবাপন্ন না হন তাহা হইলে গৃহ পরিচালনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। স্বার্থপর মানুষকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। গৃহিণীর নীচতা এবং স্বার্থপরতা সংসারে প্রথমে অসন্তোষ এবং পরে অশান্তির সৃষ্টি করে। কেহ তাঁহাকে মানিতে চাহে না। তখন সুষ্ঠুভাবে পরিবার পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(ঙ) **গণতান্ত্রিক দৃষ্টি ঃ** গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গৃহ পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। গৃহিণী যদি গৃহ পরিচালনার সময় সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে সকলেই খুশী হয় এবং সকলেই তাঁহার সহিত সহযোগিতা করে। ইহার ফলে যে কেবল গৃহ পরিচালনাই সহজ হয় তাহা নয়, গৃহিণীকে ভুল বুঝিবার কোন অবকাশ থাকে না এবং তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কোন অভিযোগের কারণও থাকে না।

(চ) **কর্মদক্ষতা ঃ** গৃহিণী নিষ্ক্রিয় উপদেষ্টা নহেন। পরিবারের তিনি সক্রিয় পরিচালিকা। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন সকল প্রকার গৃহকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনা সম্ভব নহে। সকলেই তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ আশা করে। কিন্তু বাস্তবে কাজগুলি কেমন করিয়া সহজে সম্পন্ন করা যায় তাহা হাতে-নাতে দেখাইতে না পারিলে অন্যান্য কর্মীরা কাজগুলি ঠিকমতো করিতে পারে না। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গৃহিণীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া দাস-দাসীও কাজে ফাঁকি দিতে থাকে।

(ছ) **পরিশ্রমী ঃ** অলস গৃহিণী সুপরিচালিকা হইতে পারেন না। অলস গৃহিণীর পক্ষে সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। গৃহের অধিকাংশ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর দিয়া তিনি শুইয়া-বসিয়া, গল্প-গুজবে দিন কাটান। ইহাতে সকল কাজ সুশৃঙ্খলে হয় না—সুযোগ পাইলেই দাস-দাসীগণ কাজে অবহেলা করে বা সময়মতো কাজ করে না। একদিন দাস-দাসী অনুপস্থিত হইলেই গৃহিণী চোখে অন্ধকার দেখেন। অপর পক্ষে পরিশ্রমী গৃহিণীর প্রতিটি কাজ নখদর্পণে থাকে।

(জ) **নেত্রীসুলভ গুণাবলী ঃ** যিনি পরিচালনা করিবেন তাঁহার বিশেষ কতকগুলি গুণ থাকিলে তবেই তিনি নিজপদের উপযুক্ত হইতে পারেন। যেমন—দূরদৃষ্টি, স্থির বুদ্ধি, সমদর্শিতা, অন্যকে উদ্দীপিত করিবার

ক্ষমতা, সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবার ক্ষমতা, কাজ করাইবার ক্ষমতা, বিচারক্ষমতা, প্রফুল্লতা এবং ব্যক্তিত্ব। গৃহিণী পরিবারের নেত্রী। পরিবারের সকল ব্যক্তির উপর তিনি নেতৃত্ব করেন। তাই তাঁহার ঐ গুণগুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

(ঝ) **শিক্ষা ঃ** গৃহিণীর গণিত এবং মাতৃভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকিলে পরিচালনা সহজ হয়। গৃহ পরিচালনা করিতে হইলে হিসাব নিকাশ করিতে হয়, চিঠিপত্র লিখিতে হয়, পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া হয়। গৃহিণী কিছু লেখাপড়া না জানিলে এই সকল কাজে অসুবিধা হয়। প্রতি মুহূর্তে ঠকিবার ভয় থাকে। সামান্য লেখাপড়ার কাজের জন্যও অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সুগৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। যুগের পরিবর্তনে গৃহ-জীবনের পটভূমিতে বহু পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু মূল সুর আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আজও ভারতবর্ষে গৃহিণীই গৃহের স্বরূপ। তাই ভারতীয় গৃহিণীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গৃহিণীর কর্তব্য—গৃহিণীর কর্তব্য গৃহ পরিচালনা করা। এই কর্তব্য পালনের জন্য তিনি গৃহের সম্পদগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিবেন যাহাতে পরিবার-ভুক্ত সকল ব্যক্তির অধিকাংশ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। তিনি পরিবারের সমস্ত সম্পদের হিসাব-নিকাশ লইয়া, তাহা কেমন করিয়া ব্যয় করা যায় তাহার একটা পরিকল্পনা করিবেন। গৃহের সম্পদ হইল অর্থ, সময়, শ্রম, দক্ষতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি। এইগুলির বিনিময়ে মানুষ বিবিধ শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহ করে। গৃহিণী এমনভাবে পরিকল্পনা করিবেন যেন সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার হয়। যেমন—আয় অনুযায়ী ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা বা বাজেট প্রস্তুত করিয়া পরিবারের সমস্ত অর্থ ব্যয়ের সুব্যবস্থা করিবেন। বাজেট করিয়া অর্থ ব্যয় করিলে তবেই পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় খরচগুলি সুষ্ঠুভাবে করা যায়। কাহারও জন্য অধিক, কাহারও জন্য কম খরচ হয় না। তা ছাড়া আয় অনুযায়ী ব্যয় হয়, ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় হয় এবং পরিবারটি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে না। সেই-রূপ গৃহিণী সময় ও শ্রমের সদ্ব্যবহারের জন্য সময়-তালিকা (time

table) প্রস্তুত করিবেন। পূর্ব হইতে সময়-তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইলে সকল কাজ সময়মতো হয়, অল্প সময়ে অধিক কাজ হয়, পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। কাজের তালিকা করিয়া কাজ বণ্টন করিলে গৃহকর্মের দায়িত্ব সকলের উপর ন্যস্ত হয়, কাহারও কোন অভিযোগ থাকে না। এই ভাবে প্রত্যেকটি সম্পদের পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করা গৃহিণীর প্রথম দায়িত্ব।

গৃহিণীর দায়িত্ব হইল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয়ের ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লগ্নী করিবার ব্যবস্থা করা। কর্ম-তালিকা অনুযায়ী কর্ম বণ্টন করা, কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া, কাজের সময় কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া কাজ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনমতো কর্মীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। সময় তালিকা অনুযায়ী সকল কাজ হইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখাও তাঁহার কর্তব্য।

এছাড়া গৃহে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে আদর-যত্নের ব্যবস্থা করা, ব্যাধির আক্রমণ হইলে রোগীর চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করা, হঠাৎ কোন সমস্যা দেখা দিলে সমাধান করা, ইত্যাদি সব কিছুই গৃহিণীর কর্তব্যের ভিতর।

যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার কতটুকু কার্যকরী করা গিয়াছে, কতটা করা যায় নাই, এবং কেন করা যায় নাই বিচার-বিবেচনা করাও গৃহিণীর কর্তব্য। প্রতিটি কাজের মূল্যায়ন করিয়া, তিনি যদি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলেই পরবর্তী পরিকল্পনা অধিকতর নির্ভুল হয়।

গৃহিণী বৃহৎ পরিবারের পরিচালিকা হইলে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্য পান। একা তাঁহাকে সকল কাজ করিতে হয় না। কিন্তু ছোট ও দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী দাস-দাসী বা অপর কাহারও সাহায্য তেমন পান না। তখন পরিচালিকা এবং কর্মী উভয় ভূমিকাতেই তাঁহাকে কাজ করিতে হয়।

মানবীয় সম্বন্ধ (Human Relationship)

বিংশ শতাব্দীর জটিলতম সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন যখন নানা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, তখন সঙ্গতি বিধানের প্রশ্নই (question of adjustment) সমাজে এবং সংসারে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সঙ্গতিবিধানের সমস্যার মূল কথা হইল মানবীয় সম্বন্ধ। মানবীয় সম্বন্ধ সঠিক হইলে বহু সমস্যার সহজ সমাধান হয়। পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি মানবীয় সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। মানবীয় সম্বন্ধের মূল কথাগুলি তাই প্রত্যেকটি মেয়ের জানা উচিত।

মানবীয় সম্বন্ধ—মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহাই মানবীয় সম্বন্ধ। সকল প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মধ্যে সমাজ-বৃত্তি (group instinct) প্রবল। স্বভাবতঃই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। একসঙ্গে বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। এই সকল সম্বন্ধ ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধের মতো জৈবধর্মী নহে। ইতর প্রাণী আত্মরক্ষা এবং বংশ রক্ষার তাগিদে যূথবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। মানুষের ক্ষেত্রে জৈব প্রয়োজন ছাড়াও স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি সহযোগিতা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তির প্রেরণা থাকে। জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই হয়তো আদি যুগে মানুষ প্রথম ঘর বাঁধিয়াছিল। কিন্তু আজ সভ্য মানুষের নিকট মানসিক দিকটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাই মানবীয় সম্বন্ধকে ঠিক দৈহিক সম্বন্ধ বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি মানুষের সহিত আর-একটি মানুষের মনের সম্বন্ধ।

মানবীয় সম্বন্ধের ভিত্তি—মানবীয় সম্বন্ধের মূলভিত্তি স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, সখ্য, বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের সুকুমার সমাজ-বৃত্তিগুলি। আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার প্রবৃত্তিগুলি পরোক্ষভাবে মানবীয় সম্বন্ধের মূলে থাকিলেও ইহারা প্রত্যক্ষ নহে। মনের সম্বন্ধই পরিবারভুক্ত মানুষগুলিকে অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে।

বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ—পরিবারের প্রতিটি মানুষই পরস্পরের সহিত কোন না কোন একটি সম্বন্ধে জড়িত। তবে পরিবারের সকলের সহিত সম্বন্ধ এক নহে! বিভিন্ন মানুষের সহিত বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়; যেমন—(১) স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, (২) পিতামাতার সহিত সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধ,

(৩) ভাই ও বোনের সম্বন্ধ, (৪) শাশুড়ীর সহিত বধূর সম্বন্ধ, (৫) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্বন্ধ, (৬) দাসদাসী এবং আশ্রিতজনের সহিত সম্বন্ধ। গৃহের বাহিরে আরও কয়েকটি সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন—বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, সহকর্মীর সম্বন্ধ, শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ, দলনেতা ও অনুগামীর সম্বন্ধ প্রভৃতি।

পারিবারিক সম্বন্ধ—পারিবারিক সম্বন্ধের মূল কথা সহযোগিতা। পরিবারভুক্ত মানুষগুলি পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে, পরস্পরের অভাব পূরণ করে। তাহারা তাই পরস্পরের পরিপূরক। যতদিন ঐ পরিপূরকের ভূমিকা রক্ষিত হয় ততদিন পারিবারিক সম্বন্ধ ভাল থাকে। যখনই কেহ এই কর্তব্যে ত্রুটি করে তখনই সম্বন্ধে ভাঙন ধরে। তবে নির্দিষ্ট সম্বন্ধগুলির ক্ষেত্রে সহযোগিতা ভিন্ন অন্যান্য শর্তও থাকে। যেমন—

(১) **স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ**—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম হস্তের সম্বন্ধের মতো। পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানীরা ধনুকের ও ছিলার সম্বন্ধের সহিত, নাচের আসরে বল-ড্যান্সের দুটি জুড়ির সম্বন্ধের সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের তুলনা করিয়াছেন।

অনুরাগ ও যৌন পরিতৃপ্তি—এই দুইটিই হইল স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের প্রধান ভিত্তি। এই দুইটি শর্ত প্রতিপালিত হইলে উভয়ের সম্বন্ধ দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ ছাড়াও বিবাহিত নরনারী সংসার জীবনে পরস্পরের জুটি। তাই স্বামী-স্ত্রী যদি একে অন্যের অভাব পূরণ করে, প্রত্যেকটি সমস্যা যৌথভাবে সমাধানের চেষ্টা করে তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে স্ত্রী স্বামীর সখী এবং সচিব দুই-ই। আধুনিক সমাজবিদরা বলেন, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের 'partner'; সংসার জীবনে তাহারা অভিন্ন। স্বামী বা স্ত্রী এককভাবে অসম্পূর্ণ। দুইয়ের মিলনেই আসে সম্পূর্ণতা। আধুনিক সমাজবিদ Henry A. Bownan তাই বলিয়াছেন, "Man and woman together form a functioning unit. Either alone is in a sense incomplete. They are complementary. Though separate with the possibility for independent existence, they are at the same time mutually dependent parts of a functioning whole."

(২) **পিতামাতার সহিত সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধ**—পিতামাতার

দিক হইতে বাৎসল্য এবং সন্তান-সন্ততির দিক হইতে শ্রদ্ধার্পণই এই সম্বন্ধের মূল ভিত্তি। স্নেহের তাগিদেই পিতামাতা সন্তান পালন করেন এবং শ্রদ্ধার্পণ করিয়া সন্তান পিতামাতার প্রতি আনুগত্য জানায়। পিতামাতা পুত্র-কন্যার নিকট হইতে যত অধিক শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারেন তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ তত দৃঢ় হয়। পিতামাতা যদি পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্যগুলি সঠিক-ভাবে পালন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করা কঠিন হয় না। পিতামাতার কর্তব্য খাদ্য, খেলাধূলা, বিশ্রাম প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, মানসিক বৃত্তিগুলির সুষম বিকাশের জন্য সৎশিক্ষা দেওয়া এবং সৎ আদর্শ স্থাপন করা, নৈতিক চরিত্র গঠন করা, সুপথে পরিচালিত করা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সঠিক বৃত্তি নির্বাচন করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহার পরিবর্তে পিতামাতা যদি পুত্র-কন্যাকে অতিরিক্ত আদর দেন বা অতি শাসন করেন, অথবা তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং দক্ষতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপনাদের উচ্চ আশা পূরণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, অথবা স্বাধীন চলাফেরায় সকল সময় অযথা বাধা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে পুত্র-কন্যার সহিত পিতা-মাতার সম্বন্ধ তিক্ত হইয়া উঠে। পিতামাতার ঐ ব্যবহারগুলি শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হয়। তাহারা স্বার্থপর, ঘরকুনো, স্বপ্নবিলাসী এবং মুখচোরা হয়, অথবা দুর্দান্ত, দুর্বিনীত, বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পিতা-মাতার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ভালবাসা কিছুই থাকে না। অপর-পক্ষে সন্তান-সন্ততি যদি পিতামাতাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতা করে, পিতামাতার নিকট হইতে যে সকল সুবিধা পাইতেছে তাহার সদ্ব্যবহার করে এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে তাহা হইলে পিতামাতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কখনও তিক্ত হয় না।

(৩) **ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ**—স্নেহের সহিত সখ্য মিশিয়া এক অপূর্ব মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে ভাই ও বোনের মধ্যে। হিংসা, বিরক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই মধুর সম্বন্ধকে ক্ষুণ্ণ করে। বড় ভাই-বোনগুলি যদি ছোট ভাই-বোনগুলিকে ভালবাসে এবং নিজেদের জিনিসপত্রের অংশ তাহাদের দেয়, তাহা হইলে ছোটরা দাদা-দিদিদের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং হিংসা করে না। এ ছাড়া বড় দাদা-দিদিরা যদি ছোটদের প্রতি

তাহাদের কর্তব্য পালন করে তাহা হইলেও ভাই-বোনের সম্বন্ধ ভাল থাকে। বড় দাদা-দিদিদের কর্তব্য ছোট ভাই-বোনগুলির লেখাপড়া, স্নান, আহার-বিহার, খেলাধূলা প্রভৃতি সব কিছুতে সাহায্য করা। দাদা-দিদির নিকট হইতে সহযোগিতা পাইলে ভাই-বোনেরা তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠে এবং অনুগত হয়।

ছোট ভাই-বোনেরাও যদি দাদা-দিদির বাধ্য হয়, সকল সময় তাহাদের জিনিসপত্র তছনছ করিয়া বিরক্ত না করে, তাহা হইলে বড়রাও তাহাদের ভালবাসে, আদর করে। অনেক সময় পিতামাতার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ভাই-বোনের মধুর সম্বন্ধ নষ্ট হয়। কোন কোন শিশু একটু বেশী হিংসুটে হইয়া থাকে। তাহারা অন্য ভাই-বোনের উপর হিংসা করে। ইহাতে পিতা-মাতার কখনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। স্বাভাবিক নিয়মেই বড় ভাই-বোনগুলি মনে করে যে ছোট ভাই বা বোন তাহাদের আদরের রাজ্য দখল করিয়া লইতেছে। পিতামাতা একটু সাবধান ও পক্ষপাতশূন্য হইলে সন্তানদের এই মনোভাব শীঘ্র দূর হয়। কোন একটি ভাই বা বোনের উপর পিতামাতার স্নেহ অধিক বর্ষিত হইলে অন্যেরা তাহাকে হিংসা করে। অনেক সময় মা কনিষ্ঠ সন্তানটির দায়িত্ব কিশোরী কন্যাটির উপর চাপাইয়া দেন। মেয়েটি ইহাতে বিরক্ত হয়। সেই বিরক্তি ছোট ভাইটির উপর পড়ে। পিতামাতা সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিলে এবং সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলে ভাই-বোনের পরস্পরের মধুর সম্বন্ধ নষ্ট হয় না।

(৪) **আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্বন্ধ**—ভারতীয় পরিবারগুলি কেবল স্বামী স্ত্রী এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। শ্বশুর-শাশুড়ী, জা-ননদ, কাকা-জ্যাঠা, পিসিমা-মাসিমা, ঠাকুমা-দিদিমা প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও পরিবারে থাকেন। এই সকল আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কাহারও সহিত শ্রদ্ধার, কাহারও সহিত স্নেহের, বা কাহারও সহিত সখ্যের সম্বন্ধ থাকে। যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিলে সম্বন্ধ মধুর হয়। যেমন—বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত কন্যার মতো ব্যবহার করিলে, পিতামাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিলে এবং অনুগত থাকিলে তাঁহারাও বধূকে ভালবাসেন। বধূ যদি তাঁহাদের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের মতামতের মূল্য না দেন, তাহা হইলেই সংসারে কলহের কারণ ঘটে। অপর

পক্ষে শ্বশুর-শাশুড়ীও যদি পুত্রবধূকে কন্যা-জ্ঞানে স্নেহ-যত্ন করেন, তাহার ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি দেন, তাহার সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে কখনই বধূর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ তিক্ত হয় না।

এইরূপ প্রত্যেকটি সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই যদি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে সংসারে কখনও ভাঙন ধরে না।

(৫) আশ্রিত আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্বন্ধ—আশ্রিত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সহানুভূতি দেখানো কর্তব্য। তাহাদের আত্মাভিমানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রাপ্য মর্যাদা দান করিলে তাহারা চিরকৃতজ্ঞ থাকে।

(৬) দাসদাসীর সহিত সম্বন্ধ—দাস-দাসী বলিতে আমরা বুঝি, অর্থের বিনিময়ে যাহাদের শ্রম ক্রয় করা হয়। অর্থাৎ ইহাদের সহিত ব্যবসার সম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের ভারতীয় পরিবারগুলিতে দাসদাসীর সহিত ঠিক ব্যবসার সম্বন্ধ নহে। তাহারাও পরিবারের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই আমাদের কাছে সহৃদয় ব্যবহার তাহারাও আশা করে। তাহাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা যদি চিন্তা করা হয় এবং অভাব-অভিযোগ সহানুভূতির সহিত দেখিয়া সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে তাহারা কৃতজ্ঞ থাকে। যে সকল ক্ষেত্রে সহানুভূতির অভাব থাকে সেইখানেই দাসদাসীদের পেশাদার হইতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট কাজের বাহিরে তাহারা কিছু করিতে চাহে না।

গৃহকন্যার দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিশেষ। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারটির সাফল্যও নির্ভর করে পরিবারভুক্ত প্রতিটি পরিজনের সমবেত প্রচেষ্টার উপর। সকল সদস্য যদি আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন, তাহা হইলে পরিবারটি সুখী এবং শান্তিপূর্ণ হয়।

গৃহকন্যারাও পরিবারভুক্তা। তাহাদের তাই পরিবারের প্রতি কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তাহারা যদি এই সকল দায়িত্ব পালন করে তাহা হইলে পরিবারে শান্তি বিরাজ করে এবং তাহাদের নিজেদেরও লাভ হয়। এই সকল কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়া তাহারা নানা সদ্‌গুণ অর্জন ও

অনুশীলন করিতে পারে, তাহাদের সহজাত ক্ষমতার বিকাশ হয়, তাহারা ভবিষ্যৎ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে।

সকলের কর্তব্য সমান নহে। বয়স, সামর্থ্য, পরিবারে নিজের স্থান প্রভৃতির উপর তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ভর করে। তবে অবিবাহিত কিশোরী মেয়েদের সকল পরিবারেই কতকগুলি কাজ থাকে। যেমন—

(১) ইহারাই পরিবারের আনন্দের যোগানদার হয়। নাচে-গানে, কথায়-গল্পে বাড়ীটি মুখর করিয়া রাখে। তাহারাই গৃহের শোভাবর্ধন করে। তাহাদের প্রাণোচ্ছল সহজ সরল চলাফেরা গৃহকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

(২) ইহার উপর তাহারা যদি গৃহকর্মে সাহায্যের জন্য ক্ষুদ্র হাতখানি বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে মায়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য পালন করা হয়। বিশেষ করিয়া যেখানে মাকে অধিকাংশ গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হয়, সেস্থলে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গৃহসজ্জা, চা-জলখাবার পরিবেশন, পান সাজা, ভাই-বোনেদের পড়াশুনা দেখানো, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ইত্যাদি তাহারা করিতে পারে এবং ঐগুলির দায়িত্ব তাহাদের লওয়া উচিত।

(৩) মাতার ন্যায় পিতার প্রতিও তাহাদের কিছু কর্তব্য থাকে। তিনি বাহির হইতে কর্মক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিলে পোশাক-পরিচ্ছদ খুলিতে তাঁহাকে সাহায্য করা, বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, সেবাযত্ন ও মধুর বাক্যে ক্লান্তি দূর করা, চা-জলখাবার দেওয়া, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি হাতের কাছে আনিয়া দেওয়া, অফিস যাইবার পূর্বে পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া রাখা, স্নানের ঘরে তেল তোয়ালে সাবান রাখিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি তাহারা করিতে পারে এবং এজন্য পিতা খুশী হন।

(৪) গৃহে পিতৃ বা মাতৃস্থানীয়া যে সব গুরুজন থাকেন, তাঁহাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা বালিকা কন্যাদের কর্তব্য। তাঁহাদের সকল কাজে সাহায্য করা এবং তাঁহাদের অনুগত থাকা উচিত।

(৫) দাস-দাসীরাও দিদিমণির নিকট দুইটি মিষ্ট কথা শুনিলে খুশী হয়। সকল সময় তাহাদের উপর হুকুম না চালাইয়া মিষ্ট কথায় দরদ দিয়া কথা বলিলে তাহাদের প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়।

(৬) গৃহে অতিথি-অভ্যাগতগণ আসিলে তাঁহাদের আপ্যায়নের ভার বালিকা কন্যাদের লওয়া কর্তব্য। তাঁহাদের সঙ্গ দেওয়া, আনন্দ পরিবেশন করা এবং যত্ন-আত্তি করা প্রভৃতি কার্য বালিকা কন্যাদেরই উপযোগী।

(৭) সকল কন্যার পক্ষে এইভাবে গৃহকর্মে সাহায্য করা হয়ত সম্ভব হয় না বা প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের গৃহের প্রতি এবং পিতামাতার প্রতি কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য থাকিবে না, ইহা ঠিক নহে। পিতৃগৃহে প্রতিটি কন্যারই কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য থাকে, যেমন—পিতামাতার নিকট হইতে সে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, তাহার সদ্‌ব্যবহার করা। মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিলে, গানবাজনা শেখার সুযোগ থাকিলে তাহা ভালভাবে শিখিলে, পিতামাতার অনুগত এবং বাধ্য থাকিলেও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়।

(৮) অনেক সময় পিতামাতা কন্যার সকল ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন না। আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্য তাহাদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন না। ইহাতে অনেকের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশ হইয়াও পড়ে। তখন তাহাদের মধ্যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখা দেয়। অন্যান্য সমবয়সী মেয়েরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে তাহা দেখাইয়া পিতামাতাকে তাঁহাদের অক্ষমতা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ করিলে অবশ্যই ঐ সকল কন্যা কর্তব্যচ্যুত হইবে। পরিবারের একজন হিসাবে পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা তাহাদের জানা উচিত এবং অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়া উচিত, অবুঝ হইয়া কখনই সংসারের শান্তি নষ্ট করা উচিত নহে।

এইভাবে গৃহকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরিজনদের প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়া অল্পবয়স্কা কন্যাদের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের শিক্ষা সম্পন্ন হয়। গৃহ সমাজেরই ক্ষুদ্র রূপ। গৃহে তাহারা আনুগত্য অভ্যাস করে, ভালবাসিতে এবং সহযোগিতা করিতে শেখে। এইখানেই একসঙ্গে খাওয়া-বসা ইত্যাদির মধ্য দিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে গিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে। পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্য দিয়া তাহারা নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিতে শেখে এবং বাধ্যতা অভ্যাস করে। কেবল তাহাই নহে, তাহাদের ভালবাসা দয়া মায়া তিতিক্ষা প্রভৃতি সহজাত

গুণগুলির অনুশীলন এবং আবেগগুলির বিকাশ হয়। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন করিলে, সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করিলে সকলেই তাহাদের ভালবাসে এবং প্রশংসা করে। ভালবাসা এবং প্রশংসা তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মায়, তাহাদের মানসিক স্থৈর্য অক্ষুণ্ণ রাখে। রাগ হিংসা ভয় আত্মকেন্দ্রিকতা সংকীর্ণতা প্রভৃতি মনে স্থান পায় না।

এই সকল কন্যা সুমাতা ও সুনাগরিক হইয়া উঠে। তাহাদের যে কোন সংসারে বা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে অসুবিধা হয় না। আত্মবিশ্বাস থাকে বলিয়া সকল কাজে অগ্রসর হয় এবং জীবনে সাফল্য লাভ করে।

বন্ধুত্ব (Friendship)

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা বাস করিতে পারে না, সমাজে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকে। আবার সেই পাঁচজনের মধ্যে দুই-একজনকে আপনার হৃদয়ের অত্যন্ত নিকটে পাইতে চাহে। তখন তাহারা হয় তাহারা আপনার জন বা বন্ধু। বন্ধুর নিকট সকল কথা বলিয়া আপন হৃদয়ভার লাঘব করে। একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের সহানুভূতি এবং ভালবাসা তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। বন্ধু সুখে-দুঃখে তাহার পাশে থাকিয়া, সাহচর্য দিয়া, আনন্দ দিয়া জীবন মধুর করিয়া তোলে। বন্ধুহীন জীবন মরুভূমিবৎ মনে হয় এবং জীবনের সকল আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য হারাইয়া যায়।

তাই বন্ধুর প্রয়োজন প্রত্যেকের আছে। তবে প্রকৃত বন্ধু লাভ করা পরম ভাগ্যের কথা। বন্ধু নির্বাচনের সময় একটু সজাগ থাকিয়া, কয়েকটি দিক বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিলে তবেই সৎ বন্ধু লাভ সম্ভব হয়। যেমন—

(১) আনুগত্য, সততা এবং বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি। তাই যে অনুগত, দরদী এবং বিশ্বস্ত, তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হয়। অসৎ ব্যক্তি কখনই বন্ধুপদবাচ্য হইতে পারে না, আপন কার্যসিদ্ধির জন্য সে বন্ধুত্বের ভান করে মাত্র।

(২) হালকা স্বভাবের বা অস্থিরমতি কাহারও সহিত সখ্য স্থাপন করিতে নাই। ঐরূপ বন্ধু বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে পারে না। দৃঢ়চেতা ও স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ভাল বন্ধু হইতে পারে।

(৩) বন্ধু সঙ্গীও বটে। তাই যাহার ব্যক্তিত্ব মধুর, যে নিরহংকার এবং কৌতুকপ্রিয় তাহার সখ্য কাম্য।

বন্ধুর সহিত স্বভাবের মিল থাকা একান্ত প্রয়োজন। মিল আকর্ষণ করে এবং অমিল বিচ্ছেদ ঘটায়। কেবল স্বভাবের, রুচির বা আগ্রহের মিল নহে, বয়স, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও মিল থাকা প্রয়োজন। একই বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে, একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়।

(৪) পুরুষের সহিত পুরুষের এবং নারীর সহিত নারীর যেমন বন্ধুত্ব হয় তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যেও বন্ধুত্ব হইতে পারে। একটি বালকের খেলার সাথী একটি বালিকা হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সামাজিক বা আর্থিক অবস্থার মিল না থাকিলেও, বয়স বা মনের মিল থাকিলেই বন্ধুত্ব বা সখ্য গড়িয়া উঠিতে পারে। কিশোর বয়সে সাধারণতঃ বন্ধুত্ব হয় বালকে-বালকে, বালিকায়-বালিকায়; এই সময়ে বালক ও বালিকার মধ্যে বন্ধুত্ব বা সখ্য খুব বেশী হইতে দেখা যায় না। কৈশোর অতিক্রমকালে, যৌবন-পূর্ব অবস্থায় ছেলে এবং মেয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হইয়া উঠে। এই বন্ধুত্ব অনেক সময় তাহাদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। সেজন্য এই বয়সে বন্ধু নির্বাচনের সময়ে বন্ধু-নির্বাচনের শর্তগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

বন্ধুর প্রয়োজন—মানুষের বন্ধুর প্রয়োজন হয় নানা কারণে, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হইল ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রশ্ন। একটি অল্প-বয়সী মেয়ের সুস্থ মানসিক গঠনের জন্য এবং স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশের জন্য বন্ধুর প্রয়োজন। যে সকল শিশুকে বাড়ীর বাহিরে কাহারও সহিত খেলিতে দেওয়া হয় না, সেই সকল শিশু স্বার্থপর, হিংসুটে এবং ঘরকুনো হয়। তাহারা কাহারও সহিত সহজে খাপ খাওয়াইতে পারে না। পরন্তু যাহারা বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে বহুজনের সহিত বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ পায়, তাহারা সহজেই জীবনে যে কোন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে। বিশেষ করিয়া মেয়েদের সম্পূর্ণ অন্য পরিবারে গিয়া খাপ খাওয়াইতে হয়, তাই তাহাদের প্রথম হইতেই আরো পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত মেলামেশা করা প্রয়োজন।

মনের মতো বন্ধু পাইলে মানুষ বন্ধুর নিকট কেবল আপন হৃদয়ের

গোপন কথাই বলে না বা বন্ধুর সহিত খেলাধুলাই করে না, সুখ-দুঃখের বিনিময়ও করে। বন্ধুর নিকট হইতে সে প্রীতি-ভালবাসা যেমন পায় তেমনি দেয়ও। প্রয়োজন হইলে আপনার স্বার্থ ছাড়িয়াও বন্ধুর উপকার করে। এই যে আদান-প্রদান করিবার ইচ্ছা, আগ্রহ এবং অভ্যাস—ইহা একটি বড় সামাজিক গুণ। ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব দ্বারাই এই গুণ অর্জন করিতে পারে। ইহা তাহাদের সমাজে খাপ খাওয়াইতে সাহায্য করে।

এছাড়া খেলাধুলা, ভাববিনিময় প্রভৃতি করিতে করিতে বন্ধুদের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি বা ভালবাসার সৃষ্টি হয়। ভালবাসা হইতেই উদারতা বিকাশ লাভ করে। সহানুভূতি নামক সহজাত বৃত্তিটির উদ্ভব হয় বন্ধুত্বকেই কেন্দ্র করিয়া।

বন্ধুর সহিত একত্রে খেলাধুলা, পড়াশোনা প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন সহযোগিতার মনোভাব আসে, তেমনি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ভাবও লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-জীবনে উন্নতির জন্য ঐ মনোভাবেরও প্রয়োজন আছে।

বন্ধুর নিকট আপন হৃদয়ের সকল গোপন ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

বন্ধুকে ভালবাসিয়া, বন্ধুর জন্য ত্যাগ করিয়া ছেলেমেয়েরা আত্ম-কেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিতে শেখে। একেবারে শৈশবে মেয়ে বা ছেলে খুব বেশী রকম আত্মকেন্দ্রিক থাকে। যত বড়ো হয়, তত তাহার আত্মকেন্দ্রিকতা কমিতে থাকে এবং সে সামাজিক হইতে শেখে। বন্ধু এই সমাজীকরণে সাহায্য করে।

ছেলেমেয়েরা যত বড় হয় বন্ধুর সংখ্যা তত বাড়িতে থাকে। প্রথমে বাড়ীতে পিতামাতা এবং ভাইবোনেদের মধ্যেই বন্ধুত্ব সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহার পর প্রতিবেশী ও সহপাঠিনীদের সহিত তাহারা বন্ধুত্ব করিতে চাহে। ইহার প্রয়োজন আছে। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত ছেলেমেয়েদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে খাপ খাওয়ানোর প্রশ্ন খুব বেশী আসে না। কারণ একই পরিবারভুক্ত মানুষগুলির মধ্যে সাধারণতঃ এক ভাবধারা, এক ধরনের মানসিকতা, রুচি ও চিন্তা থাকে। উপরন্তু আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও বয়স্করা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিকট হইতে খুব বেশী কিছু আশা করেন না। অল্প প্রতিদান পাইলেই তাঁহারা খুশী হন। স্নেহ এবং প্রশ্রয় বহু ক্ষেত্রেই অনেক

ত্রুটি এড়াইয়া যায়। কিন্তু বাহিরের অন্য পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইলে বিভিন্ন রুচি ও চিন্তার সহিত খাপ খাওয়াইতে হয়, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় সমবয়স্কদের ভালবাসিয়া সহযোগিতা করিতে হয়, বন্ধুদলের মধ্যে নিজেকে মানাইয়া লওয়ার জন্য তাহাদের হাবভাব, কথাবার্তা, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি অনুকরণ করিয়া তাহাদের মতো হইবার চেষ্টা করিতে হয়। এইভাবে সে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মানুষের চিন্তা ও মতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে শেখে।

ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব করিতে গিয়া দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শেখে। দলের কর্তৃত্ব মানিতে এবং নেতৃত্ব করিতে শেখে। কেবল তাহাই নহে, দলের মধ্যে একজনের সহিত যখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন ঐ ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির নৈতিক চরিত্র এবং চিন্তা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সৎ বন্ধুর সংসর্গে চরিত্র গঠন ও নৈতিক মান উন্নত হয়। বন্ধুর সদ্‌গুণগুলি অনুকরণ ও অনুভাবন দ্বারা সে আত্মীকরণ করে।

এছাড়া যে বন্ধুটি সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহার অনুরাগ ও ভাল লাগার সহিত আপন অনুরাগ মিলাইয়া ছেলে বা মেয়েটি নূতন নূতন আগ্রহের ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। পড়াশুনা, নানা গঠনমূলক কাজ, সমাজ কল্যাণের কাজ, শিল্পকলার বিষয়ে আগ্রহ প্রভৃতি বন্ধুর প্রভাব হইতে আসিতে দেখা যায়।

বন্ধুত্ব রক্ষার শর্তাবলী—বন্ধুত্ব স্থাপন যত সহজ, তাহা রক্ষা করা তদপেক্ষা কঠিন। বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে বন্ধুত্বের পথের অন্তরায়গুলি সর্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন। যেমন—

(১) **বিশ্বস্ততা :** বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি। বন্ধুর নিকট একবার অবিশ্বাসী প্রমাণিত হইলে বন্ধু তাহাকে আর কোনদিন বিশ্বাস করিতে পারে না। এইজন্য বন্ধুর গোপন কথা অন্যের নিকট কখনও প্রকাশ করিতে নাই, ক্ষতি হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই।

(২) **আদান-প্রদান :** পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব টিকিয়া থাকে। তাই কেবল বন্ধুর নিকট গ্রহণ করিতে থাকিলে, বিনিময়ে কিছু না দিলে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না। সকল সময়ে বন্ধুকে উপহারের পরিবর্তে উপহার কিংবা খাওয়ানোর পরিবর্তে খাওয়ানো সম্ভব হয় না, কিন্তু অন্য-ভাবেও তাহাকে প্রতিদান দেওয়া যায়। কাহারও নিকট হইতে পাঁচদিন

উপহার গ্রহণ করিলে অন্ততঃ একদিন তাহাকে সামান্য কিছু দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে সচেতন থাকিলে বন্ধুত্ব রক্ষা সহজ হয়।

(৩) **প্রশংসা :** বন্ধুর মধ্যে প্রশংসনীয় কিছু থাকিলে তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা উচিত। তবে সম্মুখে প্রশংসা করা অপেক্ষা আড়ালে অন্যের নিকট প্রশংসা করা ভাল। সম্মুখে অতি-প্রশংসা অনেক সময় তোষামোদ বলিয়া মনে হয়। তাই সম্মুখে প্রশংসা করিলেও তাহার ভুলত্রুটিগুলিও সেই সঙ্গে দেখাইয়া দিতে হয়। তবেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হয়।

(৪) **অসংযত কথাবার্তা :** বন্ধুর ভুল-ত্রুটিগুলি দেখাইবার সময় এমনভাবে উহা বলিতে হয় যাহাতে তাহার আত্মাভিমানে আঘাত না লাগে। বন্ধুর সাজ-পোশাক, আচার-ব্যবহার লইয়া অসংযত ভাবে মন্তব্য করিলে বন্ধুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে এবং বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ন হইতে পারে। তাই অপ্রিয় সত্য বন্ধুত্ব রক্ষার পথে অন্তরায় স্বরূপ।

(৫) **পরমত-সহিষ্ণুতা :** অনেক সময় বন্ধুর বিশ্বাসের সহিত নিজের মত মেলে না বা দুইজনের আগ্রহ একই দিকে যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে যদি একজন আর-একজনের উপর নিজের বিশ্বাস জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাহে, তাহা হইলে হৃদ্যতা বেশীদিন বজায় থাকে না।

(৬) **মেলামেশা :** নিয়মিত সাক্ষাতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ দিন দেখাশোনা না হইলে আপনা হইতেই হৃদ্যতার বন্ধন শিথিল হইয়া আসে। তাই বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিতে হইলে নিয়মিত মেলামেশা অথবা চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করিতে হইবে। বৎসরের স্মরণীয় দিনগুলিতে বন্ধুকে অভিনন্দন পাঠাইতে হইবে, কিংবা তাহার সহিত মিলিত হইয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে হইবে। মাঝে মাঝে বন্ধুকে বাড়ীতে আপ্যায়ন করিতে পারিলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) **ভালবাসা, সহানুভূতি, ত্যাগ :** বন্ধুত্বের বন্ধন ভালবাসার বন্ধন। আন্তরিকতা, ভালবাসা এবং সহানুভূতি থাকিলে স্বভাবের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিও পরস্পর সহিয়া যায়। ইহার উপর যদি বন্ধু আপন স্বার্থের কথা না ভাবিয়া বিপদে-আপদে সাহায্য করে, আনন্দের দিনে বন্ধুর সহিত আনন্দ ভাগ করিয়া লয় তাহা হইলে সখ্যের বন্ধন দৃঢ় হয়। বন্ধু যদি

একবার বুঝিতে পারে যে বন্ধুটি তাহার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা হইলে সে কখনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

তবে সব কিছুর মতো বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও জোয়ার-ভাঁটা আছে। দুইটি বন্ধুকে কখনও গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ হইতে দেখা যায়, আবার কখনও ঘনিষ্ঠতায় ভাঁটা পড়ে। এই দেখিয়া যদি কেহ ভাবে যে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরিয়াছে, তাহা হইলে ভুল হইবে। সাময়িক আগ্রহের অভাব অল্পদিনেই দূর হইয়া যায়।

অনুশীলনী

E. ১৯৬৫—(৭) আদর্শ গৃহ কাহাকে বলে? গৃহিণীর কর্তব্য কি কি? সুখী গৃহ রচনার ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কতটুকু?

উঃ সং—(১) আদর্শ গৃহের সংজ্ঞা—যে গৃহে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য, করে তাহাকে আদর্শ গৃহ বলে।
(২) গৃহিণীর কর্তব্য—গৃহ-পরিচালনা।
(৩) কুমারী কন্যার দায়িত্ব।

E. ১৯৬৬—(৮) সুগৃহিণীর গুণাবলী কি কি? কখন তুমি বলিবে গৃহখানি সুপরিচালিত হইয়াছে?

উঃ সং—(১) সুগৃহিণীর গুণাবলী।
(২) সফল গৃহ-পরিচালনার শর্তাবলী।

E. ১৯৬৯—(৯) আদর্শ গৃহ কাহাকে বলে? বাড়ীতে মাকে কি কি কর্তব্য পালন করিতে হয়? বাড়ীতে তোমার দায়িত্ব কি কি?

উঃ সং—(১) আদর্শ গৃহের সংজ্ঞা, (২) মায়ের কর্তব্য—সন্তানের সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিয়া তাহাকে সুনাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা, (৩) কুমারী কন্যার কর্তব্য।

E. ১৯৬৫—(১০) তোমার বয়সী একটি মেয়ের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি?
উঃ সং—কুমারী কন্যার দায়িত্ব ও কর্তব্য—ভূমিকা, আনন্দ যোগান, গৃহকর্মে সাহায্য করা, পিতামাতার সেবা করা, সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা, সৎ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা ও সৎ শিক্ষা লাভ করা, পিতামাতার প্রতি অনুগত থাকা, আশ্রিত এবং পরিজন, দাসদাসী সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।

E. ১৯৬৪—(৮) বন্ধুর কি প্রয়োজন? সেই সকল গুণের তালিকা দাও যাহা থাকিলে স্থায়ী সন্তোষজনক বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। তোমার যুক্তির কারণ দেখাও।
উঃ সং—(১) বন্ধুর প্রয়োজন। (২) স্থায়ী প্রকৃত বন্ধুত্বের শর্তাবলী—প্রত্যেকটি শর্তের পশ্চাতে কারণ দেখাইতে হইবে।

E. ১৯৬৫—(১১) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—বন্ধু নির্বাচন।
উঃ সং—'বন্ধু নির্বাচন' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি দেখ।

E. ১৯৬৭—(১০) আমাদের বন্ধুর কি প্রয়োজন? কেমন করিয়া বন্ধুত্ব করিব? এবং কেমন করিয়া উহা স্থায়ী করিব?
উঃ সং—(১) বন্ধুর প্রয়োজন—'বন্ধুর প্রয়োজন' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দেখ।
(২) বন্ধুত্ব রক্ষার শর্তাবলী—'বন্ধুত্ব রক্ষার শর্তাবলী' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দেখ।

আলপনা

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে আলপনার একটি বিশেষ স্থান আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে ঘর-দালান, সিঁড়ি, পূজামণ্ডপ, গৃহপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি সজ্জিত করিবার জন্য আলপনার ব্যবহার আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে বার-ব্রত, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হইত। কিন্তু আজকাল যে কোন উৎসবানুষ্ঠানে মেঝে সজ্জার জন্য আলপনা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে কার্পেট প্রভৃতি মেঝে সজ্জার প্রচলন বিশেষ নাই। তাহার পরিবর্তে আলপনা আঁকার রেওয়াজ আছে। ক্রমশঃ ঘরে ঘরে ইহার প্রচার বাড়িতেছে। তাই প্রত্যেকটি গৃহকন্যা ও গৃহবধূর এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

আলপনা কাহাকে বলে?—যে কোন সমতল ভিত্তিকে যখন আলংকারিক ভাবে চিত্রিত করা হয় তখনই তাহাকে আলপনা বলে। মেঝে ছাড়া কাঠের পিঁড়ি, জলচৌকি, দেওয়াল প্রভৃতিতেও আলপনা আঁকা হয়।

আলপনার উদ্দেশ্য—মণ্ডন বা রূপসজ্জাই আলপনার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। আলপনার মধ্য দিয়া গৃহের মঙ্গল কামনা করা হয়, দেবতার কোপ এবং অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি হইতে গৃহকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার গৃহবধূ পূজা ও বার-ব্রতের সময় আলপনার মধ্য দিয়া আপন হৃদয়ের গোপন কামনার কথাও দেবতাকে জানাইয়া থাকে। তাই ব্রতী মুখে যে মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে ব্রতকথা বলে তাহার সহিত আলপনার বিষয়বস্তুর ভাবগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

আলপনার উৎপত্তি—আদিম মানুষ প্রবেশ-দ্বারে অমঙ্গলকর জীবজন্তু, অপদেবতা প্রভৃতির মূর্তি আঁকিয়া রাখিত। ইহার দ্বারা তাহারা বুঝাইতে চাহিত যে ঐগুলি তাহাদের বিজিত বা বশীভূত, তাই উহাদের দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এইভাবে অমঙ্গলকে গৃহ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইতেই প্রথম আলপনার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তাহার পর এমন একটা যুগ আসিল যখন মানুষ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, অরণ্যাদি, চন্দ্র-সূর্যকে দেবতার প্রতীক বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল।

উহাদের ভজনা করিয়া তুষ্ট করিলে গৃহের অমঙ্গল দূর হইবে বলিয়া ধারণা জন্মিল। মনে হয়, তখন হইতেই ঐ সকল জিনিস আলপনার বিষয়-বস্তু হইল।

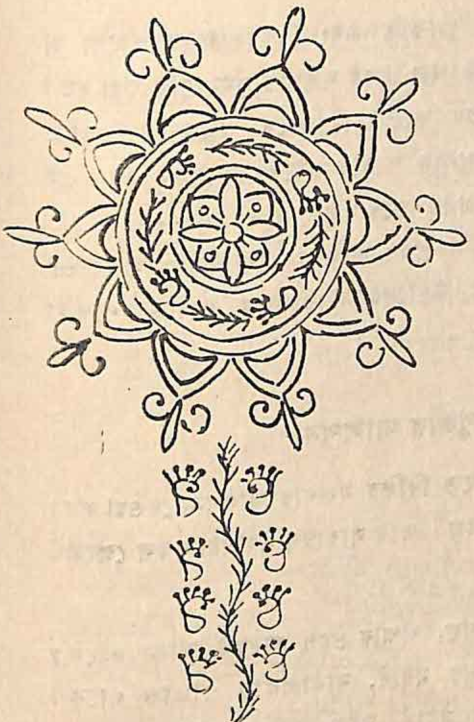
আলপনার বিষয়বস্তু—দেবতার চরণ, উঁহাদের প্রতীক ও বাহন,* পরে যে দেবতা যে জিনিস পাইলে সন্তুষ্ট হন তাঁহার উপাসনায় সেই জিনিসের প্রতীক আঁকা হইতে লাগিল। ঐগুলিও তখন আলপনার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ উহার সহিত পূজারিণীর বা ব্রতীর কামনার প্রতীকগুলিও যোগ হইল। ঐভাবে নানা আভরণ, আসবাবপত্র, ধন-ঐশ্বর্য প্রভৃতি আলপনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। আধুনিক কালে ধর্মবিশ্বাসের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন চিন্তাও বদলাইয়া যাইতেছে। আলপনার রূপ-সজ্জার দিকটাই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। তাই ফুল, লতা-পাতা, পাখী, নদ-নদী, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যই এখন আলপনার প্রধান বিষয়বস্তু হইয়াছে।

এইভাবে আদিম যুগ হইতে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার স্বর্ণযুগ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে আলপনার বিষয়-বস্তুগুলিকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) ফুল-লতা-পাতা, (২) পাখী, মাছ, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার, (৩) নদ-নদী, পাহাড়-অরণ্য, (৪) দেবদেবীর মূর্তি, চরণ প্রভৃতি, (৫) ধানের মরাই, পল্লী-দৃশ্য, (৬) আভরণ ও আসবাবপত্র, (৭) শঙ্খ, ঘট প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য।

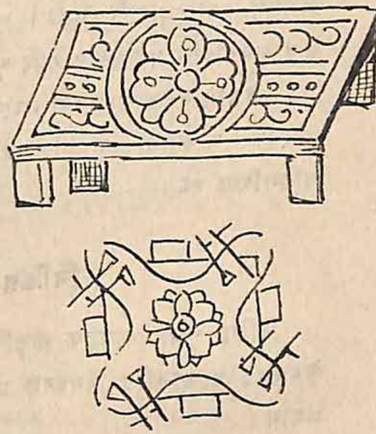
আলপনার শিল্প-বৈশিষ্ট্য—আলপনা আলংকারিক শিল্প। তাই আলপনায় বিষয়বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকা হয় না, প্রতীক আঁকা হয়। প্রতীকগুলি প্রকৃত বিষয়বস্তুর আলংকারিক রূপ। ছন্দই এক্ষেত্রে প্রধান। যখন কোন জিনিস দেখিয়া শিল্পী তাহার অনুলিপি না করিয়া, আপনার কল্পনার রঙ চড়াইয়া উহার ছন্দটি অনুসরণ করিয়া প্রতীক আঁকেন, তখনই উহাকে আলংকারিক শিল্প এবং চিত্রটিকে প্রকৃত বিষয়বস্তুর আলংকারিক রূপ বলা হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি, সহজ মাত্রাজ্ঞান এবং একটি কল্পনাপ্রবণ শিল্পী-হৃদয়।

আলপনার অঙ্কনশৈলী—আলপনার দুইটি দিক আছে—(১) বিষয়বস্তু এবং (২) ছন্দ। আলপনা দিবার সময় ঐ দুইটির উপর নজর রাখিতে হয়। বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিবার সময় আবার দুইটি কথা মনে রাখা

* এগুলি প্রথমে আলপনার বিষয়বস্তু ছিল।



চিত্র নং—৩৪ : লক্ষ্মীপূজার আলপনা



চিত্র নং—৩৫ : সত্যনারায়ণ পূজার আলপনা



চিত্র নং—৩৬ : সরস্বতী পূজার আলপনা

প্রয়োজন—(ক) উহার বাহিরের আকৃতি এবং (খ) ভিতরের শৃঙ্খলা বা বিভাগ। আর ছন্দ রক্ষা করিবার জন্য একই নকশার পুনরাবৃত্তি করা হয়। আলপনার নকশাগুলি পুনরাবৃত্তির ফলে নানাভাবে আন্দোলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। শৃঙ্খলার অভাব হইলে ছন্দঃপতন হয়। এই জন্য পুনরাবৃত্তি ঘটাইবার সময় শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার।

এইগুলি হইল আলপনা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য। বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন ধরনের আলপনা আঁকা হয়। উহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন পূজার আলপনা

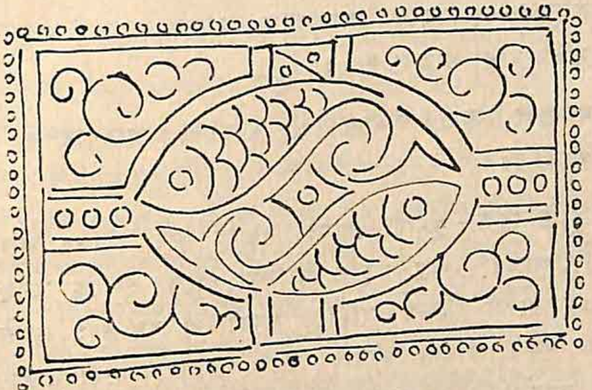
বিভিন্ন পূজা, বারব্রত প্রভৃতিতে বিভিন্ন নকশার আলপনা দেওয়া হয়। উহাদের প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। তবে সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রেই সমান।

লক্ষ্মীপূজার আলপনা—পদ্ম, লক্ষ্মীর চরণ অবশ্যই আঁকা হইবে। উহার সহিত ধানের ছড়া, ধানের মরাই, নানাপ্রকার পাতাও থাকে। পৌষ মাসের লক্ষ্মীপূজায় ধানের মরাই, নানা আভরণ আঁকিতেই হয়। এছাড়া নানা ঐশ্বর্যের প্রতীকগুলিও যুক্ত হয়।

সরস্বতী পূজা—পদ্ম, হংস ও সুন্দর ফুলপাতা আঁকা হয়। ঘট, শঙ্খ, বীণাও আলপনার বিষয়বস্তু হয়।

সত্যনারায়ণ পূজা—নৌকা, ফুল-পাতা, ঘট এই পূজার আলপনার প্রধান বিষয়বস্তু। ছোট জলচৌকি অথবা কাঠের পিঁড়ির উপর আলপনা দেওয়া হয়। চৌকির তলায় মেঝেতেও নৌকার প্রতীক আঁকা হয়।

পিঁড়ি আলপনা—বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে কাঠের পিঁড়ি চিত্রিত করা হয়। বিবাহে প্রজাপতি, ঘট, শঙ্খ, মৎস্য এবং ফুল-পাতাই প্রধান বিষয়বস্তু থাকে। অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রজাপতি আঁকা না হইতেও পারে। তবে ফুল-পাতা, পাখি, শঙ্খ, ঘট প্রভৃতি অবশ্যই আঁকিতে হয়। আজকাল সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যও আঁকা হইতেছে।



চিত্র নং—৩৭ : পিঁড়ি আলপনা



চিত্র নং—৩৮ : মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনা

তারাব্রত—তারাব্রতের আলপনায় বৃত্তাকার নকশাই প্রাধান্য পায়। তাহার সহিত নানা আভরণ যুক্ত হয়।

মাঘমণ্ডল ব্রত—নানাপ্রকার আভরণ, আসবাবপত্র, ঐশ্বর্যের প্রতীক আঁকা হয়।

সেঁজুতি ব্রত—কুমারী মেয়েরা সন্ধ্যার পূর্বে বিভিন্ন আসবাবপত্র, তৈজসাদি, আভরণ, অস্ত্র প্রভৃতি আঁকিয়া থাকে। ইহাকে 'সেঁজুতি ব্রত' বলে। এই ব্রতের উদ্দেশ্য যাহাতে সপত্নী না হয় এবং এজন্য মেয়েরা দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়। তাই তাহারা নানা প্রকার নকশা আঁকিয়া সপত্নীর বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করে।

আলপনা দিবার পদ্ধতি

আজকাল উৎসবে গৃহসজ্জার জন্যও আলপনা দেওয়া হয়। এই সকল আলপনার প্রধান উদ্দেশ্য রূপসজ্জা। তাই আলপনা দিবার সময় অনুপাত, সমতা, ভারসাম্য, ছন্দ ও আকর্ষণের দিকে নজর দেওয়া হয়।

নকশা ও বিষয়বস্তু স্থির করিবার পূর্বে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন কোন্ স্থানে আলপনা দেওয়া হইবে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আলপনার ছন্দই হইল প্রাণ। যে স্থানে আলপনা দেওয়া হইবে সেই স্থানের রেখার

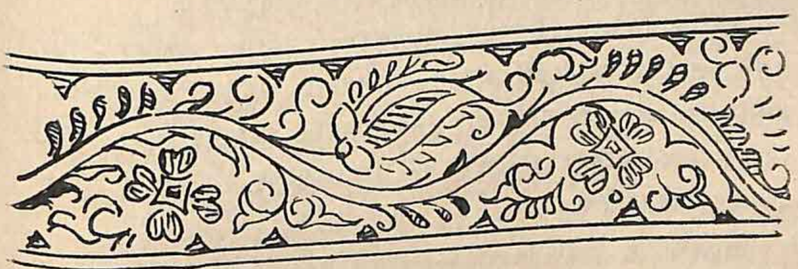


চিত্র নং—৩৯ : পদ্মলতার আলপনা

গতির সহিত যে নকশার ছন্দ মিলিবে সেইরূপ নকশা নির্বাচন করিতে হইবে। আবার নকশার মাপের সহিত ঐ স্থানের আনুপাতিক সমতা থাকিলে তবেই ছন্দ বজায় থাকিবে।

পাড় করিবার জন্য মেঝের লম্বা দিকে বা পিঁড়ির ধারগুলির একপাশ দিয়া যদি আলপনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ৩৯, ৪০ নম্বর নকশাগুলি বেশ উপযোগী হয়। ঘরের মেঝে বা আঙিনার মাঝখানে বড় গোল আলপনা বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় আলপনার সাহায্যে কক্ষের ছোটখাটো ত্রুটি এবং আসবাবপত্রের অভাব ঢাকিয়া দেওয়া যায়। যেমন—ঘরটি যদি বড় হয় আর আসবাবপত্র সংক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে ঘরের মাঝখানে চার চৌকা সীমানা দিয়া আলপনার নকশা আঁকিলে ঘরের মাপ ছোট দেখায়।

আলপনা দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে নকশা এবং যে যে প্রতীকের ব্যবহার করা হইতেছে তাহাদের মধ্যে যেন সর্বত্র মিল থাকে। ঘরে একটি কোণে পাখি, আর এক কোণে পদ্ম, আর এক কোণে লতাপাতা আঁকিয়া রাখিলে খাপছাড়া দেখাইবে। যদি পদ্মকেই বিষয়বস্তু হিসাবে লওয়া হয় তাহা হইলে কোণগুলিতে পদ্মই আঁকিতে হইবে। পিঁড়ি চিত্রণের



চিত্র নং—৪০ : ধারের আলপনা

সময়ে বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। মাঝের নকশার সহিত ধারের এবং কোণের নকশার বিষয়বস্তুগত এবং ছন্দোগত মিল থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে ঐগুলিকে বিচ্ছিন্ন দেখাইবে। তাই বলিয়া সর্বত্র একই নকশা হইবে না। একই প্রতীক নানাভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, নকশার সমবণ্টন করিতে হইবে। ঘরের একদিকের দুইটি কোণে দুইটি আলপনা দিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে স্বাভাবিক-ভাবেই দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট হইবে। ইহাতে গৃহসজ্জার ভারসাম্য নষ্ট হইবে। যেখানেই আলপনা দেওয়া হউক সর্বত্র সমান করিয়া দিতে হইবে। নকশার বণ্টন সুষম হইলে তবেই রূপসজ্জা সার্থক হয়।

আলপনার নিজস্ব ছন্দ তো আছেই, ইহা ভিন্ন একই জায়গায় যতগুলি আলপনা দেওয়া হইবে তাহাদের সহিত এবং ঐ স্থানের অন্যান্য যে সকল আসবাবপত্র, সজ্জাদ্রব্য থাকিবে, তাহাদের প্রত্যেকটির সহিত ছন্দোগত সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। একই প্রতীক একাধিক স্থানে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে দৃষ্টি অবাধে, সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারে।

আলপনার মধ্যে মিল থাকিবে, কিন্তু সকল নকশা সমান মাপের হইবে না। একটি বিশেষ নকশা এমন স্থানে আঁকিতে হইবে যাহা সমগ্র আলপনাটির মধ্যমণি বলিয়া মনে হইবে।

আলপনা লোকশিল্প

আলপনা একটি লোকশিল্প। ইহার জন্য বিরাট প্রতিভার প্রয়োজন হয় না কিংবা শিক্ষা বা বিশেষ অঙ্কন-কৌশল আয়ত্ত করিতে হয় না।

অতি প্রাচীনকাল হইতে গৃহকন্যা ও গৃহবধূরা প্রকৃতির ফুল-লতা-পাতা, পাখি প্রভৃতির আলংকারিক রূপ আলপনায় আঁকিয়া আসিতেছেন। বংশানুক্রমে মাতা ও মাতামহীর নিকট অন্যান্য গৃহকর্মের সহিত ইহাও তাঁহারা শিক্ষা করেন। তাই ইহা পল্লীবাংলার গৃহবধূ ও গৃহকন্যার শিল্প— সাধারণ মানুষের শিল্প।

আলপনার উপকরণ—পিটুলি-বাটাই আলপনা আঁকার জন্য ব্যবহার করিবার নিয়ম। আতপ চাউল ভিজাইয়া, মিহি করিয়া বাটিয়া এই পিটুলি প্রস্তুত করা হয়। পূজা-পার্বণে আলপনা দিবার সময় পিটুলি-গোলায় তুলা ভিজাইয়া অঙ্গুলির সাহায্যে আলপনা আঁকা হয়। কিন্তু এই আলপনা সহজে মুছিয়া যায়। তাই আজকাল গৃহসজ্জার জন্য কোন উৎসবে যখন আলপনা আঁকা হয় তখন পিটুলির পরিবর্তে সাদা খড়ি বা সাদা জিঙ্ক অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। জল ও অল্প গঁদ মিশাইয়া উহার গোলা প্রস্তুত করিতে হয়।

দক্ষিণ ভারতের আলপনা—দক্ষিণ ভারতে আলপনা দিবার সময় গোলা রং-এর পরিবর্তে গুঁড়া রং ব্যবহার হয়। মাদ্রাজীরা আলপনাকে রঙ্গোলী বলে। চাউলের গুঁড়া, খড়ি, ইটের গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া, ডালের

গুঁড়া প্রভৃতি দিয়া রঙ্গোলীর উপকরণ প্রস্তুত হয়। বাংলা দেশের মতো উহারা সাদা আলপনা দেয় না, নানা রং দিয়া রঙ্গিন আলপনা দেয়। প্রথমে খড়ি দিয়া নকশাটি আঁকিয়া লয়। তাহার পর উহার উপর রং-এর গুঁড়া



চিত্র নং—৪১: বৌ-ছত্র আলপনা

ছড়াইয়া দেয়। আর এইভাবে রং-এর ব্যবহার হয় বলিয়াই উহাদের আলপনার নামকরণ হইয়াছে রঙ্গ-রেখাবলী অথবা রঙ্গোলী। বাংলা দেশের আলপনায় বৃত্তাকার নকশা এবং বৃত্তাকার ছন্দের চলনই অধিক। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের আলপনায় জ্যামিতিক নকশার প্রচলন দেখা যায়। আলপনা দক্ষিণ ভারতের গৃহিণীদের নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। গৃহের নিরাপত্তা বা কল্যাণের জন্য তাঁহারা প্রত্যুষে প্রবেশ-দ্বারে, সিঁড়িতে, জানালায়

রঙ্গোলী দেন। দক্ষিণ ভারতে জলের উপর আলপনা দেওয়ার প্রচলনও দেখা যায়। একখানি মোটা কাগজে নকশা আঁকিয়া, নকশার লাইন-গুলিতে ফুটা করা হয়। তারপর কাগজখানি জলের উপর ধরিয়া যে সব রং-এর গুঁড়া জলে ভাসে সেইগুলি উহার উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গর্ত দিয়া গলিয়া রং জলের উপর পড়ে। যেহেতু গর্তগুলি নকশার রেখা ধরিয়া করা হয় সেই হেতু জলের উপর রং-এর গুঁড়া নকশার সৃষ্টি করে।

উড়িষ্যাতে আলংকারিক এবং জ্যামিতিক উভয় প্রকার নকশারই প্রচলন দেখা যায়। আলংকারিক নকশায় ফুল-লতা-পাতা, পাখি, মাছ, জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার জ্যামিতিক নকশায় জ্যামিতিক রেখা, বিন্দু, গোলক প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

আলংকারিক নকশার মধ্যে উড়িষ্যার লতামণ্ডন অতি সুন্দর। উহারা এই লতাগুলিকে বলে ডালি। সরল লতামণ্ডনকে বলে সাদা ডালি। বক্র ডালি, ফুল ডালি প্রভৃতি বহুপ্রকার ডালির নকশা উহারা আঁকে। নটীলতা, ফুললতা, পত্রলতা, পক্ষিলতা, জীবলতা, নরলতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লতা আঁকার রেওয়াজ সেখানে আছে। তেমনি জ্যামিতিক নকশায় ছোট-বড় দানা সম্বলিত মালার নকশাকে উহারা বলে মালী। নানা প্রকার মালী ছাড়াও বিন্দু, রেখা, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নকশার প্রচলন আছে।

দ্বিতীয় পত্র

খাদ্য ও তাহার গুরুত্ব

(Food & its Importance)

খাদ্য—শরীর রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য মানুষ যাহা ভক্ষণ করে, তাহাই খাদ্য। শরীরের কোন কাজে লাগে না বা শরীরের ক্ষতি করে এমন জিনিস যদি কেহ ভক্ষণ করে, তবে তাহা খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে না। যেমন—চা বা কফির লিকার, পচা বা বাসি জিনিস খাদ্য নহে। চা বা কফির লিকারের সহিত দুধ এবং চিনি মিশ্রিত করা হইলে উহারা খাদ্যপদবাচ্য হয়, কিন্তু পচা ও বাসি জিনিস কোন রূপেই খাদ্যপদবাচ্য হয় না। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ হইতে সংগৃহীত হইয়া রন্ধন দ্বারা বা অন্য উপায়ে ভক্ষণ-উপযোগী হইলে তবে কোন জিনিস খাদ্যপদবাচ্য হইতে পারে।

দেহে খাদ্যের প্রয়োজন—শরীর রক্ষা এবং পুষ্টির সকল উপাদানই সংগৃহীত হয় খাদ্য হইতে। তাই খাদ্য না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। খাদ্য না পাইলে মানুষ সুস্থ এবং কর্মক্ষম থাকিতে পারে না। খাদ্যোপাদান হইতেই দেহোপাদান প্রস্তুত হয়। খাদ্য প্রাত্যহিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিয়া শরীরকে সক্ষম রাখে। আবার খাদ্যই শরীরকে রোগের হাত হইতে রক্ষা করে। অনাহারে দীর্ঘদিন থাকিলে মানুষ দুর্বল হইয়া পড়ে। কোন কাজই সে করিতে পারে না। খাদ্যই মানুষকে শক্তি যোগায়। শারীরিক প্রক্রিয়া-গুলিও খাদ্যের বিশেষ উপাদান (ভিটামিন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই খাদ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উপাদানের অভাব হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শরীরে নানাবিধ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব বলা যাইতে পারে যে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। খাদ্যের অভাব ঘটিলে কর্মচাঞ্চল্য, শরীরের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জীবনের কোন ধর্মই সাধিত হইতে পারে না।

খাদ্যের কাজ
(Functions of Food)

দেহযন্ত্রটিকে সুস্থ সবল এবং কর্মক্ষম রাখার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সবই খাদ্য যোগায়। তবুও উহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) শরীর পুষ্টির কাজ বা nutritive function।

(২) শরীর রক্ষার কাজ বা protective function।

(১) শরীর পুষ্টির কাজ তিনটি—তাপ উৎপাদন, দেহের ক্ষয়পূরণ, এবং পুষ্টিসাধন॥

(২) শরীর রক্ষার কাজও তিনটি—রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়া রোগের হাত হইতে দেহযন্ত্রকে রক্ষা করা, দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, এবং ক্লেদ নিঃসরণ করা।

শরীর গঠন—খাদ্যোপাদান হইতেই দেহোপাদান প্রস্তুত হয়। মানবশিশুটি যখন জন্মায় তখন তাহার শরীরের ওজন থাকে ৩/৩½ কিলোগ্রাম। আর যখন ঐ শিশুটি পূর্ণবয়স্ক যুবকে পরিণত হয়, তখন তাহার শরীরের ওজন হয় ৬৮ কিলোগ্রাম। শিশুটির শরীরের অস্থি, মেদ, মজ্জা, রক্ত, মাংস প্রভৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই শিশুর শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়। আর ঐ সকল দেহোপাদান তৈয়ারী হয় খাদ্য হইতে। ইহার কারণ যে সকল উপাদান দ্বারা মানবদেহ গঠিত সেই সকল উপাদান দিয়াই খাদ্যদ্রব্যগুলি তৈয়ারী ; কেবল উপাদানগুলির অনুপাতের তারতম্যের জন্য দুইটি রূপগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই খাদ্য দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর যখন বিশ্লিষ্ট হইয়া মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়, তখন ঐ সকল প্রাথমিক উপাদানের (elements) সাহায্যেই দেহের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সৃষ্টি হয়। তাই যে শিশুটি খাদ্য কম পায় সে শীর্ণ হয় এবং তাহার শরীরের ওজন ঠিক মতো বৃদ্ধি হয় না। একই মায়ের দুইটি সন্তানকে যদি স্বতন্ত্রভাবে রাখা যায় এবং একটিকে কম খাদ্য এবং অপরটিকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে প্রথম সন্তান অপেক্ষা দ্বিতীয়টির বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। বৈজ্ঞানিকগণ ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া এই সত্য বহুবার প্রমাণ করিয়াছেন।

ক্ষয়পূরণ—শরীর একটি বিরাট যন্ত্রের মতো। একটি যন্ত্র নিয়মিত চলার ফলে যেমন উহার বিভিন্ন অংশ ক্ষয় হইয়া যায়, অকেজো হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়, শরীর-রূপ যন্ত্রটিরও সেইরূপ ক্ষয় হয়। উহার বিভিন্ন অংশের কোষগুলি ভাঙিয়া যায়। যন্ত্রের ন্যায় শরীর-যন্ত্রটিকে চালু রাখিবার জন্য ঐ সকল ক্ষয়িত অংশের মেরামতের প্রয়োজন হয়। খাদ্য দ্বারাই ঐ মেরামতের কাজ হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু দেহযন্ত্রটি সচল থাকার জন্য শরীরের ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আবার কোন কারণে যদি ব্যাধির দ্বারা শরীর আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষয় এত বেশী হয় যে তাহা পূরণের জন্য প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। শিশুর ক্ষেত্রে ক্ষয়পূরণ এবং শরীরের বৃদ্ধি উভয় কার্যের জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

তাপ উৎপাদন—জীবন্ত মানবদেহ উত্তপ্ত এবং কর্মচঞ্চল; আর ইহাই জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। শরীরকে সচল ও উত্তপ্ত রাখিবার জন্য তাই প্রয়োজন হয় শক্তি (energy) এবং উত্তাপ (heat)। খাদ্য হইতেই শক্তি প্রস্তুত ও সঞ্চিত হয়। উত্তাপ দ্বারা শরীরটি উষ্ণ থাকে। আর শক্তি দ্বারা দেহযন্ত্র ও পেশীগুলি সঞ্চালিত হয়। খাদ্য শরীরে প্রবেশ করিবার পর কোষমধ্যে যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ঐ উত্তাপ হইতেই কর্মশক্তি বা energy তৈয়ারী হয়। খাদ্যের অভাব হইলে তাই মানুষ দুর্বল হইয়া পড়ে।

শরীর রক্ষা—খাদ্য পানীয় প্রশ্বাস-বায়ু প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রতিনিয়ত অসংখ্য রোগজীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং দেহযন্ত্রগুলিকে আক্রমণ করে। শরীরের মধ্যে ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উপযোগী শক্তি থাকে। আর সেইজন্যই অধিকাংশ সময় মানুষ সুস্থ শরীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়। খাদ্যোপাদান দ্বারাই ঐ রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা তৈয়ারী হয়। তাই মানুষ যদি ঠিকমতো খাদ্য না পায়, তাহা হইলে ক্রমে সে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অতি সহজে রোগাক্রান্ত হয়।

দেহ-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন (আর্দ্র বিশ্লেষণ) হয় এবং

পরে পুনরায় উহাদের যে রাসায়নিক সংশ্লেষণ ঘটে, তাহার ফলে শারীরিক উপাদান তৈয়ারী হয়। আবার খাদ্য যখন জারিত (oxidised) হইয়া তাপ উৎপাদন করে তখনও খাদ্যের বা খাদ্যোপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই সকল রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য যে সকল সংঘটক (enzyme and co-enzyme) প্রয়োজন হয়, সেগুলি প্রস্তুত হয় বিশেষ বিশেষ খাদ্যোপাদান হইতে। তাই খাদ্যে ঐ উপাদানগুলির অভাব হইলে শরীরের অভ্যন্তরে ঐ সকল ক্রিয়া ঠিকমতো চলিতে পারে না এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলা (functional disorder) দেখা দেয়। তাহার ফলে শরীরে নানা-প্রকার অভাবজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। রিকেট, বেরিবেরি, স্কার্ভি ইত্যাদি রোগগুলি এইভাবেই বিশেষ বিশেষ খাদ্যের অভাবে হইয়া থাকে।

ক্লেদ নিঃসরণ—পূর্বোক্ত উপায়ে যখন শরীরে রাসায়নিক পরিবর্তন-গুলি হইতে থাকে তখন কিছু বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন—শরীরে তাপ উৎপন্ন হইবার সময় জলীয় বাষ্প (H_2O) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) তৈয়ারী হয়; শরীরের গঠন এবং ক্ষয় পূরণের সময় ইউরিক অ্যাসিড, পিউরিন বডিস্ ইত্যাদি কতকগুলি অম্ল পদার্থ উৎপন্ন হয়। প্রস্রাব, ঘর্ম এবং নিঃশ্বাসের সহিত উহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। প্রস্রাব, ঘর্ম ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য প্রচুর জলীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। জল ও জলীয় খাদ্যের অভাব হইলে শরীর হইতে ঐ সকল ক্লেদ ঠিকভাবে বাহির হইতে পারে না। ফলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

রন্ধনশালা ও উহার সরঞ্জাম বিন্যাস

রন্ধনশালা গৃহিণীর অন্যতম কর্মক্ষেত্র। বুদ্ধিমতী গৃহিণী রন্ধনশালাকে শিল্পীর শিল্পাগারের মতো করিয়া ব্যবহার করেন। উহার সুচারু বিন্যাস দ্বারা যেমন গৃহিণীর শ্রমলাঘব হয় এবং সময় সংক্ষেপ হয়, অপরদিকে তেমনি উহার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা গৃহ-স্বাস্থ্য রক্ষা পায়। তাই আদর্শ রন্ধনশালা পরিকল্পনার সময় দুইটি কথা চিন্তা করিতে হয়—(১) পরিচ্ছন্নতা, (২) আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির সুচারু বিন্যাস।

(১) **পরিচ্ছন্নতা**—রন্ধনশালা বড় রাস্তা এবং নরদামা হইতে দূরে

করিতে হইবে। বড় রাস্তায় অত্যধিক গাড়ীঘোড়া চলে। ফলে প্রচুর ধূলা উড়িয়া আসে। বড় নরদামা হইতে দুর্গন্ধ আসে ও মাছির উপদ্রব হয়।

রান্নাঘরের দেওয়াল, মেঝে ও জানালা-দরজায় এমন কোন ফাটল বা গর্ত থাকিবে না যে স্থানে আরশুলা বা ইঁদুর বাস করিতে পারে। যাহাতে ধূলাবালি জমিতে না পারে তাহার জন্য রন্ধন-গৃহের জানালা-দরজা এবং দেওয়াল যতদূর সম্ভব মসৃণ করিতে হইবে।

রান্নাঘরের মেঝে পাকা এবং নরদামার দিকে ঢালু করিতে হইবে। কারণ এরূপ মেঝে ধুইয়া পরিষ্কার করা সহজ।

ধোঁয়া এবং উত্তাপ নির্গমনের জন্য চিমনি বসাইতে হইবে। ন্যূনপক্ষে উনুনের উপরে দেওয়ালের মাথায় বড় বড় ভেন্টিলেটার রাখিতে হইবে।

রান্নাঘরে একটি নরদামা থাকিবে এবং ঐ নরদামা বাড়ীর বড় নরদামার সহিত যুক্ত হইবে। নরদামার মুখে ঝাঁঝরি লাগানো থাকিবে। তাহা না হইলে নরদামার মধ্য দিয়া বিড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে।

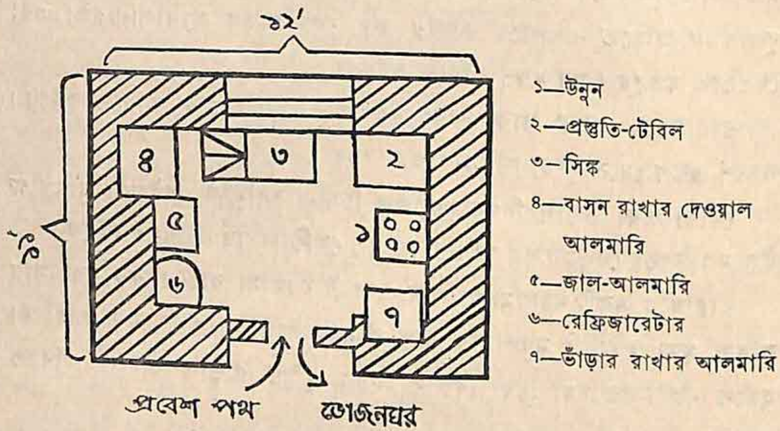
মাছি বা অন্য কোন কীট-পতঙ্গ যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য রান্নাঘরের দরজা ও জানালায় মিহি জাল লাগানো উচিত। ইহা ভিন্ন রান্নাঘরে আলো ও জলের সুবন্দোবস্ত অবশ্যই থাকিবে।

(২) আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের বিন্যাস—প্রত্যেক রন্ধনশালাতেই উনুন অবশ্য প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন রন্ধনের বাসনপত্র, তৈল-মশলাদি রাখিবার তাক, রান্নাকরা খাদ্য রাখিবার জন্য জাল-আলমারি, জলের পাত্র বা কল প্রয়োজন হয়। এই সকল জিনিস ঠিকভাবে সাজাইতে পারিলে গৃহিণীর বহু শ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়। এইজন্য প্রথম হইতেই পরিকল্পনা করিয়া সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং বিন্যাস করা উচিত।

সরঞ্জাম সংগ্রহ—সরঞ্জাম সংগ্রহের সময় যেগুলি কাজে লাগিবে সেই-গুলিই মাত্র ক্রয় করিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিলে কেবল অর্থব্যয়ই হয় না, ঐগুলি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শ্রম ও সময় নষ্ট হয়।

বেশী প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্রথমে সংগ্রহ করিতে হয়। কম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পরে কিনিলেও চলে।

সরঞ্জাম বিন্যাস—প্রথমতঃ, জিনিসপত্র ক্রয় করিবার পর উহাদের এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনের সময় স্বল্পতম পরিশ্রমে উহাদের হাতের কাছে পাওয়া যায়। জিনিসপত্র ব্যবহারের সময় চলাফেরা যত কম করিতে হয় পরিশ্রমও তত কম হয়।



চিত্র নং—৪২ : আদর্শ রন্ধনশালা

দ্বিতীয়তঃ, যে কাজের জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন সেই কাজের জায়গায় সেই জিনিসটি রাখিতে হইবে। অযথা অন্য জিনিসের ভীড় বাড়াইলে কাজের জিনিসগুলি খুঁজিয়া পাইতে দেরি হয়। যেমন রন্ধনশালায় বাড়তি বাসনপত্র রাখিলে কাজের অসুবিধা হয়। বরং সেগুলি অন্যত্র তুলিয়া রাখিলে পরিষ্কার থাকে।

তৃতীয়তঃ, রন্ধনশালায় দুই প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়—(১) স্থায়ী—যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে সরানো যায় না, যেমন—উনুন, জলের সিঙ্ক, আলমারি বা তাক, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি। (২) অস্থায়ী —যাহা ইচ্ছামতো সরানো যায়।

স্থায়ী জিনিসগুলি রাখিবার সময় যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। ঐগুলি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যেখানে প্রচুর আলো-বাতাস আসে। উহাদের উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে কাজের সুবিধা হয় এবং পরস্পরের দূরত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। যেমন—জানালার ঠিক নীচে জলের ব্যবস্থা থাকিলে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে উনুন থাকা উচিত। উনুনের

পরেই মশলা এবং বাসনের তাক থাকিবে। তাকগুলি দেওয়ালের গায়ে হইলে মেঝেতে প্রচুর জায়গা থাকে। কাজের প্রস্তুতি-টেবিলখানি উনুনের নিকট থাকিবে। ছোট ছোট জিনিসগুলিও প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাইতে হয়। যেমন—উনুনের পাশে যে সেলফ্‌ (shelf) থাকিবে তাহাতে কড়াই, খুন্তি, সাঁড়াশি, হাঁড়ি, ডেকচি প্রভৃতি রন্ধন-পাত্র থাকিবে। তাহার পরের তাকে মশলার শিশি ও কৌটাগুলি সাজানো থাকিবে। আলমারির তাকগুলি খুব চওড়া হওয়ার পরিবর্তে সরু ও সংখ্যায় অধিক হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে কৌটা শিশি এক সারিতে সাজানো যায় এবং সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আলমারিগুলির নীচের অংশে ড্রয়ার থাকিলে ভাল হয়। যেগুলির নিত্য প্রয়োজন নাই সেইগুলি ঐখানে রাখা যায়। আলমারিগুলিতে পাল্লা লাগানো থাকিবে; বিশেষ করিয়া যে সকল রন্ধনশালায় ধুলা-বালি প্রবেশের সম্ভাবনা অধিক, সেই সকল রন্ধনশালায় অবশ্যই পাল্লা-লাগানো আলমারি থাকা উচিত।

রন্ধনশালায় জলের ব্যবস্থা জানালার ঠিক নীচে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সিঙ্ক হইলে মেঝে হইতে ১ মি. উঁচুতে হইবে। উহা ১৭ হইতে ২২ সে. মি. গভীর হইবে। সিঙ্কটি চীনামাটি অথবা সিমেন্ট বা অ্যাস্‌বেস্‌টসের হইতে পারে। সিঙ্কের পরিবর্তে সিমেন্টের গাঁথা চৌবাচ্চাও করা যাইতে পারে। জল নিকাশের জন্য উহাতে একটি ছোট গর্ত থাকিবে।

রন্ধনশালার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

রন্ধনশালায় তিন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে—(১) পুড়িয়া যাওয়া, (২) কাটিয়া যাওয়া, (৩) আছাড় খাইয়া বা পা পিছলাইয়া আহত হওয়া।

(১) **পুড়িয়া যাওয়া**—মানুষ রান্নাঘরে দুই উপায়ে পুড়িয়া যাইতে পারে। রান্নাঘরে আগুন লাগিয়া যাওয়ার ফলে সেখানে যাহারা থাকে তাহারা তো পুড়িয়া যায়ই, তা ছাড়া বাড়ীর অন্যান্য অংশেও আগুন ছড়াইবার ফলে আরও অনেকে পুড়িয়া যাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে খড়ের বা নীচু চালের গোলপাতার রান্নাঘরেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। পাকা রান্নাঘরে রন্ধনকারিণীর শাড়ীর আঁচল ধরিয়া যাইতে পারে

অথবা তেল জ্বলিয়া গিয়া বা তেল ছিটকাইয়া দেহের অংশবিশেষ পুড়িয়া যাইতে পারে। সেজন্য আঁটসাঁট পোশাক পরিয়া রান্না করা উচিত এবং গরম তেলে সাবধানে মাছ-তরকারি ছাড়া উচিত।

পুড়িয়া যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ, অনেক সময় উত্তপ্ত তরল পদার্থ অসাবধানে বা হাত ফসকাইয়া পড়িয়া যায়। এরূপ প্রায়ই ঘটে। গরম ফেন, গরম জল, গরম তরকারি হাতে পায়ে পড়িয়া গেলে পুড়িয়া যায়। এজন্য রন্ধনকারিণীর সাবধান হওয়া উচিত।

(২) কাটিয়া যাওয়া—রান্নাঘরে ধারাল বঁটি, কাটারি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। কাঁচের শিশি-বোতল ও টিনের কৌটাও থাকে।

তরকারি বা মাছ কাটিবার সময় তাড়াতাড়িতে বঁটি-কাটারিতে হাত হামেশাই কাটে। তাছাড়া এগুলি এখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখিলে যে কোন ব্যক্তির হাত-পা কাটিতে পারে। বিশেষ করিয়া, শিশুদের নাগালের মধ্যে এগুলি থাকিলে দুর্ঘটনা ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। তেমনই ধারাল টিন বা ভাঙা টিনের কৌটাতেও হাত-পা কাটিতে পারে। কাঁচের বাসন বা শিশি-বোতল ভাঙিয়া হাত কাটিতে পারে এবং পায়ে ফুটিয়া রক্তপাত হইতে পারে। ভাঙা জিনিস ব্যবহার করিতে নাই এবং কাঁচের জিনিস শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখিতে হয়। কাঁচের জিনিস ভাঙামাত্র ফেলিয়া দিতে হয়।

(৩) পতনের ফলে দুর্ঘটনা—ভাতের ফেন, তেল, জল, তরকারির খোসা মাটিতে পড়িলে, তাহার উপর পা পড়িয়া পা পিছলাইতে পারে। উহার ফলে হাত-পা ভাঙা বা মাথা ফাটা আশ্চর্য নয়। এই দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য রান্নাঘরের মেঝে সকল সময় পরিষ্কার রাখা দরকার। তাছাড়া রান্নাঘরের মেঝেটি খুব মসৃণ করা উচিত নয়। খসখসে মেঝেতে পা পিছলানোর ভয় অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

এইগুলি হইল সাধারণ দুর্ঘটনা। ইহা ভিন্ন যে সকল রন্ধনশালায় ইলেকট্রিক বা গ্যাসের চুল্লী ব্যবহৃত হয় সেখানে ইলেকট্রিক শক লাগিবার ভয় থাকে এবং গ্যাস পাইপের বিষাক্ত গ্যাস বাহির হইয়া স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। ঐ গ্যাস নাসাপথে বেশী প্রবেশ করিলে জ্ঞান লোপ পায়।

এজন্য ইলেকট্রিক উনুনে কাজ করিবার সময় ঠিক মতো সুইচ বন্ধ করিতে

হয় এবং একটি কাঠের পাঠাতনে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়। কাজের পর গ্যাস পাইপের চাবিটি ঠিকমতো বন্ধ করিতে হয়। পাইপগুলি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় কোথাও কোনরূপ ছিদ্র হইয়াছে কিনা।

রন্ধনের বাসনপত্র
(Cooking Utensils)

রন্ধনশালায় দুইটি কারণে বাসনের প্রয়োজন হয়—(১) রন্ধন করিবার জন্য এবং (২) রান্না-করা জিনিস ঢালিবার জন্য ও পরিবেশন করিবার জন্য। অতএব যখনই রন্ধনশালার জন্য বাসন সংগ্রহের প্রশ্ন আসিবে তখনই দেখিতে হইবে যে ঐগুলি উক্ত দুইটি উদ্দেশ্যের যে কোনটির উপযোগী কিনা। অপ্রয়োজনীয় বাসন সস্তা বা সুন্দর বলিয়া কখনও ক্রয় করা উচিত নয়। উহাতে অযথা স্থান ও অর্থের অপচয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বাসনপত্রের মধ্যে যেগুলিতে রান্না করা হইবে, বিশেষ করিয়া সেগুলি যেন যথেষ্ট মজবুত হয়। উত্তাপ ও বাষ্পের চাপই কেবল ইহাদের সহিতে হয় না, নিয়মিত ঘষা-মাজা করার জন্যও প্রচুর ক্ষয় হয়। তাই মোটা মজবুত ধাতুর পাত্র না হইলে ফুটা হইয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, রান্নার বাসনগুলির ধাতু এমন হইবে যাহাতে ক্ষার বা অম্লের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে না। এই দিক দিয়া স্টীল কিংবা এনামেল-করা লোহ, তাম্র বা পিতলের বাসন ভাল। অ্যালুমিনিয়াম, পিতল ও তামার বাসনে কোন প্রকার তরকারি রান্না না করাই উচিত। কারণ ঐ সকল ধাতুতে অম্ল এবং ক্ষারের প্রতিক্রিয়া হয়। (১৩৭ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।)

চতুর্থতঃ, রন্ধন-পাত্রের ধাতু এমন হইবে যাহা সহজে উত্তপ্ত হয় এবং বহুক্ষণ উত্তাপ ধরিয়া রাখিতে পারে। উপরিভাগ উজ্জ্বল হইলে তাপ বিচ্ছুরণ দ্রুত হয়, তাই রন্ধন-পাত্রের বহির্ভাগ উজ্জ্বল হইবে না, কিন্তু ভিতরের অংশ উজ্জ্বল ও মসৃণ হওয়া দরকার। ভিতরের অংশ খাদ্যের সংস্পর্শে থাকে, তাই পাত্রের তাপ দ্রুত খাদ্যে সঞ্চালিত হইলে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। এজন্য যে কোন ধাতুর মোটা পাত্র উপযোগী। তবে ভিতরের অংশ অবশ্যই নিকেল-করা হওয়া চাই। তামার রন্ধন-পাত্র সর্বাপেক্ষা মজবুত, কিন্তু ইহার

দাম বেশী। এনামেল ও পিতলের পাত্রের উপরিভাগ অতি মসৃণ এবং উজ্জ্বল, তাই উহাতে তাপের অপচয় ঘটে। লোহার পাত্র বা স্টেনলেস স্টীলই রন্ধন-কার্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। স্টেনলেস স্টীলে কোনরূপ এনামেল করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লোহার পাত্রের ভিতরের অংশ নিকেল করিতে হইবে। ইহার বহির্ভাগ অস্বচ্ছ এবং কালো বলিয়া উত্তাপ অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। মাটির পাত্রেও রন্ধন করা যাইতে পারে। ইহার দাম কম এবং উত্তাপ অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু ইহা সহজে ভাঙিয়া যায়, উত্তপ্ত হইতে দেরি হয় এবং পরিষ্কার রাখাও সম্ভব হয় না। তাই আজকাল মাটির পাত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

আজকাল তাপসহ কাঁচের বাসনও (heat-proof glass) পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের দাম বেশী এবং ভঙ্গুর বলিয়া আমাদের দেশে এ-সবের খুব বেশী ব্যবহার নাই। নতুবা সবদিক দিয়া এরূপ পাত্র রন্ধনের বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চমতঃ, রন্ধন-পাত্র বা রন্ধনশালায় ব্যবহারের বাসনগুলি এমন হইবে যাহা সহজে পরিষ্কার করা যায়। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তাই সব সময় রন্ধন-পাত্রগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। উহাতে ময়লা থাকিলে ঐ পাত্রের খাদ্যও দূষিত হয়। তাই যে সকল ধাতুর বাসন সহজে পরিষ্কার করা যায় সেই সকল ধাতুর বাসন ক্রয় করিতে হইবে। বাসনগুলিতে কোনপ্রকার খাঁজ, বর্ডার, নকশা থাকিবে না, ধার ও জোড়-গুলি গোল এবং মধ্যভাগ মসৃণ হইবে। আগের দিনের পিতল-কাঁসার বাসন পরিষ্কার করা যেমন অসুবিধা, উহাদের গায়ের নকশার মধ্যে ময়লা জমিয়া থাকিবার সম্ভাবনাও তেমনি বেশী। তাই পিতল, কাঁসা, তামা, লোহার বাসনের পরিবর্তে স্টেনলেস স্টীল, তাপসহ কাঁচ, এনামেল-করা বাসন বা ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-করা বাসন ব্যবহার করা সুবিধাজনক। জার্মান অ্যালুমিনিয়াম, রুপার বাসনও ভাল। তবে রুপার দাম বেশী বলিয়া একমাত্র ছুরি, কাঁটা, চামচ ছাড়া রুপার অন্য বাসন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। অ্যালুমিনিয়াম খুব পাতলা হয় বলিয়া অল্পদিনে নষ্ট হইয়া যায়। নকশাবিহীন অ্যালুমিনিয়ামের বাসন রন্ধন ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, রন্ধন-পাত্রগুলির গঠন যেন উনানের উপযোগী হয়। অধিকাংশ

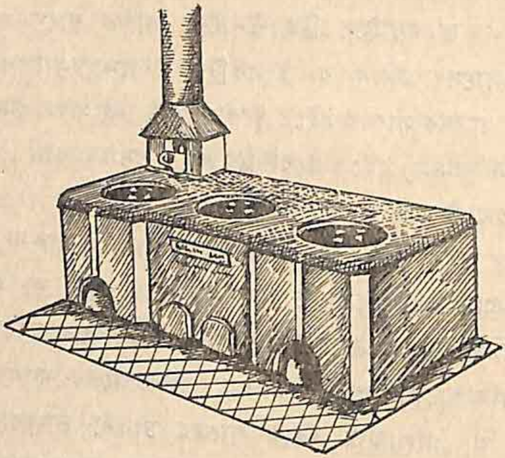
হাঁড়ি, ডেকচি কিংবা কড়াইয়ের তলদেশ গোল হয়। কয়লার বা কাঠের উনানে এরূপ পাত্র বসাইলে ঠিক উনানের সহিত খাপে খাপে বসিয়া যায়। কিন্তু গ্যাসের উনান বা ইলেকট্রিক উনানে বসাইলে তলদেশের অধিকাংশটাই তাপের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এই সকল উনানে পাত্রের তলদেশ চেপটা (flat) হইলে তবেই ঠিকভাবে উনানে বসে। তাই যেরূপ উনান সেই অনুযায়ী রন্ধন-পাত্রের গঠন হওয়া প্রয়োজন।

সপ্তমতঃ, পাত্রের মুখটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ঢাকনা খাপে খাপে বসিয়া যায়। প্রত্যেকটি পাত্রের ঢাকনা থাকিবে। তাহা না হইলে বাষ্প বাহির হইয়া গিয়া কেবলমাত্র যে খাদ্যদ্রব্যগুলি সিদ্ধ হইতে দেরি হইবে তাহা নয়, বহু মূল্যবান খাদ্যোপাদানও নষ্ট হয়। রন্ধন-পাত্রের কানা বা মুখের অংশটি মসৃণ ও গোলাকার হইলে পাত্রের ঢাকনা ভালভাবে পড়িবে, তরকারি নাড়িতে সুবিধা হইবে এবং ময়লা জমিবারও ভয় থাকিবে না।

চুল্লী ও জ্বালানি

চুল্লী বা উনুন—উনুন কয়লা, কাঠ, তৈল, বিদ্যুৎ অথবা গ্যাসের হইতে পারে।

কয়লার উনুন—মাটি দিয়া তৈয়ারী। ইহার তিনটি অংশ। উপরে রন্ধন-পাত্র বসাইবার জন্য ঝিঁক, কয়লা ঘুঁটে দিবার জন্য শিক লাগানো গহ্বর, নিম্নে বায়ু প্রবেশের জন্য গহ্বর। আজকাল ধোঁয়াবিহীন চুল্লীও প্রস্তুত হয়। সাধারণ মাটির উনুনের পিছন দিকে দেওয়ালে একটি গর্ত থাকে; গর্তের সহিত একটি ধূম-নির্গমন চিমনি থাকে। চিমনিটি দেওয়ালের পশ্চাতে থাকে। উনুনের দিকে গর্তের যে মুখটি থাকে তাহাতে একটি ছোট কপাট লাগানো থাকে। উনুন ধরাইবার সময় ছোট কপাটটি খুলিয়া দিয়া উনুনের মুখ ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলে ধূম ঘরের মধ্যে বাহির না হইয়া গর্ত দিয়া চিমনিতে প্রবেশ করে এবং উপর দিয়া বাহির হইয়া যায়। আজকাল বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ধূমহীন চুলারও প্রচলন হইয়াছে। ইহা তৈয়ারী অবস্থায় বিক্রয় হয়। কোম্পানীকে খবর পাঠাইলে তাহারা আসিয়া বসাইয়া দিয়া যায়। ইহাদের আগুন ইচ্ছামতো কমানো বা বাড়ানো যায় এবং সেঁকা, ঝলসানো প্রভৃতি পদ্ধতিতেও রন্ধন করা যায়।



চিত্র নং—৪৩ : ধূমহীন উনুন

কাঠের উনুন—মাটির তৈয়ারী এই উনুনের দুইটি অংশ থাকে—উপরের ঝিঁক এবং কাঠ দিবার জন্য গর্ত ও উনুনের গহ্বর।

গ্যাসের উনুন—গ্যাসের উনুন বা স্টোভ ছোট-বড় নানারূপ হইতে পারে। ইহার প্রধানতঃ দুইটি অংশ। গ্যাস রিঙ আর উনুনের স্টীলের বডি। স্টীল বডির ভিতর গ্যাস-রিঙ থাকে। উনুনটি গ্যাস-পাইপ অথবা গ্যাস-সিলিণ্ডারের সহিত যুক্ত থাকে। সংযোগ-স্থলে একটি চাবি থাকে। ইহা ঘুরাইয়া গ্যাস সরবরাহ কমানো বা বাড়ানো অথবা বন্ধ করা যায়। বড় গ্যাস-উনুনের ভিতর দিকে সেঁকিবার বা ঝলসাইবার ব্যবস্থা থাকে। তাই এই উনুনে সর্বপ্রকার রন্ধন-পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। আগুন কমানো বা বাড়ানো যায় বলিয়া রন্ধনের সুবিধা হয়, তাপ অপচয় হয় না। রন্ধনশালাও পরিষ্কার থাকে।

বৈদ্যুতিক উনুন—ইহার গঠন গ্যাসের উনুনের মতো হইতে পারে। আবার ছোট হিটারও হইতে পারে। হিটারে গ্যাস-রিঙের পরিবর্তে ইলেকট্রিক কয়েল বা সরু তার পাকানো অবস্থায় থাকে। ঐ তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ ইহা রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয় না, অল্পস্বল্প কিছু প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। প্লেট টাইপ কুকিংরেঞ্জই

রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয়। উক্ত রেঞ্জে স্টীলের বডির মাঝখানে একটি মোটা লোহার পাত বসানো থাকে। উহার তলায় ইলেকট্রিক এলিমেন্ট থাকে এবং উহার সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত থাকে। ঐ এলিমেন্টের সাহায্যেই পাতটি গরম হয়। গরম পাতের উপর রন্ধন-পাত্র রাখিয়া রান্না করা হয়। এই ধরনের উনুনে আগুন কমানো বা বাড়ানোরও ব্যবস্থা থাকে। গ্যাস স্টোভের মতোই ইহা সুবিধাজনক। এছাড়া জল গরম করিবার জন্য ইমার্শান হিটার ব্যবহার হয়।

কেরোসিনের উনুন—কেরোসিন তৈলের স্টোভও উনুনের কাজ করে। কেরোসিনের স্টোভ দুই প্রকার—পাম্প করা এবং পাম্পবিহীন। পাম্প করা স্টোভগুলির বডি পিতলের হইত, কিন্তু আজকাল যে সকল স্টোভ বাহির হইয়াছে তাহার বডি টিনের অথবা গ্যালভানাইজড শিটের। গ্যাসের উনুনের অনুকরণে আজকাল বড় কেরোসিনের 'কুকিংরেঞ্জ'ও প্রস্তুত হইতেছে। গ্যাস-সিলিণ্ডারের পরিবর্তে একটি তৈলাধারের সহিত ইহা যুক্ত থাকে। আগুন কমাইবার অথবা নিভাইবার জন্য চাবি থাকে।

জ্বালানি—যে সকল বস্তুর দহনে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাদের জ্বালানি বলে। কার্বনই হইল তাহাদের মূল উপাদান। এইজন্য অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিবামাত্র উহারা সহজেই জ্বলিয়া উঠে। ঐ সকল জিনিস আলো জ্বালাইবার জন্য এবং রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জ্বালানিগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও বৈদ্যুতিক জ্বালানি। তাহার মধ্যে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় জ্বালানি দহনক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন করে। কিন্তু বৈদ্যুতিক জ্বালানি ঐভাবে তাপ উৎপন্ন করে না। বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(১) **কঠিন জ্বালানি**—ইহা দুই প্রকার—কাঠ ও কয়লার জ্বালানি। এছাড়া ঘুঁটে, কাগজ প্রভৃতি কাঠ ও কয়লা ধরাইবার জন্য প্রয়োজন হয়।

কাঠ ঃ কাঠের রাসায়নিক উপাদান হইল কার্বন ৫০%, হাইড্রোজেন ৬%, এবং অক্সিজেন ৪০%। প্রতি কিলোগ্রাম শুষ্ক কাঠ হইতে ১৫০ ক্যালরি পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।

কয়লা ঃ বায়ুর অনুপস্থিতিতে কাঁচা কয়লা পুড়াইয়া কোক প্রস্তুত করা

হয়। কোক কয়লা আমরা উনুন জ্বালাইতে ব্যবহার করি। ইহা একটি জৈব পদার্থ। ইহাতে আছে কার্বন (৮৫%)। এছাড়া হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনও আছে। প্রতি কিলোগ্রাম কয়লা হইতে ৩০০০-এর অধিক ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া যায়।

(২) **তরল জ্বালানি**—স্পিরিট এবং কতকগুলি খনিজ তৈল এই শ্রেণীতে পড়ে; যেমন—পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে পেট্রোল গাড়ী চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্পিরিট অত্যন্ত দামী বলিয়া রন্ধনের জন্য বিশেষ ব্যবহার হয় না। কিন্তু কেরোসিন সহজলভ্য, তাই ইহাই রন্ধনের জন্য বেশী ব্যবহৃত হয়। আলো জ্বালাইবার জন্যও ইহা গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

কেরোসিন ঃ খনিজ তৈল হইতেই কেরোসিন প্রস্তুত হয়। বায়ুরুদ্ধ পাত্রে ১৫৪°—৩০০°C উত্তাপে খনিজ তৈল উত্তপ্ত করিলে কেরোসিন উৎপন্ন হয়। ইহা মূলতঃ হাইড্রোকার্বন হইলেও 'ট্রাইগ্লিসারাইড' নহে অর্থাৎ ইহার রাসায়নিক উপাদান তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড (মেদাম্ল) ও একটি গ্লিসিরল নহে। ইহাতে কার্বন অধিক পরিমাণে (৫৪%) থাকে বলিয়া ইহা অতি সহজেই জ্বলিয়া উঠে।

(৩) **গ্যাসীয় জ্বালানি**—কোল গ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস এবং উদক গ্যাস—এই তিনটি গ্যাস সাধারণতঃ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়। সব কয়টিই কয়লা হইতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। উহাদের উপাদান প্রধানতঃ হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনোক্সাইড। এ ছাড়া মিথেন, অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন ইত্যাদিও থাকে। উদক গ্যাসে বিষাক্ত কার্বন-মনোক্সাইডের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া ইহার তাপ-উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ উদক গ্যাস ব্যবহার করা হয় না; কোল গ্যাসের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। শহরাঞ্চলে ইহা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক জ্বালানি ঃ বৈদ্যুতিক শক্তিকে আজকাল রন্ধনের জন্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা দহন-ক্রিয়াজনিত নহে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করা হয়।

বিভিন্ন জ্বালানির সুবিধা ও অসুবিধা

রন্ধনের জন্য যে সকল জ্বালানি ব্যবহার হয়, তাহাদের সুবিধা-অসুবিধার

কথা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি দিক দেখিতে হয়। যেমন—(১) উহাদের তাপ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা, (২) সহজদাহ্যতা, (৩) তাপ অপচয়, (৪) ধোঁয়া এবং ছাই, (৫) ব্যবহারের সুবিধা, এবং (৬) সহজলভ্যতা ও খরচ।

(১) তাপ উৎপাদন—তাপ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে কাঠ অপেক্ষা সম-পরিমাণ কয়লা হইতে অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়। আবার সমস্ত তরল জ্বালানি কঠিন জ্বালানি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ উৎপাদন করে।

(২) সহজদাহ্যতা—কয়লা অপেক্ষা কাঠ তাড়াতাড়ি ধরানো যায়। তবে কেরোসিন, গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক উনুন কাঠ অপেক্ষাও কম সময়ে জ্বালানো সম্ভব হয়।

(৩) তাপ অপচয়—তাপ অপচয় নির্ভর করে কিছুটা উনুনের উপর এবং কিছুটা জ্বালানির ধর্মের উপর। কাঠের আগুন ইচ্ছামতো কমানো বা বাড়ানো যায় বলিয়া কয়লা অপেক্ষা কম অপচয় হয়। তৈলজাতীয় জ্বালানি-গুলিতে তাপ অপচয় কঠিন জ্বালানি অপেক্ষা কম হয়। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাপ কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকে, তাই এই দুইটির ক্ষেত্রেও তাপ অপচয় কম হয়।

(৪) ধোঁয়া এবং ছাই—কঠিন জ্বালানি মাত্রেই প্রচুর ধোঁয়া এবং ছাই সৃষ্টি করে। ধোঁয়া এবং ছাই-এর জন্য রন্ধন-কক্ষ এবং বাসনপত্র অপরিষ্কার হয়, রন্ধনকারিণীর স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। তরল, গ্যাসীয় এবং বৈদ্যুতিক জ্বালানিগুলি এই দিক দিয়া সুবিধাজনক। তবে কেরোসিনের উনুন ঠিকমতো না ধরিলে যে গ্যাস ও ধোঁয়া বাহির হয়, তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

গ্যাসীয় জ্বালানিগুলি হইতে ধোঁয়া বাহির হয় না বটে তবে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস কোনক্রমে অধিক বাহির হইলে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হইতে পারে। যেহেতু দহন-ক্রিয়া হয় না সেইজন্য বৈদ্যুতিক জ্বালানি এই দিক দিয়া নিরাপদ। তবে অসাবধান হইলে শক্ লাগিতে পারে।

(৫) ব্যবহারের সুবিধা—কাঠ জ্বালানো সর্বাপেক্ষা সহজ, কিন্তু সর্বক্ষণ জ্বাল দিতে হয় বলিয়া রন্ধনকারিণীর প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কয়লার

উনুন ধরানো অতটা সহজ নয়। ইহা শিখিতে হয় কিন্তু বসিয়া জ্বাল দিতে হয় না। অবশ্য কয়লা ভাঙা, ঘুঁটে সংগ্রহ করা প্রভৃতির জন্য কিছু সময় ও শ্রম নষ্ট হয়। এই দিক দিয়া তরল এবং গ্যাসীয় জ্বালানি সুবিধাজনক। একবার দেখিয়া লইলেই যে কেহ জ্বালাইতে পারে। কেরোসিন অপেক্ষা গ্যাস জ্বালানো আরও সহজ, আর বৈদ্যুতিক চুল্লী জ্বালানো সর্বাপেক্ষা সহজ। গ্যাসের এবং বৈদ্যুতিক উনুনে সর্বপ্রকার রন্ধন-পদ্ধতিও অনুসরণ করা যায়। হঠাৎ বিদ্যুৎ বা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেলে গৃহস্থকে অসুবিধায় পড়িতে হয়। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা প্রায়ই দেখা যায়।

(৬) **সহজলভ্যতা ও খরচ**—কাঠ ও কয়লা সস্তা এবং সর্বত্র পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের দেশের শতকরা নব্বইটি গৃহে ইহাদের প্রচলন দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে কয়লা অপেক্ষা কাঠ সুলভ। শহরে কাঠ অপেক্ষা কয়লার দাম কম। আজকাল বাজারে প্রায়ই কেরোসিনের অভাব দেখা যায়, তাই অন্যান্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহার ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দিতেছে। তাছাড়া কেরোসিনে খরচা কয়লা অপেক্ষা অধিক পড়ে। গ্যাস কেরোসিন অপেক্ষা সস্তা কিন্তু খুব বড় শহর ছাড়া গ্যাস পাওয়া যায় না; অবশ্য 'গ্যাস সিলিণ্ডার' পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে খরচ বেশী পড়ে। বিদ্যুতের সরবরাহ গ্যাস অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু ইহাতে কয়লা এবং কাঠ অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী হয়।

রন্ধনের জন্য ওজন করিবার ও মাপ করিবার নিয়ম
[Use of weights and measures required for cooking]

রান্না করিবার সময় বহু উপকরণ মাপ করিয়া লইতে হয়। তাই ওজন করিবার ইউনিট (unit) এবং ওজন করিবার নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাড়ীতে সকল সময় ওজনদাঁড়ি বা পাল্লা-বাটখারা ব্যবহার করা হয় না। কাপ, চামচ, কুনকে বা পালি, গ্লাস—এই সকল জিনিসের সাহায্যে মাপ রাখা হয়।

ওজন—(১) ১ আউন্স = ½ ছটাক = ২৮·৩৫ গ্রাম।

(২) ১ পাউণ্ড = ১৬ আউন্স = ২ কাপ = ৪৫৪ গ্রাম = ½ সের (প্রায়)।

(৩) ১ সের = ৩৩ আউন্স = প্রায় ৯৩০ গ্রাম

(৪) ১ কিলোগ্রাম = ১০০০ গ্রাম = ২·২ পাউণ্ড = ১ সেরের সামান্য কিছু বেশী।

(৫) ১ গ্রাম = ১৫·৪ গ্রেন্‌স্।

উপরোক্ত এককগুলি শুকনা ময়দা, চিনি, চাল প্রভৃতি মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন কাপ, চামচ প্রভৃতিও শুকনা জিনিস মাপিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহারও একটি আনুপাতিক হিসাব আছে; যেমন—

২ টেবিল-চামচ ময়দা = ২৮ গ্রাম (১ আউন্স)।

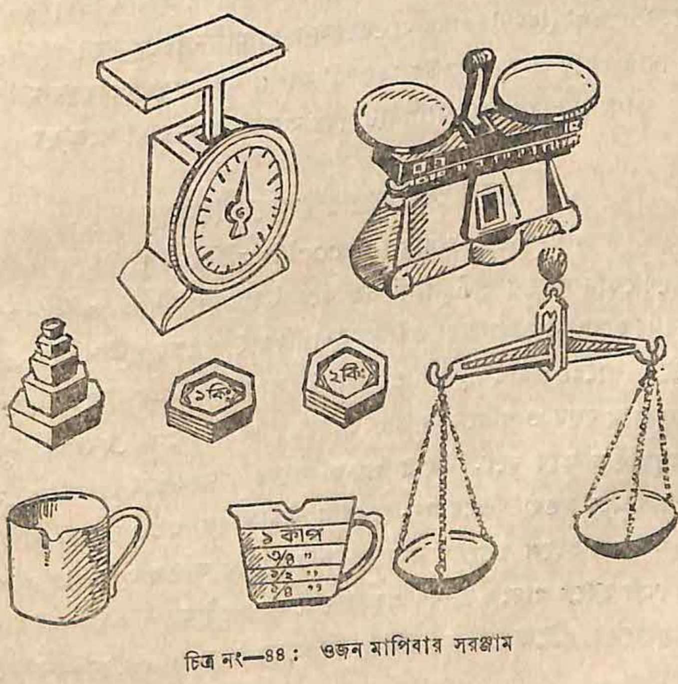
১ টেবিল চামচ চিনি = ২৮ গ্রাম (১ আউন্স)।

১ কাপ জ্যাম বা সিরাপ = ২২৭ গ্রাম (৮ আউন্স)।

১ চায়ের কাপ ময়দা = ২১২ গ্রাম (৪ আউন্স)।

৩ চায়ের চামচ = ১ টেবিল-চামচ। ৪ টেবিল-চামচ = ¼ কাপ।

১৬ টেবিল-চামচ = ১ কাপ।



চিত্র নং—৪৪ : ওজন মাপিবার সরঞ্জাম

তরল পদার্থ মাপিবার একক (unit)—

১। ১ গ্যালন = ৪ কোয়ার্ট = ৮ পাইন্ট = ৫ সের = ৪.৫৫ লিটার।

২। ১ টেবিল চামচ = ২৮ গ্রাম (১ আউন্স)।

৩। ১ চায়ের চামচ = ৬০ ফোঁটা।

৪। ½ কাপ = ১ গিল (gill)।

৫। ৪ গিল = ১ পাইন্ট = ½ কোয়ার্ট = ২ কাপ।

৬। ৪ কাপ = ১ কোয়ার্ট = ২ পাইন্ট।

মাপিবার নিয়ম: শুকনা জিনিস মাপিবার সময় প্রথমে দাঁড়ি ধরিয়া দেখিয়া লইতে হয় দুই দিক সমান আছে কিনা। তারপর একদিকে বাটখারা দিতে হয়, আর এক দিকে চামচ করিয়া শুকনা জিনিস তুলিয়া দিতে হয়। তারপর দাঁড়ির মাঝখানের দড়ি ধরিয়া ওজন করিতে হয়।

কাপ কিংবা চামচের সাহায্যে মাপ করিবার সময়ে প্রথমে ভর্তি করিয়া তুলিতে হয়। তারপর একখানি ছুরি লইয়া চাঁচিয়া ধার বা কানার সমান করিয়া ফেলিতে হয়। কখনও গুঁড়া বা কঠিন জিনিস স্তূপ করিয়া মাপিতে নাই, 'লেভেল' (level) চামচ বা লেভেল কাপ মাপ করিতে হয়। তরল দ্রব্য মাপিবার সময়ে প্রথমে পাত্রটির 'কড়তা' করিয়া লইতে হয়, তারপর মাপিতে হয়। কাপ বা চামচ দিয়া মাপিবার সময় কানায় কানায় মাপিতে হয়।

রন্ধন ও উহার প্রয়োজনীয়তা

[Reasons for cooking food]

যে কোন খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নির্ভর করে উহার পরিপাক ও বিশোষণের উপর। কারণ উক্ত প্রক্রিয়া দুইটির মধ্য দিয়াই খাদ্যের পুষ্টি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। আর দুইটি প্রক্রিয়ারই সাফল্য নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে রন্ধন ও পরিবেশন কার্যের উপর। অতএব রন্ধন কেবলমাত্র গৃহের গতানুগতিক কার্য নহে, উহার গুরুত্ব অনেক। রন্ধনকার্য একদিকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি উহা শিল্পসম্মতও হওয়া উচিত। বিজ্ঞানসম্মত হইলে রন্ধনের সময় ও খাদ্যোপাদান অপচয় হইবে না। আর শিল্পসম্মত হইলে স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি রুচিসম্মত হইবে।

রন্ধনের উদ্দেশ্য—(১) কাঁচা জিনিসের স্বাদ ও গন্ধ রুচিকর নহে।

রন্ধনের ফলে খাদ্যদ্রব্যের উপাদানগুলির পরিবর্তন হয়। কঠিন সম্বদ্ধ গঠন নরম হইয়া যায়, ভিতরের নির্যাস বাহির হইয়া আসে, রং ও গন্ধের উন্নতি ঘটে, কঠিন আবরণ ফাটিয়া ভিতরের শ্বেতসার (starch) গলিয়া যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত ও উপাদেয় হয়।

(২) কাঁচা খাদ্যে নানাবিধ রোগজীবাণু ও পচনকারী জীবাণু থাকিতে পারে। উত্তাপ প্রয়োগের ফলে ঐ সকল জীবাণুর বিনাশ ঘটে। ইহাতে দুইটি উপকার হয়—(ক) খাদ্যদ্রব্য বহুক্ষণ টিকে, এবং (খ) রোগজীবাণুশূন্য বিশোধিত খাদ্য গ্রহণ করা যায়।

(৩) রন্ধনের গুণে খাদ্যদ্রব্য সহজপাচ্য হয়। সুসিদ্ধ হইলে খাদ্যদ্রব্য নরম হয় এবং চিবানো যায়। ভালভাবে চিবাইলে উহাতে জারক রসগুলি যে কেবল প্রবেশ করিতে পারে তাহাই নহে, উত্তাপ প্রয়োগের ফলে খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে—শ্বেতসার আঠাল পদার্থে (dextrin) পরিণত হয়। প্রোটিন খাদ্যের মধ্যে মাছ-মাংসের কোলাজেন তন্তু গলিয়া যায় ; ফ্যাট অ্যামিনো-অ্যাসিড ও গ্লিসিরলে পরিণত হয়—ইত্যাদি। এই অবস্থায় পাচকরসগুলি উহাদের উপর সহজে বিক্রিয়া ঘটাইতে পারে এবং উহাদের কাজও সংক্ষেপ হইয়া যায়।

রন্ধন-পদ্ধতি

[Simple methods of cooking]

রন্ধনের প্রয়োজন আছে ইহা যেমন সত্য, সঠিক পদ্ধতিতে রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা তাহা অপেক্ষা অধিক সত্য। কারণ রন্ধনের উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল করিতে হইলে উহা সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া দরকার।

দুই উপায়ে রান্না করা হয়—(১) শুকনা উত্তাপে এবং (২) জলে সিদ্ধ করিয়া বা ভিজা উত্তাপে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে শুকনা উত্তাপ প্রয়োগ করা যায় ; যেমন—ঝলসানো, সেঁকা ও ভাজা। জল দিয়া উত্তাপও নানাভাবে প্রয়োগ করা যায় ; যেমন—ফুটানো, ভাপানো এবং দমে সিদ্ধ করা।

ঝলসানো (Roasting)—খাদ্যদ্রব্যটি সোজাসুজি আগুনের সংস্পর্শে রান্না করিতে হয় ; যেমন—বেগুনপোড়া, পটলপোড়া বা মাংস ঝলসানো।

ইহার জন্য জোর উত্তাপের প্রয়োজন হয়। ঝলসানোর ফলে পেশীর মাংসের তন্তুগুলির মুখের প্রোটিন জমিয়া যায়; তাহার ফলে ভিতরের রস (juice) বাহির হইতে পারে না। অল্পক্ষণ অধিক তাপে রাখিয়া অর্ধদগ্ধ হইলে তারপর মৃদু আগুনে কিছুক্ষণ রাখিতে হয়।



চিত্র নং—৪৫ : রন্ধন-পদ্ধতি

৪। ভাপে সিদ্ধ (steaming) ৫। সেঁকা (baking) ৬। ঝলসান (roasting)

সেঁকা (Baking)—সোজাসুজি আগুনের উপর না দিয়া আগুনের আতসে রান্না করিতে হয়। যেমন—উনানের ভিতর সেঁকার জন্য নির্দিষ্ট গহ্বরে (baking chamber) খাদ্যটি দিয়া যদি উনানের মুখ বন্ধ করা যায় এবং আগুনটি উপর হইতে চাপা দেওয়া যায় তাহা হইলে উনানের ভিতরটি গরম হইয়া উঠে। সেই গরমে খাদ্যদ্রব্যটি সেঁকা হইয়া যায়। সেঁকার কাজ করিবার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে উনানের ভিতরটি প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে বলা হয় 'baking chamber'—পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক এইভাবে প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন দেশী প্রথায় বালি দিয়াও সেঁকার কাজ করা হয়। উনানে বালি বসাইয়া, বালিটি গরম করা এবং সেই উত্তপ্ত বালিতে খাদ্যটি দিয়া সেঁকা হয়। মুড়ি, খৈ প্রভৃতি এইভাবে সেঁকা হয়। শুকনা উত্তাপে শ্বেতসার আঠাল পদার্থে (dextrin) পরিণত হয়। উহা সুস্বাদু ও সহজপাচ্য। এই প্রথায় একমাত্র ভিটামিন 'C' ছাড়া অন্য কোন খাদ্যোপাদান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। ভিটামিন 'B'-ও অল্প কিছু নষ্ট হইতে পারে। সেঁকার জন্য জোর আগুন প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ সেঁকিবার জন্য নিম্নলিখিত উত্তাপের প্রয়োজন—

অল্প	হইলে	২৫০°F—৩৫০°F
মাঝারি	”	৩৫০°F—৪০০°F
খুব বেশী	”	৪৫০°F—৫০০°F

ভাজা (Frying)—ভাজাকে তেলে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। তেল কিংবা ঘি বা যে কোন চর্বিজাতীয় দাহ্য পদার্থ একটি পাত্রে করিয়া আগুনে বসাইয়া গলাইয়া ফেলিতে হয়। উহা ফুটিয়া উঠিলে উহাতে খাদ্যটি ছাড়িয়া, আস্তে আস্তে নাড়িয়া ভাজিতে হয়। ভাজার জন্য ৩৫০°F—৪০০°F উত্তাপ প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে অতি দ্রুত খাদ্যদ্রব্য রান্না করা যায়। ভাজা দুই প্রকারের হয়—ছাঁকা তেলে ভাজা বা deep fat frying এবং অল্প তেলে ভাজা বা shallow fat frying। এ ছাড়া অল্প ঘি বা তেল দিয়া যখন চাটু বা ফ্রাই-প্যানে ভাজা হয় তখন তাহাকে dry frying বা pan broiling বলা হয়। পরটা, ডিমের মামলেট, ডিমের পোচ প্রভৃতি এইভাবে করা হয়। বাংলা দেশের অনেক গৃহিণী এইভাবে চাটুতে তেল ছড়াইয়া ডালের বড়াও ভাজেন।



চিত্র নং—৪৬ : রন্ধন-পদ্ধতি
(১) ছাঁকা তেলে ভাজা। (২) অল্প তেলে ভাজা। (৩) দমে সিদ্ধ।

জল দিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিবার কতকগুলি রন্ধন পদ্ধতি

সিদ্ধ করা (Boiling)—২১২°F উত্তাপে জল দিয়া যখন কোন খাদ্যদ্রব্য ফুটানো হয় তখন তাহাকে সিদ্ধ করা বলে। চাল, ডাল, সবজি এই পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। এইসকল খাদ্যের শ্বেতসার দানাগুলি ফুলিয়া উঠে এবং উপরের কোষের (cellulose) প্রাচীর ফাটিয়া যায়। তখন ঐ শ্বেতসার আঠাল পদার্থে পরিণত হয় বা 'gelatinised' হয়। উহা সহজপাচ্য, কিন্তু এই পদ্ধতিতে মাংস রান্না করা যায় না। অতিরিক্ত উত্তাপে মাংসের প্রোটিনাংশ শক্ত হইয়া যায়।

দমে সিদ্ধ করা (Stewing)—১৮০°F উত্তাপে সম্পূর্ণ ঢাকা পাত্রে যখন রান্না করা হয় তখন তাহাকে দমে সিদ্ধ বলে। এই পদ্ধতিতে যে কোন

জিনিস সিদ্ধ করা যায়। তবে মাংস রন্ধনের ইহা সর্বাপেক্ষা ভাল উপায়। ইহাতে মাংস সুসিদ্ধ হয়, অথচ উহার নির্যাস (extractives) বাহির হইয়া যায় না। ফলে ঝোলটি সুগন্ধ হয়।

ভাপে সিদ্ধ (Steaming)—সোজাসুজি জল দিয়া উত্তাপ প্রয়োগ না করিয়া যদি গরম বাষ্পের চাপে রন্ধন করা যায় তাহা হইলে তাহাকে ভাপে সিদ্ধ বলে। যে কোন একটি পাত্রে জল দিয়া উনানে বসাইয়া উহার মধ্যে আর একটি পাত্রে খাদ্যটিকে রাখিতে হয়। তারপর প্রথম পাত্রের মুখটি এমন ভাবে বন্ধ করিতে হয় যাহাতে জল ফুটিয়া যে বাষ্প প্রস্তুত হইবে তাহা যেন বাহির হইতে না পারে। ঐ বাষ্প বাহির হইতে না পারিলে উহার চাপে দ্বিতীয় পাত্রের ভিতরকার খাদ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। ভাপে সিদ্ধ করার জন্য বিশেষ কতকগুলি রন্ধন-সরঞ্জাম পাওয়া যায়; যেমন—ইকমিক কুকার, প্রেসার কুকার, ডবল বয়লার প্রভৃতি। এই পদ্ধতিতে যে কোন খাদ্য রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয়। কারণ মশলার গন্ধ এবং খাদ্যের নির্যাসগুলির গন্ধ উড়িয়া যাইতে পারে না। সবজিগুলি বা মাছ-মাংস গলিয়া ঘাঁটিয়া যাইবার ভয় থাকে না। ইহাতে জ্বালানি কম লাগে এবং শ্রম ও সময় সংক্ষেপ হয়।

মৃদু আঁচে সিদ্ধ (Seamering)—৯৩°C উত্তাপে রন্ধন করাকে মৃদু আগুনে ফুটানো বলা হয়। মাংস এই পদ্ধতিতে রন্ধন করিলে ভাল হয়।

ব্রেসিং (Braising)—অল্প জলের ছিটা দিয়া, ভালভাবে রন্ধনপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, মৃদু আগুনে রান্না করাকে ব্রেসিং বলে।

খাদ্য বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন
(Cleanliness in food-handling)

খাদ্যই শরীর রক্ষার প্রধান উপাদান। আবার সেই খাদ্যই যদি কোন-প্রকার রোগজীবাণু দ্বারা দুষ্ট হয় তাহা হইলে মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই খাদ্যদ্রব্য যাহাতে কোনপ্রকারে জীবাণুদুষ্ট হইতে না পারে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য। এজন্য খাদ্যবণ্টনকারী ব্যক্তি ও কেন্দ্রগুলির বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। খাদ্যবণ্টনকারী ব্যক্তি হইল গোয়ালা, ময়রা, গৃহের এবং হোটেল বা রেস্তরাঁর পাচক ও পরিবেশনকারী, মাংস ও মাছ বিক্রেতা এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা; খাদ্যবণ্টনকারী কেন্দ্র হইল রন্ধনশালা,

গোশালা, বাজার, কসাইখানা, মাছের দোকান, খাবারের দোকান, হোটেল বা রেস্তরাঁ।

অবশ্য গৃহে খাদ্য বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে হইলে খাদ্য রন্ধন ও বণ্টনকারী, ঝি, চাকর, রন্ধনশালা, গোশালা, খাইবার ঘর, ভাঁড়ার-ঘর, বাসনপত্র প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

খাদ্য দূষিত হইবার কারণ—যে সকল কারণে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইতে পারে প্রথমেই যদি সেই কারণগুলি খুঁজিয়া বাহির করা যায় তাহা হইলে প্রতিকারের পথগুলি অবলম্বন করা সহজ হয়। খাদ্য দূষিত হওয়ার প্রধান প্রধান কারণগুলি হইল—

(১) গৃহপালিত পশু, পোকামাকড়, পিঁপড়া, মাছি প্রভৃতি। উহারা প্রথমে জীবাণু-দুষ্ট পদার্থে, পরে খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে।

(২) বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া বা উড়িয়া আসিয়া রোগজীবাণু খাদ্যে পড়ে। খাদ্যদ্রব্য খোলা থাকিলে তাই সহজেই রোগজীবাণু-দুষ্ট হয়।

(৩) ধোঁয়া খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়।

(৪) বাসন-কোসন ভালভাবে পরিষ্কার না করিলে ময়লার সহিত রোগজীবাণু লাগিয়া থাকে এবং ওই বাসনে খাদ্য পরিবেশন করিলে উহা খাদ্যে লাগিয়া যায়।

(৫) যাঁহারা খাদ্য রন্ধন করেন অথবা পরিবেশন করেন তাঁহাদের শরীরে কোন সংক্রামক রোগ থাকিলে অথবা তাঁহারা সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শে আসিবার পর ভালভাবে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করিয়া হাত দিলে খাদ্যদ্রব্য জীবাণু-দুষ্ট হইতে পারে। গোয়ালা, হালুইকর বামুন, হোটেলের চাকরদের মারফত বহু মারাত্মক ব্যাধি এইভাবে প্রতি বৎসর বিস্তার লাভ করে।

(৬) অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসের জন্যও খাদ্য দূষিত হইতে পারে ; যেমন—নাক ঝাড়া, মুখে চাপা না দিয়া হাঁচি বা কাশি, শৌচকর্মের পর ভালভাবে হাত না ধোওয়া ইত্যাদি।

(৭) হোটেল বা রেস্তরাঁর বাথরুম বা হাত ধুইবার সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহারের ফলেও রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

প্রতিকার—খাদ্য দূষিত হইবার কারণগুলি দূর করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে :—

(১) খাদ্যবণ্টন ও প্রস্তুত কেন্দ্রগুলি যতদূর সম্ভব বাজার ও কলকারখানা হইতে দূরে হইবে। বিক্রয়ের স্থান বাজার বা কারখানার নিকটে না হইলে হয়ত অসুবিধা হইবে, কিন্তু প্রস্তুত কেন্দ্রগুলি দূরে খোলামেলা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, বিশেষ ভাবে গরু, ভেড়া প্রভৃতির গোয়াল বা খোঁয়াড় শহরের বাহিরে হওয়াই কাম্য। (২) এই সকল প্রতিষ্ঠান উঁচু, খোলা, শুকনা জায়গায় হওয়া উচিত। তাহা হইলে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করিবে। (৩) প্রচুর পরিষ্কার জল যাহাতে ওই সকল কেন্দ্রে সহজে সরবরাহ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। (৪) জল ও তরল মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য-নীতিগুলি পালন করিতে হইবে। (৬) পোকা-মাকড়, মাছি, ইঁদুর প্রভৃতির উপদ্রব রোধ করার কথা চিন্তা করা উচিত। এজন্য ঘরগুলির জানালা-দরজায় মিহি লোহার জাল লাগাইতে হইবে। (৭) ধুলা-বালির হাত হইতে খাদ্য রক্ষার জন্য খাদ্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র ঢাকা-পাত্রে রাখিতে হইবে। (৮) উনানগুলি এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উনানের ধোঁয়া ধূম-নির্গমন-নলের সাহায্যে বাহির হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ধোঁয়াহীন জ্বালানি ব্যবহার করিলেও রন্ধনশালায় ধোঁয়া হইবে না ; যেমন—গ্যাস, ইলেকট্রিক প্রভৃতি। (৯) রন্ধন ও পরিবেশনের বাসনগুলির গঠন, মাপ ও ধাতু এমন হওয়া উচিত যাহাতে উহারা ব্যবহারের উপযোগী হয়, এবং ঐগুলি পরিষ্কার করা সহজ হয়।

বাসনপত্র পরিষ্কারের স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম—প্রথমেই ঠাণ্ডা জলে বাসনগুলি ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তারপর সাবান ও গরম জল অথবা ভীম পাউডার দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। সর্বশেষে ৫০ শতাংশ পারমিলিয়ান ক্লোরিন মিশ্রিত জলে অন্ততঃ দুই মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর পরিষ্কার কলের জলে ধুইয়া পরিষ্কার জায়গায় রাখিতে হইবে।

রন্ধন-বিভাগের লোকেদের পরিচ্ছন্নতা—গৃহের ক্ষেত্রে রন্ধনকারী ও পরিবেশনকারী পাচক, ঝি, চাকর, গোয়ালা প্রভৃতি প্রত্যেকের পরিচ্ছন্নতার কথা চিন্তা করিতে হইবে। (১) যে কোন পরিবারেই দাস-

দাসী বা পাচক অথবা গোয়ালা নিযুক্ত করিবার সময় উহাদের গায়ে বা
হাতে একজিমা (Eczema) বা কোন চর্মরোগ আছে কিনা তাহা দেখিয়া
লওয়া উচিত।

(২) ইহা ভিন্ন উহাদের শরীরে অন্য কোন সংক্রামক রোগের বিষ আছে
কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(৩) প্রাতঃকালে কাজ শুরু করিবার পূর্বে বাড়ী হইতে পরিয়া আসা
কাপড় জামা ছাড়িয়া, গৃহস্বামীর দেওয়া পরিষ্কার কাপড় পরিয়া তবে উহারা
কাজে যোগদান করিবে।

(৪) হাত-পা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। হাতে নখ থাকিবে না।

(৫) দাস-দাসী নিযুক্ত করিবার পর গৃহকর্ত্রী কয়েকদিন লক্ষ্য করিবেন
যে তাহাদের কোনরূপ বদ অভ্যাস আছে কিনা।

(৬) তাহাদের সহজ স্বাস্থ্যনীতিগুলি মুখে মুখে শিক্ষা দিতে হইবে।

শুষ্ক আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা—রন্ধনগৃহের শুষ্ক আবর্জনা
রাখিবার জন্য একটি ঢাকা দেওয়া পাত্র থাকা প্রয়োজন। প্রতিদিন দুইবার
করিয়া ওই পাত্রটি পরিষ্কার করা উচিত। এছাড়া হাত ধুইবার 'সিঙ্ক'
(sink) বা কলতলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। হাত ধুইবার জন্য সর্বদা
লিকুইড (liquid) সোপ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

গোশালা ও রন্ধনগৃহ—গৃহের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ এই দুইটিই পরিষ্কার
রাখা প্রয়োজন। গোশালা বাড়ী হইতে দূরে হইবে। গোয়ালঘর পাকা
হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গোয়ালা বা দুগ্ধদোহনকারী হাত ও দুগ্ধপাত্র পরিষ্কার
করিয়া ধুইয়া লইয়া তবে দুগ্ধ দোহন করিবে। দুগ্ধ দোহনের পর দুগ্ধপাত্র
ঢাকা দিয়া আনিয়া রান্নাঘরে তুলিতে হইবে এবং দুধ ছাঁকিয়া জ্বাল দিতে
হইবে। [রন্ধনশালার পরিচ্ছন্নতার কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে
(১৩১ পৃষ্ঠা দেখ)]।

খাইবার ঘর ও ভাঁড়ার ঘর—এই দুইটি ঘরের সঠিক অনাময়
(sanitation) ব্যবস্থার উপরও খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে। তাই
ভাঁড়ার ঘরে প্রতিটি জিনিস সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। খাইবার
ঘরের টেবিল, মেঝে, খাবার রাখার আলমারি প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার
রাখিতে হইবে।

কয়েকটি প্রাত্যহিক খাদ্যের রন্ধন উপকরণ

প্রত্যহ যে সকল অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা আমরা খাদ্য-পরিকল্পনা বা মেনু তৈয়ারী করি সেগুলির জন্য কোন্ কোন্ উপকরণ প্রয়োজন হয় তাহা প্রত্যেকটি মেয়ের জানা প্রয়োজন।

(১) **ভাত**—চাল এবং যতটা চাল তার দ্বিগুণ মাপের জল।

(২) **ডাল**—ডাল, গরম জল, নুন, চিনি, হলুদ, তেজপাতা, জিরা, তৈল, ঘি এবং লঙ্কা।

(৩) **ভাজা**—আলু, পটল, বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি, সরিষার তৈল, নুন এবং হলুদ।

(৪) **শাক-চড়চড়ি**—শাক, আলু, বেগুন বা কুমড়া প্রভৃতি বিভিন্ন সবজি, হলুদ, নুন, সরিষার তৈল, পাঁচফোড়ন, লঙ্কা, গুড় বা চিনি।

(৫) **ঘণ্ট**—শাক (পালং) অথবা মোচা, অথবা লাউ বা ছাঁচিকুমড়া, নুন, হলুদ, চিনি বা গুড়, ধনে, জিরা বা কালজিরা, লঙ্কা, তেজপাতা, ঘি, গরম মশলা, বড়ি বা ছোলা।

(৬) **শুক্তা**—আলু, বেগুন, মূলা, কাঁচকলা, বড়ি, সীম, উচ্ছে অথবা পলতা, রাঙা আলু, কচু, কাঁচা পেঁপে প্রভৃতি (মূলার পরিবর্তে উচ্ছে দিলে সজিনা ডাঁটাও দেওয়া হয়), সরিষা, রাঁধুনি, ধনে, আদা, তেজপাতা, নুন, তেল, চিনি, ঘি, পাঁচফোড়ন, দুধ।

(৭) **ডালনা**—আলু, সাধারণ সবজি, ইহার সহিত যে কোন একটি সবজি দেওয়া হয় (যেমন—পটল বা কুমড়া, ডুমুর বা কপি বা ইঁচড় প্রভৃতি), তৈল, জিরা, হলুদ, লঙ্কা, নুন, চিনি, ঘি, হিং, তেজপাতা।

(৮) **ঝোল**—আলু, পটল, কাঁচকলা বা বেগুন, কপি, ডালের বড়ি, মাছ, তেল, নুন, ধনে, হলুদ, লঙ্কা, জিরা অথবা পাঁচফোড়ন, তেজপাতা।

(৯) **ঝাল**—মাছ বা ডিম অথবা ডালের বড়ার ঝাল হয় (কোন সবজি ব্যবহার হয় না), হলুদ, নুন, তৈল, কাঁচালঙ্কা এবং সরিষা।

(১০) **অম্বল**—টক সবজি অথবা মাছের অম্বল হয়। কাঁচা পেঁপে, ডালের বড়া, মূলা বা মাছের অম্বলে তেঁতুল অথবা আমচুর, তৈল, নুন, হলুদ, সরিষা, চিনি ব্যবহার হয়।

(১১) **লুচি**—ময়দা এবং তাহার অর্ধেক ঘি, সামান্য নুন।

(১২) **রুটি**—আটা, জল, নুন। **পরটা**—ময়দা, ঘি জল ও নুন।

(১৩) **খিচুড়ি**—চাল ও মুগ ডাল সমপরিমাণ, হলুদ, নুন, লঙ্কা, জিরা, আদা, পিঁয়াজ, তেল, ঘি, চিনি, তেজপাতা, গরম মশলা, আলু, কপি, মূলা।

(১৪) **ঘি-ভাত**—আতপ চাল, চালের আট ভাগের একভাগ ঘি এবং ঐ পরিমাণ চিনি, নুন, হলুদ, গরম মশলা, তেজপাতা, কালোজিরা, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, লঙ্কা, আদা।

(১৫) **ভাজা ভাত**—আতপ অথবা সরু সিদ্ধ চাল, চালের আট ভাগের একভাগ ঘি অথবা বাদাম তৈল, পিঁয়াজ বা পিঁয়াজকলি, মটরশুঁটি, নুন, চিংড়ি মাছ, তেজপাতা।

(১৬) **ছোলার ডাল**—ছোলার ডাল এবং ডালের অন্যান্য সকল উপকরণ, তাছাড়া নারিকেল, কিশমিশ এবং গরম মশলা। আমিষ হইলে নারিকেল, কিশমিশের পরিবর্তে মাছের মুড়া বা মাছ দিতে হইবে।

(১৭) **বেসনের ভাজা**—যে কোন সবজি, নুন, কালজিরা, পোস্ত, লঙ্কা, সরিষার তৈল এবং বেসন।

(১৮) **ঘুগনি**—ছোট মটর বা বরবটি কড়াই, হলুদ, নুন, লেবু, গরম মশলা, পিঁয়াজ, তেজপাতা, জিরা, কাঁচালঙ্কা, নারিকেল, আলু বা মাংস।

(১৯) **কালিয়া**—এক্ষেত্রেও আলু ও সাধারণ সবজি, তাহার সহিত পটল বা ইঁচড়, ফুলকপি বা ছানা বা ডিম বা মাছ বা ডালের ধোঁকা দেওয়া হয়। ডালনার সব মশলাই লাগে, তাছাড়া পিঁয়াজ, রসুন, আদা, গরম মশলা, দৈ বা টম্যাটো বা ভিনিগার।

(২০) **স্টু**—আলু, গাজর, বিট, কাঁচা পেঁপে, কপি, টম্যাটো, চিনি, নুন, তেজপাতা, ঘি, গরম মশলা। সাদা স্টু-এ দুধ বা দৈ, মাছ বা মাংস, পিঁয়াজ, রসুনও দেওয়া হয়। জল অথবা 'স্টক'।

(২১) **পাথুরি**—মাছ বা কোন বিশেষ সবজির পাথুরি হয় (যেমন—ঝিঙে, বেগুন, পটল, করলা প্রভৃতি), ঝালের সমস্ত উপকরণ এবং অল্প নারিকেল অথবা পোস্ত বাটা লাগে। জল না দিয়া ভাপানো হয়।

(২২) **চাটনি**—কাঁচা আম, আমড়া, টক আঙুর, কাঁচা পেঁপে, টম্যাটো, আলুবোখারা, খেজুর, কিশমিশ, জলপাই প্রভৃতি যে কোন খাদ্যদ্রব্যের চাটনি

হয়। অম্বলের ন্যায় মশলা, তৈল ইত্যাদি একই পরিমাণ প্রয়োজন হয়। কেবল লঙ্কা, পাঁচ-ফোড়ন এবং মিষ্টি কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণ লাগে।

(২৩) **ভুনি খিচুড়ি**—খিচুড়ির মতোই সব কিছু দেওয়া হয়। ডালের পরিবর্তে কড়াইশুঁটি ব্যবহার করা হয়।

খাদ্য পরিবেশনের নীতি ও পদ্ধতি
(Principle and art of serving food)

খাদ্য প্রস্তুতের ন্যায় খাদ্য পরিবেশনও একটি গুণবিশেষ। ইহার উপরও খাদ্যপুষ্টির সাফল্য কিছুটা নির্ভর করে। তাই খাদ্যের সকল প্রকার পুষ্টিগত উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে পাইতে হইলে যেমন সঠিক পদ্ধতিতে রন্ধন করিতে হয়, তেমনি সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিবেশন করিতে হয়। এ জন্য দুইটি জিনিস প্রয়োজন—(১) পরিচ্ছন্নতা, এবং (২) বৈচিত্র্য।

(১) **পরিচ্ছন্নতা**—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য উভয়ই নির্ভর করে পরিচ্ছন্নতার উপর। তাই পরিবেশনের সময় পরিচ্ছন্নতার কথা সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হয়। খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব কিছুই বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। যেমন—

খাইবার স্থান ঃ খাইবার স্থানটি পরিচ্ছন্ন, মনোরম ও আরামদায়ক হইবে। ইহার জন্য খুব বেশী পয়সা খরচের প্রয়োজন হয় না। সামান্য চেষ্টা করিলেই সকল জিনিস সুন্দর ও পরিষ্কার রাখা যায়। টেবিলের ঢাকা, ঘরের মেঝে, দেওয়াল, সার্সির কাঁচ প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিলে, একটু চেষ্টা করিয়া সালাড ডিশটি সাজাইলে, এবং পুষ্পাধারটিতে কয়েক গুচ্ছ ফুল-পাতা রাখিলে ঘরটি সুন্দর ও পরিষ্কার দেখায়। তাহার উপর যদি ঘরের দেওয়ালের রঙের সহিত পরদা ও টেবিল ঢাকনার রঙের সমন্বয় করা যায় তাহা হইলে একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন হয় না। অন্নব্যঞ্জনাদি ভালভাবে টেবিলে সাজাইতে পারিলে সামান্য খাদ্যও সুন্দর ও রুচিকর হয়।

বাসনপত্র ঃ যে ধাতুর বাসনেই খাদ্য পরিবেশন করা হউক না কেন, সর্বাগ্রে প্রয়োজন উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। বাসন পরিষ্কার না হইলে যে কোন মুহূর্তে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। মাজা বাসন, থালা, গ্লাস উপুড় করা

থাকিবে। খাদ্য পরিবেশনের পূর্বে ঐগুলি পরিষ্কার কাপড়ে মুছিয়া তারপর উহাতে খাদ্য পরিবেশন করিতে হইবে।

পরিবেশনকারিণী : যিনি খাদ্য পরিবেশন করিবেন তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আঁটসাঁট হইবে। চুল খোলা থাকিবে না এবং আঙ্গুলের নখগুলি ছোট করিয়া কাটা থাকিবে। পরিবেশনের পূর্বে সব সময়ে হাত ভাল করিয়া ধুইয়া লইবেন। যতদূর সম্ভব চামচ, হাতা ও খুন্তির সাহায্যে পরিবেশন করিবেন ; হাতে করিয়া পরিবেশনের অভ্যাস এড়াইয়া চলিবেন।

(২) **খাদ্যে বৈচিত্র্য**—এমনভাবে খাদ্য ও পানীয় সাজাইতে হইবে এবং পরপর পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে উহার মধ্যে একটি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধের খাদ্য এমনভাবে পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে একই প্রকার খাদ্য পর পর আসিয়া না পড়ে। পরিবেশনের পূর্বে খাদ্যগুলির উত্তাপ ভোজনোপযোগী আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ খাদ্য গরম হইলে তবেই মুখরোচক হয়। অতিরিক্ত গরম খাদ্যের যেমন কোন স্বাদ পাওয়া যায় না, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা খাদ্যও তেমনি বিস্বাদ লাগে। আবার কতকগুলি খাদ্য গরম খাইতে ভাল লাগে, যেমন—ভাজা, সুপ প্রভৃতি। আবার কতকগুলি ঠাণ্ডা ভাল লাগে, যেমন—পুডিং, দৈ, মিষ্টি ইত্যাদি। যে খাদ্য যেরূপ হইলে ভোজনে তৃপ্তি পাওয়া যাইবে সেইরূপ গরম বা ঠাণ্ডা খাদ্য পরিবেশন করিতে হইবে।

পরিবেশ : আহারের সময় মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারাও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা ভোজনপর্ব উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে উহা আর কাহারও কেবলমাত্র উদরপূর্তি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কখনই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা উচিত নয়। ক্রোধ, দুঃখ বা অতি উল্লাসে দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শরীর উত্তেজিত হইলে পাচক রসগুলির ক্ষরণ ভাল হয় না। শান্ত, আরামদায়ক পরিবেশে যদি কৌতুককর হালকা কথাবার্তা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে ভোজন করা যায় তাহা হইলে পরিপাক এবং বিপাক (metabolism) দুই ক্রিয়াই ভালভাবে হইতে পারে। তখন খাদ্যপুষ্টিগুলি সম্পূর্ণরূপে দেহের কাজে লাগিতে পারে। ইহা ভিন্ন ভোজনের স্থানে প্রচুর আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

খাদ্য পরিবেশন-পদ্ধতি—খাদ্য পরিবেশন ও আহার্য গ্রহণ রীতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার। দেশের জলবায়ু, পরিচ্ছন্নতার মান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ইহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। আমরা এখানে প্রাচ্যের, প্রধানতঃ ভারতবর্ষের, এবং পাশ্চাত্ত্যের দুই-একটি দেশের পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করিব।

প্রাচ্য পদ্ধতি : প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই মাটিতে বসিয়া, হাত দিয়া খাওয়ার রেওয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটিরা মাটিতে বসিয়া খাইলেও থালাখানি একটি ছোট জলচৌকির উপর রাখে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের অধিকাংশ অধিবাসীই এইভাবে আহার করে। মুসলমানরা মাটিতে কিংবা খাটিয়া বা তক্তাপোশ যেখানে বসিয়াই ভোজন করুক না কেন, একখানি পরিষ্কার কাপড় বিছাইয়া থালাগুলি তাহার উপর রাখে।

পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি : পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষ চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ভোজ্য সামগ্রী রাখিয়া, কাঁটা চামচ ও ছুরির সাহায্যে আহার করে। পাশ্চাত্ত্যের সকল দেশেই এই রীতি প্রচলিত, তবে টেবিল সাজাইবার কায়দা-কানুন এবং টেবিলে খাদ্য পরিবেশনের নিয়ম সর্বত্র সমান নহে।

টেবিল সাজাইবার নিয়ম—টেবিলটি একটি পরিষ্কার ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। টেবিলের মাঝখানে ফল বা ফুল সাজাইয়া রাখা হয়। টেবিলের চার ধারে চেয়ার পাতা হয়। প্রথমে টেবিলের উপর টেবিল-ম্যাট্স পাতা হয়; তাহার উপর প্লেট রাখা হয়। প্লেটের ডানদিকে বিভিন্ন প্রকার চামচ ও ছুরি থাকে এবং বাম দিকে কাঁটা থাকে। ছুরির ঠিক মাথার দিকে জলের গ্লাস থাকে, এবং নুন-মরিচের পাত্র থাকে। কাঁটাগুলির মাথার দিকে রুটি ও মাখনের পাত্র থাকে। হয় প্লেটের উপর আর না হয় কাঁটার বামদিকে ন্যাপকিন বা হাতমোছা ঝাড়নটি রাখা হয়।

পরিবেশন—প্রথমে ক্ষুধা-উদ্রেককারী কোন পানীয় পরিবেশন করা হয়। পান শেষ হইলে ঐ পাত্র তুলিয়া লওয়া হয়। তারপর সূপ বা ঝোল পরিবেশন করা হয়। সূপ খাওয়া শেষ হইলে service plate (যেটি প্রথম হইতে পাতা ছিল) সমেত সূপ-ডিশ সরাইয়া লওয়া হয়। তারপর আমিষ বা নিরামিষ ভাজা-খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ঐগুলি খাওয়া হইলে প্লেট

সরাইয়া রোস্ট অথবা কারি পরিবেশন করা হয়। তারপর স্যালাড এবং তারও পরে মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। সব শেষে কফি দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি খাদ্যের জন্য স্বতন্ত্র মাপ ও ডিজাইনের ডিশ, চামচ, কাঁটা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকবার পরিবেশনের সময় পূর্বের ভুক্ত ডিশটি সরানো হয়।

উভয় প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা—মাটিতে আসন পাতিয়া বসিয়া, মাটির উপর থালা রাখিয়া ভোজন করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন—পরিবেশনকারীকে প্রত্যেকবার হেঁট হইয়া পরিবেশন করিতে হয়। ইহাতে সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মাটিতে থালা রাখার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়া আহার্য মুখে তুলিতে হয়। ইহাতে পেটে ভাঁজ পড়ে। মাটিতে থালা রাখার জন্য আহার্য বস্তুগুলি রোগজীবাণুদুষ্ট হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। তাই বাঙালী অপেক্ষা গুজরাটি বা মুসলমানদের ভোজন-পদ্ধতি ভাল। পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত হইলেও উহা সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য কেতায় ভোজন করিতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয় তাহা দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে বহন করা সম্ভব নহে। তাই বর্তমানে ভারতবাসী দুইটি প্রথার ভিতরে একটি সমন্বয় করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মাটির পরিবর্তে চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে ভোজ্যপাত্র রাখিয়া আহার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কায়দা-কানুন বা table manners মানেন না। থালাবাটিতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া হাত দিয়া খাইয়া থাকেন। ইহাতে প্রাচ্যের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, আবার পাশ্চাত্ত্যের অসুবিধাগুলিও এড়ানো যায়। তবে এখনও পর্যন্ত ইহা মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত বা শিক্ষিত পরিবারেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ মানুষই চিরাচরিত পদ্ধতিতে আহার করেন। খাইবার পূর্বে মেঝেটি ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া লইলে ও পরিষ্কার থালা-বাসনে সাজাইয়া খাদ্য পরিবেশন করিলে আহার-কার্য বেশ আনন্দের হয়। একেবারে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জনগুলি সাজাইয়া না দিয়া এক-একটি করিয়া পরিবেশন করিলে অপচয় কম হয়। পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইলে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সবজি-বাগান

রন্ধনশালার পশ্চাতে একটুকরা ফাঁকা জমি পাইলে সুন্দর একটি সবজি-বাগান করা যায়। বাড়ীর যে কোন স্থানেই ফাঁকা জমিতে সবজি-বাগান করা যায়, কিন্তু রান্নাঘরের পশ্চাতের জমিতে ফেন, ঘরধোয়া জল প্রভৃতি পড়ে বলিয়া ঐ জমি অধিক উর্বর হয়।

মানুষের সহিত প্রকৃতির অন্তরের যোগ চিরন্তন। তাই বাগান—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক—সহজে মনকে আকর্ষণ করে। আজ যে বীজটি বপন করা হইল দুই দিন পরেই তাহা পাতা মেলিল, অল্পদিনে একটি চারাগাছে পরিণত হইল, তারপর কুঁড়ি আসিল, বাতাসের মৃদু আন্দোলনে উহা দল মেলিল, কয়েকদিন পরেই ফুলটি ঝরিয়া ফলের ইশারা মিলিল—এই সবই মানুষের নিকট এক অপার আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

এইভাবে ছোট্ট বাগানখানি কেবল মানুষের আনন্দবর্ধনই করে না, ইহার বাস্তব মূল্যও আছে। যেমন—

আজকাল আর্থিক দুরবস্থার দিনে একটি সবজি-বাগান করিতে পারিলে শাকপাতা লাউকুমড়া ঝিঙে বেগুন উচ্ছে পটল প্রভৃতি বাজার হইতে কিনিতে হয় না। উপরন্তু ঐ সবজিগুলি তাজা অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের খাদ্যমূল্য বাজারের বাসি শাক-সবজি অপেক্ষা অনেক বেশী।

বহু মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরি করে, সাধারণতঃ তাহাদের পক্ষে বাজার করিয়া, উহা খাইয়া অফিস যাওয়া সম্ভব হয় না। স্বভাবতঃ একদিন বাজার করিয়া তাহারা তিন-চারিদিন খাইয়া থাকে। বাধ্য হইয়া অধিকাংশ দিন আলু-পিঁয়াজ দিয়া রন্ধন শেষ করিতে হয়। কিন্তু সবজি-বাগান থাকিলে ঐ সমস্যার আংশিক সমাধান হয়। বাজারে যাওয়ার সময় ও শ্রম অনেকাংশে বাঁচিয়া যায়।

বাগানটি করিবার জন্য যে শারীরিক পরিশ্রম হয় তাহাতে শরীর সুগঠিত হয়। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারগুলির পক্ষে ইহা একটি উত্তম ব্যায়ামের ব্যবস্থা। শারীরিক এবং মানসিক শ্রমের একটা চমৎকার ভারসাম্য এইভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

পরিবারের শিশুগুলি বাগান করা দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির সহিত

পরিচিত হয়। এই পরিচয় হইতেই শিশুদের গাছের ফল-ফুলের উপর আকর্ষণকে একটি শখে পরিণত করা সহজ হয়। ঐ শখ শিশুদের গঠন-প্রবৃত্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে, তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস আনে।

এসব ছাড়াও বাগান করিবার একটি নৈতিক দিকও আছে। খাদ্যাভাবে যখন দেশ চরম সংকটের সম্মুখীন, খাদ্য উৎপাদনের সামান্য সুযোগটুকুও তখন আমাদের ছাড়া উচিত নহে।

সব দিক বিবেচনা করিয়া একখানি আদর্শ সবজি-বাগান করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন—(১) উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করা ; (২) মাটি প্রস্তুত করা ; (৩) জলসেচের ব্যবস্থা করা ; (৪) মাটিতে সার দেওয়া ; (৫) আগাছা নির্মূল করা ; (৬) গাছের শত্রু কীট-পতঙ্গগুলি ধ্বংস করা ; এবং (৭) যে ঋতুর যে সবজি তাহার উৎপাদন-আবর্ত রক্ষা করিয়া উৎপাদন করিয়া যাওয়া।

(১) **বীজ নির্বাচন** ঃ ভাল জাতের বীজ হইলে বা ভাল কলম হইলে তাহার ফলগুলিও ভাল হইবে। এজন্য সর্বাগ্রে নীরোগ উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

(২) **জমি প্রস্তুত করা** ঃ যথেষ্ট আলোবাতাস পায়, বৃষ্টি হইলে বেশী জল জমে না—এরূপ জমিই সবজি-বাগানের উপযোগী। জমিটি প্রথমে কোদাল দিয়া কোপাইতে অথবা লাঙল দিয়া চষিয়া দিতে হয়। ১ হইতে ১½ হাত গভীর করিয়া চষিয়া ভিতরের মাটি উপরে তুলিয়া ফেলিবার পর বড় বড় চাঙড়গুলি ভাঙিয়া ঝুরঝুরে করিয়া ইট-পাটকেল বাছিয়া ফেলিতে হয়।

(৩) **সার দেওয়া** ঃ ঝুরঝুরে মাটিতে সার ছড়াইতে হয়। সার নানা-প্রকারের হয় কিন্তু সকল সার সকল জমি এবং সকল সবজির উপযোগী নহে। যেমন এঁটেল মাটিতে ঘোড়ার বিষ্ঠা এবং পাতা-সার বিশেষ উপযোগী। মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকিলে চুনের সার দিলে জমির উন্নতি হয়। আবার বালি-মাটিতে গোবরের সার বিশেষ কার্যকরী। খইল ঘাস পাতা গোবর একত্রে পচাইয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা সকল জমিরই উর্বরা-শক্তি বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে মাটির ঝুরঝুরে ভাব নষ্ট হয় এবং মাটি শক্ত হইয়া চাঙড় বাঁধিয়া যায়। তাই ঐসব দেশী সারের সহিত রাসায়নিক সার

মিশাইয়া ব্যবহার করিলে মাটির ঝুরঝুরে ভাব বজায় থাকে। অল্প কিছু ঝুরা মাটির সহিত সার মিশাইয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। জল পড়িলে উহা মাটির সহিত মিশিয়া যায়। গাছ পুঁতিবার পর সার দিতে হইলে দুই আলের মধ্যবর্তী জমিতে ১২ হাত গর্ত করিয়া মাটির সহিত সার মিশাইয়া দিতে হয়।

(৪) **বীজবপন:** মাটি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন করিতে হয়। অবশ্য তাহার পূর্বে দেখা প্রয়োজন ঐ অঞ্চলে কোন্ কোন্ সবজি হয়। বিভিন্ন ঋতুর বীজগুলি অল্প জমিতে প্রথম অঙ্কুরিত করিয়া লইয়া তারপর বপন করিতে হয়। সকল বীজ অঙ্কুরিত করিবার প্রয়োজন হয় না। ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্যগুলির বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত করিবার প্রয়োজন হয়। মাটির আল প্রস্তুত করিয়া লইয়া বীজ এক হাত অন্তর পুঁতিতে হয়। বীজবপনের পর বড় মানপাতা অথবা কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া প্রখর সূর্যালোকের হাত হইতে বীজগুলি রক্ষা করিতে হয়। বীজের যেদিক হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয় সেই দিক উপরে রাখিয়া আঙুল দিয়া মাটিতে একটু চাপ দিয়া বীজটি বসাইয়া দিতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে মাটি বেশ ভাল করিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়। কিন্তু বীজ বপনের পর আর খুব বেশী জল ঢালিতে নাই। তাহা হইলে বীজ পচিয়া যাইতে পারে।

(৫) **আগাছা পরিষ্কার করা ও গাছ নিড়ান:** বেগুন প্রভৃতির বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া, পরে আলের উপর সার দিয়া বসানো হয়। চারাগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কারণ ঐ গাছগুলি মাটির সারবস্তু টানিয়া লয়। এছাড়া লতানে গাছ-গুলির জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়।

(৬) **জলসেচ:** মাটিতে জল পড়িলে গাছের খাদ্যগুলি তরল হয়। তখন গাছ ঐগুলি টানিয়া লইতে পারে। তাই প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গাছগুলিতে জল দেওয়া প্রয়োজন। জল গাছের গোড়ায় দাঁড়াইবে না, গড়াইয়া মাঠে পড়িয়া মাটি ভিজাইয়া দিবে। বর্ষার সময় জল দিবার প্রয়োজন হয় না। জল দিবার ফলে মাটি বসিয়া যায়। মাঝে মাঝে মাটি খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হয়।

(৭) **কীট নিবারণ:** পিঁপড়া এবং পোকায় গাছ নষ্ট করিয়া দেয়।

হলুদজল, হুঁকার জল বা পাতলা করিয়া গ্যামাক্সিন জলে গুলিয়া গাছে ছড়াইয়া দিলে পোকার উপদ্রব কমে। কিন্তু অতি উগ্র কীটনাশক ব্যবহার না করাই ভাল।

অনুশীলনী

খাদ্য—

'E'. ১৯৬৫ (১) খাদ্যের সংজ্ঞা বল এবং কাজ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ কর। প্রত্যেকটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া প্রধান উৎসের নাম কর।

উত্তর সংকেত—(১) সংজ্ঞা, (২) কাজ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ, এবং (৩) উদাহরণ।

রন্ধনশালা—

'E'. ১৯৬৫ (৪) রান্নাঘরে যে সমস্ত সাধারণ দুর্ঘটনা ঘটে সেইগুলি আলোচনা কর। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কি কি জ্বালানি ব্যবহার হয়? উহাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়গুলি আলোচনা কর।

উঃ সং—(১) রান্নাঘরের সাধারণ দুর্ঘটনা—পুড়িয়া যাওয়া, কাটিয়া যাওয়া, আছাড় খাইয়া আহত হওয়া। (২) জ্বালানি—কঠিন, তরল, গ্যাস, বিদ্যুৎ। (৩) উহাদের সুবিধা ও অসুবিধা।

'E'. ১৯৬৬ (৩) তোমার বাড়ীতে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত সুসজ্জিত রন্ধনশালা করিতে চাও তাহার বর্ণনা দাও।

উঃ সং—(১) ভূমিকা, (২) অবস্থান, (৩) মেঝে, (৪) দেওয়াল, (৫) জানালা-দরজা, (৬) নরদামা, (৭) আলো, (৮) জল, (৯) পরিচ্ছন্নতা, (১০) সরঞ্জাম বিন্যাস।

চুল্লী ও জ্বালানি—

'E'. ১৯৬১, ১৯৬২ প্র—(৬) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—ধূম্রহীন চুলা।

উঃ সং—(১) গঠন, (২) ব্যবহার, এবং (৩) সুবিধা।

E. ১৯৬৩ (৬) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—(খ) বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি।

উঃ সং—(১) কঠিন জ্বালানি, (২) তরল জ্বালানি, (৩) গ্যাস, (৪) বিদ্যুৎ। প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধা বলিতে হইবে।

বাসনপত্র ও রন্ধন সরঞ্জাম—

'E'. ১৯৬০ (৪) কি প্রকার রন্ধন সরঞ্জাম ও বাসনপত্র তুমি তোমার রন্ধনশালার জন্য নির্বাচন করিবে? তোমার উত্তরের পশ্চাতে কারণ দেখাও।

উঃ সং—(১) রন্ধনশালার প্রয়োজনীয় বাসন ও সরঞ্জামের নাম।
(২) নির্বাচন—প্রয়োজন অনুযায়ী টেকসই কিনা, বাসনপত্রের ধাতু, উত্তাপসহ কিনা, সহজে পরিষ্কার করা যায়। ব্যবহারের সুবিধা।

খাদ্য বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা—

'E'. ১৯৬৫ (Comp.) (৬) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—(ক) রন্ধনশালার বাসনপত্রের পরিচ্ছন্নতা।

উঃ সং—(১) রন্ধনশালার বাসনপত্র। (২) বিভিন্ন প্রকার বাসন পরিষ্কার করিবার নিয়ম। (৩) যাহাতে বাসনপত্র সহজে জীবাণু-দুষ্ট হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন।

রন্ধন পদ্ধতি—

'E'. ১৯৬৩ (৬) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—(ক) স্টুইং।

উঃ সং—(১) পদ্ধতির বর্ণনা। (২) কোন্ কোন্ খাদ্য এই পদ্ধতিতে রন্ধন করা হয়? (৩) কেন?

Objective Type

'E'. 1960 (4) Or,—Why are the following factors important in cookery?

(a) Frying the basic ingredients to make curry.

(b) Heating fat correctly before frying.

(c) Serving flour.

(d) Slow cooking of meat.

(e) Standing the dough before making chapatis.

'E'. ১৯৬৫ (৩) রন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি? নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি রন্ধন দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়—(ক) ডিম, (খ) শাক, (গ) আলু।

উঃ সং—(১) রন্ধন পদ্ধতি—(ক) ঝলসানো, (খ) সেঁকা, (গ) ভাজা, (ঘ) সিদ্ধ করা, (ঙ) দমে সিদ্ধ করা, (চ) ভাপে সিদ্ধ করা। (২) খাদ্যের উপর রন্ধনের প্রভাব—ডিমের উপর, আলুর উপর, শাকের উপর।

খাদ্য পরিবেশন—

'E'. ১৯৬৩ (৪) তোমার অতিথিকে খাদ্য পরিবেশনের সময় কোন্ কোন্ মূল নীতি অনুসরণ করিবে? এমন একটি ডিমের খাদ্য রন্ধনের কথা বল যাহা খুব আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করা যায়।

উঃ সং—(১) খাদ্য পরিবেশনের মূলনীতি—(ক) পরিচ্ছন্নতা, (খ) বৈচিত্র্য। (২) ডিম রন্ধন—ডিমের হালুয়া বা পাফ্ পোচ বা স্নোবল কাস্টার্ড—যে কোন একটি।

'E.'. ১৯৬৫ (৬) (খ), ১৯৬৮ (১) (গ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—(খ) শিল্পসম্মত খাদ্য পরিবেশন।

উঃ সং—(১) ভূমিকা, (২) পরিচ্ছন্নতা, (৩) খাইবার স্থান, (৪) সাজাইয়া গুছাইয়া পরিবেশন, (৫) পরিবেশনকারিণী ও পরিবেশন পদ্ধতি।

বয়ন-তন্তু ও উহাদের শ্রেণীবিভাগ

আজকাল অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে সকল সময় কাপড়-জামা ধোপা খরচ করিয়া কাচানো সম্ভব হয় না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহিণীরা নিজেরাই বাড়ীতে প্রায় সকল-প্রকার জামা-কাপড় কাচিতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকায় রেশম, পশম প্রভৃতি দামী পোশাক ঘরে কাচিতে সাহস পান না। আবার অনেক ক্ষেত্রে কাচিতে গিয়া নষ্টও হয়। তাই এই বিষয়টি সকল মেয়েরই ভালভাবে জানা প্রয়োজন। বস্ত্রধৌতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বস্ত্রের তন্তুগুলির উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে জানা প্রয়োজন। তাহা না হইলে উহা ময়লা কেন হয় ও তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য কোন্ জিনিস প্রয়োগ করিতে হইবে, কতখানি ক্ষার ও উত্তাপ উহা সহিতে পারিবে প্রভৃতি বিষয় জানা যাইবে না। সুতরাং বয়নতন্তু ও বস্ত্রধৌতি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মেয়েরই প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বয়ন-তন্তু—যে সকল তন্তু হইতে বয়ন-উপযোগী সুতা প্রস্তুত হয় সেই সকল তন্তুকে বয়ন-তন্তু বলে। সকল তন্তু হইতে সুতা প্রস্তুত হয় না। যে সকল আঁশ বা তন্তু যথেষ্ট শক্ত, লম্বা, নমনীয়, স্থিতিস্থাপক, নরম এবং যে সকল তন্তুর জল শুষিয়া লইবার ক্ষমতা আছে সেইগুলিই মাত্র সুতা প্রস্তুতের উপযোগী। সুতরাং বয়ন-তন্তুর উক্ত গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক। পূর্বে প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত তন্তু দ্বারা সুতা প্রস্তুত হইত। বিজ্ঞানের উন্নতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম তন্তুও প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ সকল তন্তু হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বোনাও হইতেছে।

বয়ন-তন্তুর শ্রেণীবিভাগ—বয়ন-তন্তুগুলিকে উহাদের উৎস অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—অকৃত্রিম এবং কৃত্রিম। অকৃত্রিম তন্তুগুলিকে প্রাকৃতিক আখ্যা দিলেও খুব ভুল হয় না। যে সকল তন্তু উদ্ভিদ অথবা জীব জগৎ হইতে অথবা খনি হইতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়। আর যেগুলি মানুষ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করে তাহাদের বলা হয় কৃত্রিম তন্তু।

নং ৩

বয়ন-তন্তুর শ্রেণীবিভাগ

তন্তু

- প্রাকৃতিক
  - উদ্ভিজ্জ
    - বীজ তন্তু
      - কার্পাস তন্তু
      - ক্যাপক তন্তু
    - বৃক্ককোষতন্তু
      - লিনেন
      - পাট
      - শন
      - র‍্যামি
    - ভাসকুলার তন্তু
      - ম্যানিলা
      - সিসল
      - এগেভ
      - হেম্প
      - পিটা
      - এলো
      - আনারস
  - প্রানিজ
    - রেশম
    - পশম
  - খনিজ
    - এসবেসটজ
- কৃত্রিম
  - রেয়ন
    - ভিসকজ রেয়ন
    - অ্যাসিটেট রেয়ন
    - কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন
  - রাসায়নিক তন্তু
    - নাইলন
    - ভিনিয়ন
    - ডেক্রন
    - প্লাস্টিক
  - ধাতব তন্তু
    - কাঁচ
    - জরি

প্রাকৃতিক তন্তুগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ এবং খনিজ তন্তু।

উদ্ভিজ্জ তন্তু: উদ্ভিদ-জগৎ হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহাদের উদ্ভিজ্জ তন্তু বলা হয়। উদ্ভিজ্জ তন্তু তিন প্রকার; যথা—(১) বীজতন্তু, যেমন কার্পাস ও ক্যাপক; (২) বৃক্ষকোষ তন্তু, যেমন লিনেন, পাট, শন, সানহেম্প, র্যামি; (৩) ভাসকুলার তন্তু (Vascular fibre), যেমন ম্যানিলা, সিসল, এগেভ, নিউজিল্যাণ্ড হেম্প, পিটা, এলো, আনারস তন্তু প্রভৃতি।

প্রাণিজ তন্তু: প্রাণী হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহাকে প্রাণিজ তন্তু বলে। উহা দুই প্রকারের হয়; যথা—পশম ও রেশম।

খনিজ তন্তু: খনি হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহাকে খনিজ তন্তু বলে; যথা—এসবেসটজ।

কৃত্রিম তন্তু প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; যথা—(১) রেয়ন, (২) রাসায়নিক তন্তু।

রেয়ন-তন্তু: প্রস্তুত-প্রণালীর নাম অনুযায়ী রেয়ন-তন্তুকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—ভিসকজ রেয়ন (Viscose), সেলুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose Acetate), নাইট্রো সেলুলোজ (Nitro Cellulose), কিউপ্রামোনিয়াম (Cupramonium), ভিসট্রা (Vistra), সেলটা (Celta) প্রভৃতি।

রাসায়নিক বা Synthetic fibre—রেয়ন-তন্তু (অ্যাসিটেট রেয়ন ছাড়া) উদ্ভিজ্জ পদার্থ, রাসায়নিক পদ্ধতিতে গলাইয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু সিনথেটিক ফাইবার সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক উপাদান হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাইলন। ডেক্রন, ভিনিয়ন, প্লাস্টিক—সব কিছুই রাসায়নিক তন্তু হইতে প্রস্তুত হয়।

ধাতব-তন্তু—ঐ দুইটি ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে আরও দুই-একটি তন্তু ধাতব পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়; যেমন—কাঁচ-তন্তু এবং জরি।

এই সব তন্তুর মধ্যে সবগুলি হইতে পোশাক প্রস্তুত হয় না। দড়ি, চট, ক্যানভাস প্রভৃতি আরও নানাবিধ ব্যবহার্য জিনিস বোনা হয়। যেগুলি হইতে পোশাকের কাপড় বা পরিধেয় শাড়ী-ধুতি বোনা হয় সেইগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়; যেমন—তুলা, লিনেন, রেশম, পশম, রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি।

তুলা-তন্তু (Cotton-Fibre)

কার্পাস ফল হইতে যে তন্তু পাওয়া যায়, তাহাকে সাধারণতঃ তুলা-তন্তু বলে। মানুষ রেশম, পশম ব্যবহারের অনেক পরে তুলা-তন্তু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তবে ভারতবর্ষে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও সুতার সূক্ষ্ম বস্ত্র হইত।

উৎস ও প্রস্তুতি—আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে তুলার চাষ হয়। সমগ্র পৃথিবীর তুলা উৎপাদনের হার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫ ভাগ, ভারতে ১২ ভাগ, পাকিস্তানে ৬ ভাগ, মিশরে ৬ ভাগ, চীনে ৪·৫ ভাগ, ব্রেজিলে ২·৫ ভাগ এবং অন্যান্য দেশে বাকী ১০ ভাগ। গুণগত বিচারে অবশ্য আয়ারল্যাণ্ডের তুলাই প্রথম, মিশরীয় তুলা দ্বিতীয়, আমেরিকার তুলা তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভারত ও পাকিস্তানের তুলা।

তুলা গাছের ফল পরিপক্ক হইলে ফাটিয়া যায় এবং গোলাকৃতি তুলা-পিণ্ডটি দেখা যায়। এই সময়ে ঐ ফলগুলি সংগ্রহ করিয়া তুলাগুলিকে বীজ হইতে আলাদা করিয়া ফেলা হয়। বাকী কাজগুলি ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে স্থানে করা হইয়া থাকে। প্রথমে তুলাগুলি সমানভাবে টানিয়া মসৃণ করা হয়। তারপর দড়ির মতো লম্বা লম্বা পাঁজ প্রস্তুত করা হয়। ঐ পাঁজ হইতেই চরকায় অথবা যন্ত্রে সুতা কাটা হয়। সুতা বড় বড় কাঠিমে গুটাইয়া কাপড় বোনার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। এছাড়া যে সকল সুতা মার্সিরাইজ করা হয়, সেগুলির জন্য স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ভৌত ধর্ম (Physical Properties)—তুলা-তন্তু দেখিতে সাদা, অস্বচ্ছ, নমনীয়, কোমল কিন্তু দৃঢ় এবং স্থিতিস্থাপক। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ। অবশ্য তুলা-তন্তুর আঁশের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাস বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

আয়ারল্যাণ্ডে তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৬ সে. মি., মিশরে ৩·৫ হইতে ৪ সে. মি., আমেরিকান তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য ২·৫ হইতে ৩·৫ সে. মি. এবং ভারতীয় তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য ২ হইতে ২·৫ সে. মি.। ভারতীয় তুলার আঁশের ব্যাস ১/২৫০০ ইঞ্চি হইতে ১/৫০০০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসের উপরই উহার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে।

রাসায়নিক ধর্ম—প্রকৃতিগত দিক হইতে তুলা-তন্তু সেলুলোজ। উহার সহিত পেকৃটিক অ্যাসিড ও অন্যান্য জৈব অ্যাসিড, অল্প কিছু ধাতব পদার্থ, তুলার মোম, প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থও থাকে। স্বভাবতঃই তুলার রাসায়নিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন।

(১) জলের প্রভাব ঃ তুলা-তন্তু জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে অধিকতর দৃঢ় হয়। ফুটন্ত জলে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। তুলা-তন্তুর জল-শোষণ-ক্ষমতা আছে। কিন্তু ইহার জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। তাই ইহা সহজেই ভিজিয়া যায়।

(২) উত্তাপের প্রভাব ঃ তুলা-তন্তু তাপের সুসঞ্চালক। তাই উচ্চ তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। ফুটন্ত সাবান-জল অথবা অধিক উত্তপ্ত ইস্ত্রিতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না।

(৩) ক্ষারের প্রভাব ঃ ক্ষার দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে তুলা-তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। একমাত্র ঘন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ক্ষারে ইহা পরিষ্কার হয়। তবে রঙ্গিন কাপড়ে কাপড়-কাচা সোডা অথবা ক্ষারবহুল সাবান ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) অম্লের প্রভাব ঃ অজৈব অম্ল ব্যবহার করিলে তুলা-তন্তু গলিয়া যায়। জৈব অম্লের লঘু দ্রবণে তুলা-তন্তুর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তন্তুর উপর উহা শুকাইতে দিলে তন্তু ধীরে ধীরে পচিয়া যায়। এজন্যই ঘামে ভিজা পোশাক-পরিচ্ছদগুলি জলে কাচিয়া না রাখিলে তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়। কোন সময়ে দাগ তুলিবার জন্য অ্যাসিড ব্যবহার করিতে হইলে কাপড়খানি খুব ভালভাবে ধুইয়া রাখা উচিত।

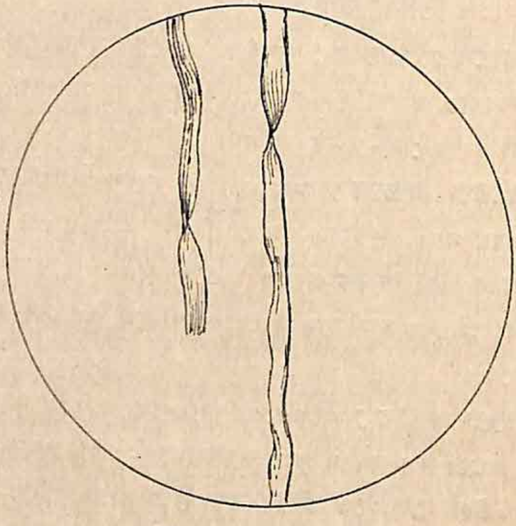
(৫) শুক্লীকরণ পদার্থের প্রভাব (Bleaching agent) ঃ Oxidising bleaching agent-গুলি* তুলা-তন্তুর উপর ব্যবহার করিলে তন্তুর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। একমাত্র ঘন হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে সুতা পচিয়া যায়। Reducing bleaching agent-ও** ব্যবহার করা

* Oxidising bleaching agents—ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন, পটাশ পারমাঙ্গানেট, হাইড্রোজেন পারকসাইড, সোডিয়াম পারকসাইড প্রভৃতি।

** Reducing bleaching agents—সালফার ডাই অক্সাইড, সোডিয়াম থায়সালফেট।

চলে। তবে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এই কাজ করিতে না পারিলে কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

(৬) **ধৌতির প্রভাবঃ** সুতার কাপড় সাবান-সোডায় ফুটাইয়া আছড়াইয়া কাচা চলে। ঘর্ষণে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। একমাত্র ফ্লানেল কাপড়গুলি তুলা-তন্তু দ্বারা প্রস্তুত হইলেও ঘষিয়া কাচা চলে না। উহার উপর অতি সূক্ষ্ম যে সুতাগুলি উঠিয়া থাকে, সেইগুলি ঘর্ষণের ফলে পড়িয়া যায়।



চিত্র নং—৪৭ : তুলা-তন্তু

তুলা-তন্তুর গঠন—তুলা-তন্তু কাঁচা অবস্থায় দেখিতে ফাঁপা নলের মতো। উহার দুই মুখ বন্ধ থাকে এবং তন্তুটি রসপূর্ণ থাকে। শুকাইলে উহা চ্যাপ্টাইয়া পাকানো ফিতার মতো দেখিতে হয়। ইহা এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে তবেই এই গঠন বোঝা যায়।

রঞ্জন-ক্ষমতা—গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই তুলা-তন্তু সহজে রং করা যায় না। আঠালো পদার্থ দ্বারা তুলা-তন্তুর দুইটি মুখই বন্ধ থাকে বলিয়া ভিতরে রং প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তাপ পাইলে মুখ খুলিয়া যায়। তখন উহার মধ্যে রং প্রবেশ করিতে পারে। তাই সুতির পোশাক রং

করিতে হইলে গরম জলে করিতে হয়। ক্ষারপদার্থ এবং লবণ প্রয়োগ করিলে রং সমভাবে ধরে এবং পাকা হয়। তুলা-তন্তুর জন্য মর্ডেন্ট রংগুলি উপযোগী।

মারসিরাইজেশন (Mercerization)—সাদা সুতা মারসিরাইজ করা হয়। প্রথমে সুতা সাবান-সোডায় ভাল করিয়া কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। তারপর সুতা বা কাপড় টানা অবস্থায় (under tension) ৫৫°—৬৫° ডিগ্রী টোয়াডেলের শক্তির শীতল কস্টিক দ্রবণ ২।৩ মিনিট ধরিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। তারপর প্রথমে একবার গরম জলে ধুইয়া পরে দুইবার শীতল জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। ধীরে ধীরে সুতাগুলিতে ঢিলা দিয়া ১° ডিগ্রি টোয়াডেল সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে ভিজাইয়া দিতে হয়। সর্বশেষে পরিষ্কার সাবান-জলে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ডাইলুট অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Dil. acetic acid) ব্যবহার করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

মারসিরাইজড করিলে সুতার শক্তি শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তদুপরি সুতার চাকচিক্য বহুগুণ বাড়িয়া যায় এবং জল-শোষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মারসিরাইজড সুতা 'ডাইরেক্ট' জাতীয় রংগুলির দ্বারা সহজে রং করা যায়।

লিনেন-তন্তু—তিসি গাছের ছাল হইতে যে তন্তু প্রস্তুত হয় তাহাকেই লিনেন-তন্তু বলা হয়। তিসি গাছের বাকল বা ছালকে ইংরাজীতে ফ্ল্যাক্স (Flax) বলে। এই ফ্ল্যাক্স হইতে যে আঁশ পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই লিনেন সুতা প্রস্তুত হয়।

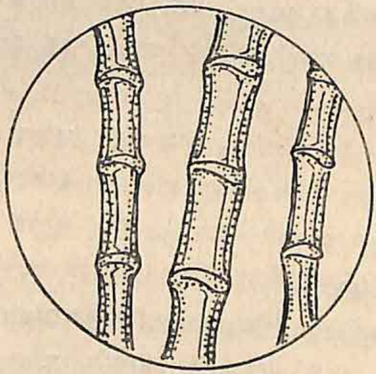
সরবরাহ—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তিসি জন্মায়। তন্মধ্যে বেলজিয়াম এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের তিসি সর্বোৎকৃষ্ট। ইটালি, ফ্রান্স ও ডেনমার্কের স্থান দ্বিতীয়। জার্মানি, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার তিসি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষে যে তিসি জন্মায় তাহার লিনেন শক্ত এবং মোটা, তাই ইহা দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

ভৌত ধর্ম—লিনেন কার্পাস অপেক্ষা শক্ত, উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। তুলা-তন্তু অপেক্ষা ইহা মসৃণ, কিন্তু ইহার ব্যাস তুলা-তন্তু অপেক্ষা অধিক। লিনেন-তন্তু তুলা-তন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী লম্বা—২৫ হইতে ৩০ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা

হয়। ঐ আঁশগুলি সামান্য পাক খাওয়াইয়া যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা hypochloride solution দ্বারা ব্লিচ করা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম—ইহাও প্রকৃতিগত দিক হইতে সেলুলোজ। সুতরাং উহার রাসায়নিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। ইহাতে শতকরা ৭০ ভাগ সেলুলোজ বর্তমান থাকে আর থাকে পেকটিক অ্যাসিড। এইজন্য লিনেনের সেলুলোজকে পেকটা সেলুলোজ বলে। তাছাড়া ইহাতে ১৫ হইতে ৩০ ভাগ অবিশুদ্ধ পদার্থ (impurities) থাকে।

(১) লিনেন-তন্তুর জল শোষণ করিবার ক্ষমতা অধিক। ইহা তুলা-তন্তু অপেক্ষা অধিক জল ধরিয়া রাখিতে পারে। উত্তাপের সুপরিবাহী বলিয়া অধিক উত্তাপ সহিতে পারে। ক্ষার সহিবার ক্ষমতাও তুলা-তন্তু অপেক্ষা অধিক। ডাইলিউটেড অ্যাসিড সলিউশনে ইহার কোন ক্ষতি হয় না, তবে ঘন অম্ল দ্রবণে সুতা পচিয়া যায়। ফুটাইয়া কাচিলে লিনেনের কোন ক্ষতি হয় না। আছড়াইয়া বা ঘষিয়া কাচিলেও লিনেন নষ্ট হয় না। তবে ইহার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ কমিয়া যায়।



চিত্র নং—৪৮ : লিনেন-তন্তু

লিনেন-তন্তুর গঠন—বিভিন্ন আকারের কোষ একত্রিত হইয়া লিনেন-তন্তু সৃষ্টি হয়। একপ্রকার আঠাল পদার্থ দ্বারা কোষগুলি সংলগ্ন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ইহাকে ঠিক বাঁশের মতো দেখায়। গোলাকৃতি দণ্ডের উপর প্রায় সমান দূর অন্তর অন্তর আড়াআড়ি গিঁট-গিঁট দাগ থাকে। সেই কারণেই এই তন্তুকে বাঁশের মতো মনে হয়।

রঞ্জন-ক্ষমতা—লিনেনে পেকটিক অ্যাসিড থাকে বলিয়া রং করা কঠিন। রঞ্জন-প্রণালী কার্পাসের ন্যায়।

র‍্যামি

ইহা একজাতীয় ঘাসের ডাঁটার ছালের আঁশ। ঐ আঁশ হইতে সুতা প্রস্তুত হয়। এই তন্তু খুব শক্ত, উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম এবং তুষার-ধবল। কিন্তু ইহা রঞ্জিত হয় না।

চীন এবং ভারতে ইহা জন্মায়। চীনের র‍্যামিকে চাইনিস গ্রাস বলা হয়। নেট্‌ল্ নামক উদ্ভিদ হইতেও র‍্যামির আঁশ পাওয়া যায়।

তন্তুর গঠন—তন্তুগুলি প্রায় একই মাপের হয়। লম্বা দিকে তন্তুর উপর কতকগুলি সমান্তরাল রেখা থাকে। ইহা দ্বারা গ্যাসম্যাণ্টল্ প্রস্তুত হয়।

পাট ও নারিকেল ছোবড়া

পাট—পাট গাছের বাকল হইতে পাওয়া যায়। পাট হইতে প্রধানতঃ চট প্রস্তুত হয়। একপ্রকার সিল্কের পোশাকও হয়। আর নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ঐ দড়ি দ্বারা পাপোশ, কার্পেট প্রভৃতি বোনা হয়।

পশম-তন্তু

ভেড়ার লোম হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহাকে পশম-তন্তু বলে। কিন্তু যে কোন লোমই পশম নহে। কুঞ্চিত, স্থিতিস্থাপক ও মিহি লোমই মাত্র পশম-পদবাচ্য হইতে পারে। পশমের উপর অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার রোঁয়া থাকে। সকল লোমে ইহা থাকে না। আর ঐ রোঁয়াগুলির জন্যই পশম খসখসে হয়।

পশমের উৎপত্তি এবং ইতিহাস—মানুষ সর্বপ্রথম পশম-তন্তুর ব্যবহার শিখিয়াছিল। সাধারণতঃ ভেড়ার লোম হইতেই পশম প্রস্তুত হয়। কিন্তু আলপাকা, উট এবং একশ্রেণীর খরগোশের লোমও পশম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। ভেড়ার দেহ হইতে পশম কাটিয়া লইবার পর ঐগুলি সাবান-সোডা দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধোয়া হয়। লোমগুলিকে আঁচড়াইয়া সমান করা হয়। তারপর পাঁজ প্রস্তুত করিয়া সুতা কাটা হয়। সুতার ফেটিগুলি ব্লিচ করিয়া একেবারে সাদা ধবধবে করিয়া ফেলা হয়। যেগুলি রং করা হয় সেগুলি ব্লিচ করিবার প্রয়োজন হয় না।

সরবরাহ—অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে পশম আমদানী হয়। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানেও প্রচুর পশম প্রস্তুত হয়। উৎপাদনের দিক হইতে অস্ট্রেলিয়া অগ্রাধিকার পাইলেও, ইংল্যাণ্ডের পশমই গুণের দিক হইতে সর্বোৎকৃষ্ট। ভারত ও পাকিস্তানের পশমের মান অনেক নীচু।

পশমের গুণাগুণ বা ধর্ম

ভৌত-ধর্ম—পশম নরম, খসখসে, স্থিতিস্থাপক, নমনীয় কিন্তু দৃঢ়। ইহা অস্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম। পশম-তন্তু দীর্ঘ। তবে পশুভেদে দৈর্ঘ্যে পার্থক্য দেখা যায়। গড়ে পশম-তন্তু ৬ সে. মি. দীর্ঘ হয়। অবশ্য ২০ হইতে ২৫ সে. মি. দীর্ঘ পশম-তন্তুও হয়। ইহার স্বাভাবিক রং ঈষৎ হরিদ্রাভ। সকল তন্তু অপেক্ষা পশম অধিক স্থিতিস্থাপক।

রাসায়নিক ধর্ম—প্রাণিজ তন্তু হিসাবে ইহার রাসায়নিক উপাদান ও গঠন উদ্ভিজ্জ তন্তু হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে শতকরা ৫০ ভাগ কার্বন, ৭ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ২৫ ভাগ অক্সিজেন ছাড়াও ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২ ভাগ গন্ধক আছে। পশমই হইল একমাত্র প্রাণিজ তন্তু যাহাতে গন্ধক আছে। ইহা ভিন্ন পরিষ্কার করিবার পূর্বে ইহাতে ধুলা-ময়লা এবং মোম-জাতীয় পদার্থ থাকে। আর থাকে ক্যারটিন।

(১) জল-শোষণ : পশম তন্তুর জল-শোষণ-ক্ষমতা সর্বাধিক। তাই শতকরা ১২ হইতে ১৫ ভাগ জলীয় বাষ্প (moisture) ইহাতে সকল সময় থাকে। ৩০ ভাগ জলীয় বাষ্প শোষণ করিবার পরও ইহা ভিজিয়া যায় না। এই কারণেই নগ্ন দেহে পশম-বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে ; উহা ঘামের সহিত ময়লা শুষিয়া লয়।

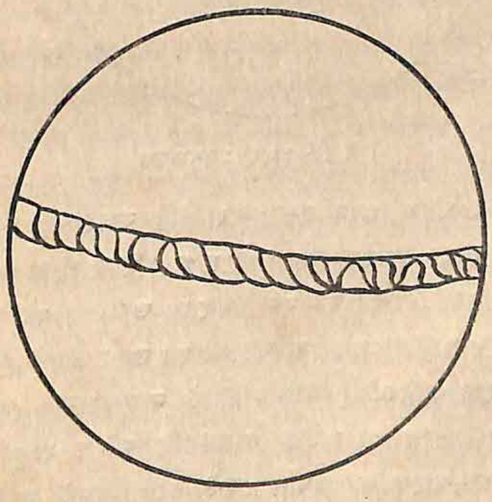
(২) দ্রাব্যতা : ইহা জল এবং অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। কিন্তু শতকরা ২০ ভাগ হাইপোক্লোরাইড সলিউশনে দ্রবীভূত হয়।

(৩) উত্তাপের প্রভাব : পশম তাপের কুপরিবাহী। এই কারণেই পশম দ্বারা শীত-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অতি উত্তাপ সহিবার ক্ষমতা ইহার নাই। ধৌতির সময় ফুটন্ত জল, এবং ইস্ত্রি করিবার সময় অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে পশম নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) ক্ষার ও অম্লের প্রভাব : পশমের ক্ষার-সহন-ক্ষমতা নাই। ৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডার সলিউনে মুখঢাকা পাত্রে দশ মিনিট ফুটাইলে পশম গলিয়া যায়। কিন্তু অম্ল সহিবার ক্ষমতা পশমের আছে। সাধারণ জৈব অম্লে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। তবে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে ফুটাইলে ইহা কালো হইয়া পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে। মৃদু বা diluted অম্ল দ্রবণে ইহার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। অ্যামোনিয়ার মতো মৃদু ক্ষার পশমে প্রয়োগ করা চলে, কিন্তু তাহার পর খুব ভালভাবে ধুইয়া ফেলা উচিত। ইহাতে মৃদু শুক্লীকরণ পদার্থ (bleaching agent), যেমন মৃদু হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও সোডিয়াম পারবোরেট দ্রবণ ব্যবহার করিলে তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না।

ধৌতি—নিরপেক্ষ সাবানে, মাঝারি গরম ও নরম (soft) জলে পশম কাচিলে পশমের কোন ক্ষতি হয় না। জলের উত্তাপের তারতম্য হইলে অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উত্তাপ একরূপ না থাকিলে, অথবা জল ফুটন্ত হইলে পশম জমিয়া চটের মতো হইয়া যায়। আছড়াইয়া অথবা ঘষিয়া কাচিলেও এরূপ হয়।

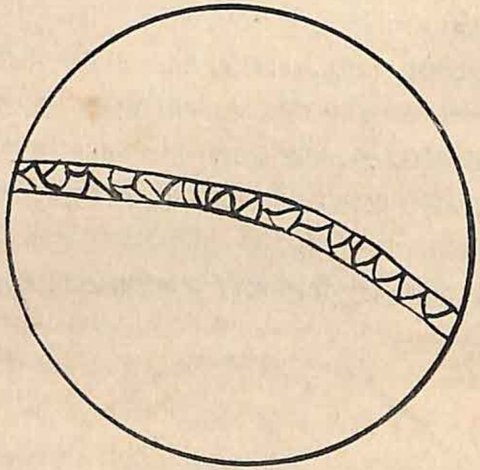
পশম-তন্তুর গঠন—অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে পশম-তন্তুকে



চিত্র নং—৪৯(ক) : পশম-তন্তু

একটি শিকল বা মইয়ের মতো দেখায়। একটি দণ্ডের উপর মাছের গায়ের আঁশের মতো সামনে সামান্য বাড়ানো এড়ো কতকগুলি দাগ দেখা যায়।

পশম-তন্তুর অণুকোষগুলির বিন্যাস এমন যে একটির অগ্রভাগ আর একটির পশ্চাদভাগের উপর ন্যস্ত থাকে। তাই উহা মাছের গায়ের আঁশের মতো দেখিতে লাগে। এরূপ কোষ-বিন্যাসের জন্যই পশমের স্থিতিস্থাপকতা এত বেশী। নীচের ছবিগুলিতে একটু লক্ষ্য করিলেই মাছের আঁশের মতো তন্তুগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে।



চিত্র নং—৪৯(খ) : পশম-তন্তু

ফেল্টিং—অতিরিক্ত গরম জল অথবা ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে, অথবা যে কোন ভাবেই হোক, অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পশম জমিয়া যায়। ইহাকেই 'ফেল্ট করা' বলে। ঘন ঘন উত্তাপের তারতম্য ঘটাইলেও পশম ফেল্ট করে। উত্তাপ পাইলে পশম সংকুচিত হয়। তখন একটি কোষ আর-একটি কোষের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া যায়। টানিলে আবার সোজা হইয়া যায় বা পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উক্ত কারণগুলি ঘটিলে সংকুচিত পশম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না অর্থাৎ ফেল্ট করে। ফেল্ট করিলে পশম স্থিতিস্থাপকতা হারাইয়া ফেলে।

রেশম
(Silk)

গুটিপোকার লালা হইতে যে তন্তু পাওয়া যায় তাহাকে বলে রেশম-তন্তু। সুতরাং রেশম-তন্তু প্রাণিজ। ইহার সংস্কৃত নাম চীনাংশুক। রেশমের জন্মভূমি চীন দেশ। রেশম শিল্প তাই চীন দেশেরই একচেটিয়া শিল্প ছিল। তখন এশিয়ার কোন কোন দেশে বন্য রেশম প্রস্তুতের প্রচলন ছিল। সুদীর্ঘ তিন হাজার বৎসর কাল রেশম-শিল্প একমাত্র চীন দেশেই একচেটিয়া থাকার পর চীন হইতে প্রথম জাপান, ক্রমে পারস্য, তুরস্ক, ইটালি, ফ্রান্স ও ভারতে ইহার প্রবর্তন হয়। পৃথিবীতে যত রেশম উৎপন্ন হয় তাহার অর্ধেক রেশম আজও চীন উৎপন্ন করে। ভারতে কাশ্মীর এবং মহীশূর রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

রেশম প্রস্তুত—রেশম-কীট বা গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। এইজন্য রেশম-কীট পালন করা হয়। রেশম-কীট তুঁত, রেড়ি, ভ্যারাণ্ডা প্রভৃতির পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। বিভিন্ন সেরিকালচার (sericulture) কেন্দ্রে এই সকল বৃক্ষ চাষ করা হয়। বাংলাদেশে রেশম কীটকে বলা হয় 'পলু'। পলুগুলির জীবনবৃত্তান্ত বড় অদ্ভুত ধরনের। উহারা পরিণত হইলে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে লার্ভা (larva) বা শূককীট বাহির হয়। তখনও পর্যন্ত কীটগুলির পাখা থাকে না। যখন উহারা পক্ষোদ্গমের পূর্বাবস্থায় আসে তখন উহাদের 'পিউপা' বলা হয়। পিউপার মুখের নিম্নের ছিদ্র দিয়া আঠাল লালা (সুতার মতো পদার্থ) বাহির হইতে থাকে। ঐ লালাতে স্পষ্টতঃ দুইটি 'নাল' বা খেই থাকে। লালা বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্র শক্ত রেশম-তন্তুতে পরিণত হয়। লালা বাহির হওয়ার সাথে সাথে পিউপা নিজের চারিপার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। ফলে উহা নিজের লালা-প্রাচীরের মধ্যে আটকাইয়া পড়ে। তখন উহাকে বলা হয় **গুটি** বা **ককুন**। দুই হইতে চারিদিন পরে উহা খোলস ছাড়িয়া পুত্তলি হয়। তখন উহার পক্ষোদ্গম শুরু হয়। ঠিক এই সময় গুটিটি গরম জলে দিয়া মারিয়া ফেলিতে না পারিলে পুত্তলি মথে পরিণত হয় এবং সুতার গুটির একদিক কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। ককুন তৈয়ারির ৯।১০ দিন পরে মথ গুটি কাটিয়া বাহির হয়। তার মধ্যেই গুটি জলে সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা

করা উচিত ; কাটা গুটি হইতে ভাল রেশম প্রস্তুত হয় না, 'span silk' প্রস্তুত হয়। গরম জল অথবা গরম বাষ্পের সাহায্যে গুটিগুলি মারিয়া ফেলার পর সাবান-জলে ফুটাইলে উহাদের উপর হইতে এক পরদা শুষ্ক কঠিন লালা উঠিয়া যায়। তখন সুতার খেই বা নাল দেখিতে পাওয়া যায়। মিহি সুতার জন্য পাঁচ হইতে সাতটি ককুনের এবং মোটা সুতার জন্য পনের হইতে কুড়িটি ককুনের মাথা একত্র করিয়া চরকির সাহায্যে রেশমের ফেটি প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে রেশম রীল করা (reeling) বলে। প্রত্যেকটি ককুনের ১/২ হইতে ২/৩ অংশ রীল করা যায় ; বাকী অংশটি হইতে span silk প্রস্তুত হয়। যাহা ফেটি করা গেল তাহা কাঁচা রেশম বা raw silk.

সাংগঠনিক উপাদান (Composition)—রেশম-কীটের লালাগ্রন্থি হইতে যে লালা বাহির হয় তাহা মুখের আঠাল পদার্থের সহিত মিশিয়া যায়। লালা হইতে ফাইব্রইন (fibroin) প্রস্তুত হয় আর আঠাল পদার্থ হইতে সেরিসিন (cericin) প্রস্তুত হয়। কাঁচা রেশমে ৭৫ শতাংশ ফাইব্রইন এবং ২৫ শতাংশ সেরিসিন থাকে। ফাইব্রইন হইল রেশম-সুতার প্রকৃত উপাদান আর সেরিসিন হইল উহার উপরের উজ্জ্বল আবরণ। প্রকৃতিগত দিক হইতে ফাইব্রইন এবং সেরিসিন উভয়েই প্রোটিন। সুতরাং রেশম-তন্তুর রাসায়নিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন ($C_{15}H_{23}N_5O_6$)। ফাইব্রইন এবং সেরিসিন উভয়ের রাসায়নিক সংগঠনই জটিল এবং প্রায় একরূপ।

রেশম-তন্তুর গুণাগুণ বা ধর্ম

ভৌতধর্ম—রেশম কোমল, মসৃণ এবং উজ্জ্বল কিন্তু অস্বচ্ছ। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং সূক্ষ্ম। ইহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ আছে তবে তাহা পশমের মতো নহে।

রাসায়নিক ধর্ম—(১) জলের প্রভাব এবং বিশোষণ-ক্ষমতা : রেশম-তন্তুতে ১১ শতাংশ জলীয় পদার্থ বা moisture থাকে। শীতল জলে রেশম কাচিলে ইহাতে সামান্য কাঠিন্য আসে। রেশম-তন্তু জল শোষণ করিতে পারে। ৩৩ ভাগ জল শোষণের পরও ইহা ভিজিয়া যায় না। এইজন্য ইহা ভিতরের পোশাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে জলধারণ-ক্ষমতা পশমের মতো অত বেশী

নহে। রেশম কতকগুলি ধাতব লবণ বা metallic salt এবং জৈব অম্ল (organic acid) বিশোষণ করে। ইহারা তন্তু-মধ্যে প্রবেশ করিলে তন্তুটি ফুলিয়া উঠে। মাত্রাধিক্য ঘটিলে তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। কাচিলেও ইহারা বাহির হয় না। এই অবস্থায় রৌদ্রে দিলে দ্রুত পচিয়া যায়। এই কারণেই পোশাকে ঘাম শুকাইলে উহা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়।

(২) উত্তাপের প্রভাব : রেশম তাপের কুপরিবাহী। অতি উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। তাই রেশম বস্ত্র শীতকালে অন্তর্বাস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। রেশম-ধৌতির সময় মাঝারি গরম জল এবং মাঝারি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা উচিত।

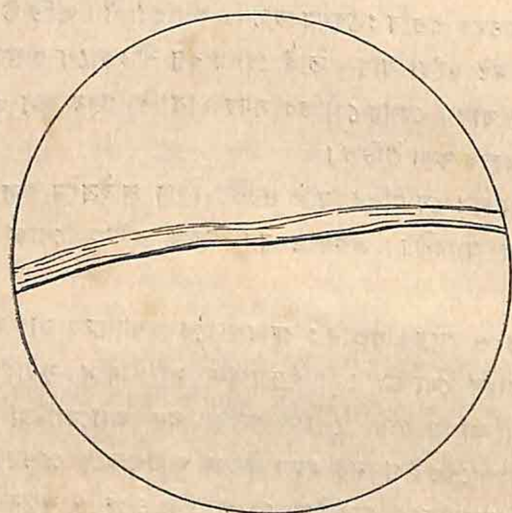
(৩) দ্রাব্যতা : সেরিসিন জলে দ্রবণীয়, কিন্তু ফাইব্রইন জল, অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়। একমাত্র ঘন উত্তপ্ত কস্টিক সোডা সলিউশনে দ্রবণীয়।

(৪) ক্ষার ও অম্লের প্রভাব : ক্ষার-দ্রবণে রেশম দ্রুত জীর্ণ হয়। পশমের মতো ৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সলিউশনে ফুটাইলে রেশমও গলিয়া যায়। কাপড়-কাচা সোডা অথবা ঘন অ্যামোনিয়া বা কপার অক্সাইডের সংস্পর্শেও ইহা নষ্ট হয়। উত্তপ্ত ক্ষার-দ্রবণে রেশম বিবর্ণ হইয়া যায়, ঔজ্জ্বল্য সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে এবং রুক্ষ ও কঠিন হইয়া উঠে, রেশমের স্থিতিস্থাপকতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। অ্যামোনিয়া দ্রবণে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। বরং ঠাণ্ডা জলে অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে রেশম-তন্তুর কাঠিন্য বৃদ্ধি পায় এবং অম্লভাব দূর হয়।

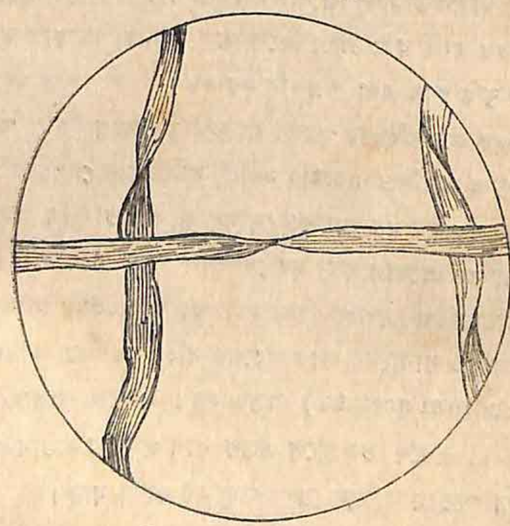
রেশম-তন্তুর অম্ল সহিবার ক্ষমতা আছে। মৃদু অম্লে ইহার ক্ষতি হয় না। শীতল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (acetic acid) সলিউশনে রেশমের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রেশম-তন্তু মৃদু অ্যাসিড শোষণ করে। তাই যে সমস্ত পোশাকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয় সেইগুলি পরে সাবান দিয়া কাচিবার পূর্বে মৃদু অ্যামোনিয়া দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহা না হইলে অ্যাসেটিক অ্যাসিড সাবানের ক্ষার অংশের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম অ্যাসিটেট (sodium acetate) প্রস্তুত হয়। ইহাতে কাপড়ে একরূপ দাগ হয়। অ্যামোনিয়া দ্রবণে ভিজাইলে এরূপ দাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঘন অজৈব অম্ল প্রয়োগ করিলে রেশম-তন্তু নষ্ট হইয়া যায়।

(৫) শুক্লীকরণ পদার্থ (Bleaching) : হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং সোডিয়াম পারবোরেটের মৃদু দ্রবণে রেশমের ক্ষতি হয় না। অবশ্য পরে ভালভাবে ধুইয়া ফেলা উচিত।

রেশম-ধৌতি—চাপ ও ঘর্ষণে রেশম-তন্তু দুর্বল হইয়া যায়। তাই আছড়াইয়া অথবা ঘষিয়া কাচা উচিত নয়।



চিত্র নং—৫০ : রেশম-তন্তু



চিত্র নং—৫১ : বন্য রেশম

রেশম-তন্তুর গঠন—রেশম-তন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দণ্ডের মতো দেখায়। বন্য রেশমে ঐ দণ্ডের মধ্যে কতকগুলি সমান্তরাল লম্বা লম্বা রেখা দেখা যায়।

অনুশীলনী

বয়ন-তন্তুর শ্রেণীবিভাগ—

E. ১৯৬০ (৫) বয়নশিল্পে যে সমস্ত প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার হয় তাহাদের নাম কর। উহাদের উৎস বল। কেমন করিয়া উহাদের চিনিবে?

উঃ সং—(১) প্রাকৃতিক তন্তুগুলির নাম। (২) উহাদের উৎস। (৩) চিনিবার উপায়। (প্রশ্নের শেষাংশ একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)।

E. ১৯৬৬ (৯) উৎস অনুযায়ী বয়ন-তন্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ কর। কেমন করিয়া উহাদের চিনিবে?

উঃ সং—(১) উৎস অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। (২) তন্তু চিনিবার উপায়। (একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)।

E. ১৯৬৫ (৯) বয়ন-তন্তুগুলির কেমন করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিবে? পশম-তন্তুর এমন কতকগুলি গুণের উল্লেখ কর যেগুলি থাকার জন্য উহারা বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উঃ সং—(১) উৎস অনুযায়ী বয়ন-তন্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ। (২) পশম-তন্তুর গুণাবলী—(ক) ভৌত গুণাবলী, (খ) উত্তাপের কুপরিবাহী, (গ) জলশোষণ ক্ষমতা এবং (ঘ) ধৌতি (washability)।

তুলা ও লিনেন-তন্তু—

E. ১৯৬২ (৮) বয়ন শিল্পে কি কি তন্তু ব্যবহার হয়? তুলা-তন্তুর সহিত রেশম-তন্তুর পার্থক্য কি?

উঃ সং—(১) প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বয়ন-তন্তুগুলির নাম, (২) তুলা-তন্তুর সহিত রেশম-তন্তুর পার্থক্য—(ক) উৎপত্তি, (খ) গঠন, (গ) ভৌত ধর্ম, (ঘ) রাসায়নিক ধর্ম এবং (ঙ) ধৌতির ক্ষেত্রে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করিতে হইবে।

E. ১৯৬৩ (৭) তুলা-তন্তু সম্বন্ধে তুমি কি জান বল। লিনেন-তন্তুর সহিত ইহার পার্থক্য কি?

উঃ সং—(১) তুলা-তন্তুর উৎপত্তি, গঠন, ভৌত গুণ, রাসায়নিক গুণ, রঞ্জনক্ষমতা। (২) লিনেন-তন্তুর সহিত উক্ত গুণগুলির পার্থক্য।

E. ১৯৬৫ (৭) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(ক) সেলুলোজ।

উঃ সং—(১) ভূমিকা, (২) ভৌত গুণ, (৩) রাসায়নিক গুণ এবং (৪) ব্যবহারিক মূল্য।

E. ১৯৬৬ (১০) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(ক) মার্শিরাইজেশান।

উঃ সং—(১) উদ্দেশ্য, (২) পদ্ধতি এবং (৩) ফল।

পশম-তন্তু

E. ১৯৬১ (৮) পশম-তন্তু সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। রেশম-তন্তুর সহিত ইহার পার্থক্য কি?

উঃ সং—(ক) পশম-তন্তুর উৎস, (খ) পশম প্রস্তুত, (গ) পশম-তন্তুর গঠন, (ঘ) পশম-তন্তুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম। পশম-তন্তুর সহিত রেশম-তন্তুর উক্ত গুণগুলির পার্থক্য।

E. ১৯৬৮ (৯) পশম-তন্তুর ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণগুলি বল।

উঃ সং—(১) ভৌত ধর্ম এবং (২) রাসায়নিক ধর্ম।

রেশম-তন্তু

E. ১৯৬০ (৫) রেশম-তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি কি? রেশম পোশাক ধৌতির জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে?

উঃ সং—(১) রেশম-তন্তুর উৎপত্তি, (২) গঠন, (৩) ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম। (৪) রেশম পোশাক ধৌতির পদ্ধতি (দশম শ্রেণীর পাঠ্যে রেশম-ধৌতি দেখ)।

E. ১৯৬৯ (৭) রেশম-তন্তু সম্বন্ধে কি জান বল। পশম-তন্তুর সহিত ইহার পার্থক্য কি কি?

উঃ সং—(১) রেশমের উৎপত্তি, (২) ইতিহাস, (৩) গঠন, (৪) ভৌত গুণ, (৫) রাসায়নিক ধর্ম। (৬) পশমের সহিত রেশমের পার্থক্য।

E. ১৯৬০ (৭) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(ক) সেরিসিন।

উঃ সং—(১) ভূমিকা, (২) ভৌত গুণ এবং (৩) রাসায়নিক গুণ।

বস্ত্রধৌতি

(Laundry)

ময়লা কাপড় কাচিয়া পরিষ্কার করা হয়। এই কার্য প্রতিটি পরিবারই করিয়া থাকেন। কিন্তু কাপড় কেন ময়লা হয় তাহা লইয়া কেহই মাথা ঘামান না। অথচ কাপড় কেন ময়লা হয় তাহা জানিলে কাপড় কাচিবার সুবিধা হয়; ময়লার প্রকৃতি অনুযায়ী পরিষ্কারক ব্যবহার করা যায়।

কাপড় ময়লা হইবার কারণ—কাপড় ময়লা হইবার প্রধান কারণ ধূলা-বালি। বাতাসের সহিত ধূলা উড়িয়া আসিয়া পোশাক-পরিচ্ছদে লাগিয়া যায়। আবার ধূলা-ময়লার উপর বসিলে অথবা শুইলেও পোশাকে ধূলা লাগে। এই ধূলা প্রথমে আলগাভাবে পোশাকের জমিনে লাগিয়া থাকে, পরে ঘাম এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিয়া তন্তু মধ্যে চিটা হইয়া বসিয়া যায়। ময়লা চিটা হইবার আর-একটি কারণ তৈলাক্ত পদার্থ। ধোঁয়ার সহিত এবং ঘামের সহিত তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। উহা পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদে লাগিলে ধুলা চিটা হইয়া বসিয়া যায়। ইহার উপর কোন কিছুর ছোপ বা দাগ লাগিলে কাপড়খানি আরও ময়লা দেখায়। ময়লা কাপড় কাচিয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

বস্ত্রধৌতির প্রয়োজন—ময়লা কাপড় কেবল অসুন্দরই নহে, ইহা অস্বাস্থ্যকরও বটে। ধুলা, ধোঁয়া এবং ঘামের সহিত অসংখ্য রোগজীবাণু থাকে। চর্মের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা রোগ সংক্রমণ করে। ময়লা কেবল স্বাস্থ্যের ক্ষতিই করে না, কাপড়ের জমিনটিও নষ্ট করে। ঘামের সহিত, কলকারখানার ধোঁয়ার সহিত যে অম্ল পদার্থ থাকে তাহা অধিক দিন তন্তুতে থাকিলে তন্তুগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কাপড়খানি তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়। সুতরাং ময়লা হইবামাত্র কাপড়-জামা কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত।

বস্ত্রধৌতি—আলগা ধুলা জলে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যায়। কিন্তু তেলচিটা ময়লা জলে দ্রবীভূত হয় না। এজন্য উত্তাপ এবং সাবান ও অন্যান্য ক্ষারদ্রব্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। উত্তাপ পাইলে তেল গলিয়া

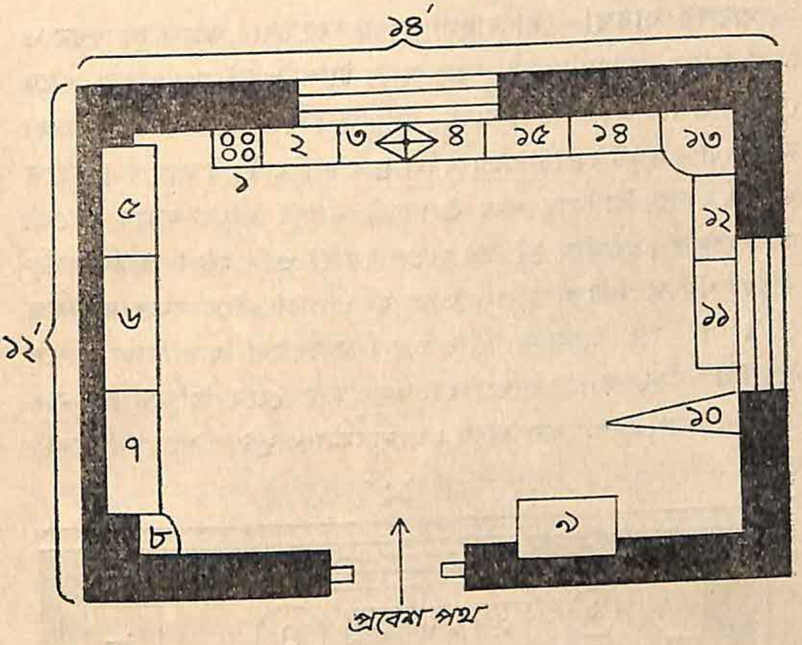
যায়, ময়লা আলগা হইয়া যায়। উত্তপ্ত জলে ক্ষারদ্রব্য, সাবান বা ডিটারজেণ্ট মিশাইলে জলের দ্রবণ-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জলের ক্ষারের সহিত তন্তুমধ্যস্থ তৈলের যে বিক্রিয়া হয় তাহার ফলেই তেল অতি ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইয়া সাবান-জলে আসিয়া মেশে। ধূলিকণাগুলি জলে দ্রবীভূত হয়। ইহাতে কাপড়খানি পরিষ্কার হয়। অবশ্য এজন্য কিছু বাহ্যিক প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন হয়, যেমন—আছড়ানো, থোপানো, নিংড়ানো, পিটানো প্রভৃতি। এই সকল প্রক্রিয়া চালাইবার জন্য নানারূপ সাজ-সরঞ্জামও পাওয়া যায়।

সুতরাং বস্ত্রধৌতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বস্ত্রধৌতির উপকরণ, সাজসরঞ্জাম এবং বস্ত্রধৌতির ঘর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকা একান্ত দরকার।

বস্ত্রধৌতির ঘর
(Laundry room)

বাড়ীতে কাপড় কাচিবার জন্য একখানি ঘর থাকিলে সুবিধা হয়। স্নানের ঘরে কাপড় কাচিলে সাবান-জলের ছিটা লাগিয়া দেওয়াল অপরিষ্কার হয় এবং স্নানেরও অসুবিধা হয়। পুকুরে বা নদীতে কাপড় কাচা উচিত নহে, জল দূষিত হয়। তাছাড়া কাপড় কাচিবার প্রতিটি সরঞ্জাম পুকুরঘাটে বহিয়া লইয়া যাওয়াও অসুবিধাজনক। বাড়ীতে কাপড় কাচিবার একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকিলে এইসকল অসুবিধা হয় না। স্বতন্ত্র একখানি ঘর রাখা সম্ভব না হইলেও উঠান বা বারান্দার একপাশ ঘিরিয়া লইয়া কাপড় কাচার ঘর করা যাইতে পারে। কাপড় কাচার ঘর থাকিলে সকল সরঞ্জাম সেই ঘরে গুছাইয়া রাখা যায়, কাজ করিতে গিয়া অযথা সময় নষ্ট হয় না।

অবস্থান—কাপড় কাচার ঘরটি রান্নাঘরের পার্শ্বে হইলে ভাল হয়। রান্নাঘরের উনুনটিতেই তাহা হইলে কাপড় সিদ্ধ করা বা গরম জল করিবার ব্যবস্থা করা যায়। সেক্ষেত্রে কাপড় কাচার ঘরে স্বতন্ত্র উনুন রাখিবার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বৃষ্টি-বাদলের দিনে রান্নাঘরের মধ্যে কাপড়-জামা শুকানোর ব্যবস্থা করিলে উনুনের উত্তাপে তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। রন্ধনশালাটি বেশ বড় হইলে তাহারই এক পার্শ্বে কাপড় কাচার ব্যবস্থা করা যায়।

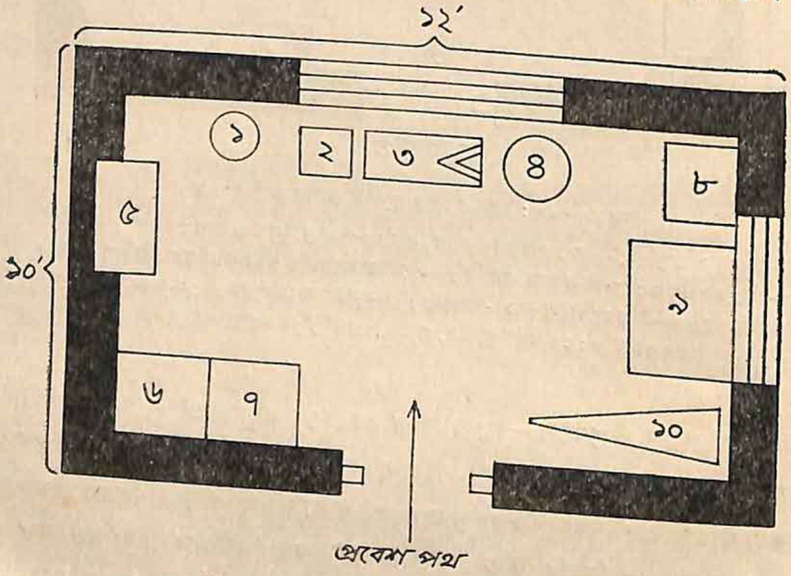


চিত্র নং—৫২ : রন্ধনশালার মধ্যেই কাপড় কাচিবার স্থান

১-উনুন ; ২-প্রস্তুতি টেবিল ; ৩-রন্ধনশালার সিঙ্ক ; ৪-লন্‌ড্রি, সিঙ্ক ও কল ; ৫-মশলার তাক ; ৬-বাসনের তাক ; ৭-জাল আলমারি ; ৮-রেফ্রিজারেটার ; ৯-লন্‌ড্রির জিনিস রাখার আলমারি ; ১০-ইস্ত্রির টেবিল ; ১১-আলনা ; ১২-ড্রাইং ক্যাবিনেট ; ১৩-ময়লা কাপড়ের বিন্ বা ঝুড়ি ; ১৪-বালতি, মগ, গামলা প্রভৃতি ; ১৫-ওয়াশিং মেশিন।

দেওয়াল ও মেঝে—বস্ত্রধৌতি ঘরের মেঝে এবং দেওয়াল পাকা হওয়া আবশ্যক। মাটির মেঝেতে জল পড়িলে কাদা হয়। তবে মেঝে খুব মসৃণ করা উচিত নহে। কারণ মসৃণ মেঝেতে সাবান-জল পড়িলে পিছল হয়। দেওয়ালের ১·২ মিটার উচ্চ পর্যন্ত সিমেণ্ট করা থাকিবে এবং বড় বড় জানালা থাকিবে। জানালা থাকিলে প্রচুর বায়ু সঞ্চালন হয়, ঘরের মধ্যে যে পোশাকগুলি শুকানো হয় সেগুলি দ্রুত শুকাইয়া যায়। মেঝেতে ফাটল বা গর্ত থাকিলে ঘরের মধ্যে জল জমিবে। মেঝের ঢাল খুব ভাল হইবে এবং জল নিকাশের জন্য একটি ভাল নরদামা থাকিবে। ঘরটিতে যথেষ্ট জানালা না থাকিলে ভাল আলোর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কাচিবার সময় এবং ইস্ত্রি করিবার সময় প্রচুর আলোর প্রয়োজন।

জলের ব্যবস্থা—বলা বাহুল্য কাপড় কাচিবার জন্য প্রচুর গরম ও ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন। যে সকল স্থানে ট্যাপ ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঐ ঘরে একটি কলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। আর যেখানে তাহা নাই সেখানে একটি বড় চৌবাচ্চা অথবা ড্রাম রাখিয়া ট্যাপ লাগাইয়া লইতে হইবে। কাপড় কাচিবার সময় ঐ পাত্রটি জলপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কলের তলায় চারিপার্শ্বে দুই তিন হাত পর্যন্ত ইট ও সিমেণ্ট দিয়া একটু উঁচু করিয়া গাঁথিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়; তাহা হইলে সমস্ত ঘরে জল ছড়ায় না। যদি কাপড় কাচিবার জন্য সিঙ্ক বসানো যায় তাহা হইলে দাঁড়াইয়া কাপড় কাচার সুবিধা হয়, তখন আর মেঝে ঘিরিতে হয় না। সিঙ্ক ঠিক কলের মুখে, মেঝে হইতে ৯১ সে. মি. (৩ ফুট) উপরে থাকিবে।



চিত্র নং—৫৩ : ধৌতাগারের সরঞ্জাম বিন্যাস

১-উনুন ; ২-ওয়াশিং মেসিন ; ৩-কাপড় কাচিবার চাতাল ; ৪-জলের কল ; ৫-দেওয়াল আলমারিতে মগ, বালতি, গামলা ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা ; ৬-কাপড় কাচিবার অন্যান্য উপকরণ রাখার আলমারি ; ৭-ময়লা কাপড়ের ঝুড়ি ; ৮-কাপড় শুকানোর আলমারি ; ৯-ইস্ত্রি-করা কাপড় রাখার আলনা ; ১০-ইস্ত্রির টেবিল।

সাজ-সরঞ্জাম—কাপড় কাচিবার সকল প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এই ঘরে থাকিবে, যেমন—উনুন, কাপড় ফুটানোর হাণ্ডা বা boiler, কাপড় ভিজানোর

গামলা, বালতি-মগ, পাটা, পিটনে, চিমটা, ইস্ত্রি, ইস্ত্রিবোর্ড, আলমারি প্রভৃতি। এইসকল সরঞ্জাম এমনভাবে সাজাইতে হইবে যে কাজের সময় যেন প্রত্যেকটি জিনিস পাওয়া যায়।

সরঞ্জাম বিন্যাস—জলের কলটি এবং কাপড় কাচিবার স্থান জানালার ঠিক নীচে হইলে কাপড় কাচিবার সময় প্রচুর আলো পাওয়া যায়। কাপড় কাচিবার উপকরণ এবং বালতি মগ গামলা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিবার জন্য একটি তাক ও দেওয়াল-আলমারি প্রয়োজন। ইহা উনুনের নিকট এবং কাপড় কাচিবার স্থানের পার্শ্বে হইলে জিনিস লওয়ার সুবিধা হয়। ইস্ত্রি এবং ইস্ত্রির টেবিলটি ইলেকট্রিক সুইচের ঠিক তলায় থাকিবে। উহার নিকট জানালার সম্মুখে একটি আলনা থাকিবে। ইস্ত্রি করা কাপড়গুলি উহার উপর রাখা হইবে। কাপড় কাচিবার স্থানে বা বেসিনের পার্শ্বে জানালার তলায় একটি ভিজা কাপড় রাখার জন্য বড় মসৃণ রড লাগানো থাকিবে। এ ছাড়া ওয়াশিং মেসিন ও ড্রাইং ক্যাবিনেটও থাকে।

কাপড় কাচিবার সরঞ্জাম

(Laundry equipments)

বস্ত্রধৌতির তিনটি স্তর আছে। ঐ তিনটি স্তরের জন্য তিনশ্রেণীর সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়, যথা—(১) প্রস্তুতিকরণের সরঞ্জাম, (২) বস্ত্রধৌতির সরঞ্জাম এবং (৩) শুকানো ও ইস্ত্রি করিবার সরঞ্জাম বা পরিশেষ-ক্রিয়ার (finishing) সরঞ্জাম।

(১) প্রস্তুতিকরণের সরঞ্জাম : ময়লা কাপড় আনিয়া প্রথমে জড়ো করিয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় ঝুড়ি অথবা বেতের বিন (bin) বা বাস্কেট। বেতের বাস্কেটগুলির মধ্যে রঙ্গিন কাপড়ের অন্তর দেওয়া থাকে। তাই এইগুলি দেখিতেও বেশ শৌখিন। এছাড়া কাগজ, পেন্সিল, ছুঁচ-সুতা, স্কেল, কাঁচি প্রভৃতি মাপ রাখা, ছেঁড়া সেলাই করা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয়।

কাচিবার পূর্বে কাপড় ভিজাইবার জন্য প্রয়োজন হয় কাঠের বা মাটির গামলা। বালতি এবং এনামেলের বড় গামলাতেও এ কাজ করা যায়। ভিজাইবার পাত্রগুলি 'non-rusting' বা মরিচা ধরে না এবং ক্ষারপদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয় না এমন ধাতুর হওয়া উচিত, যেমন—গ্যালভানাইজ্‌ড

শিটের বালতি অথবা প্লাস্টিকের বালতি বা গামলা। এইগুলি হালকা। প্লাস্টিকে কোন শব্দ হয় না। মাটি অথবা কাঠ অত্যন্ত ভারী, নচেৎ সেগুলিতেও ক্ষারের প্রতিক্রিয়া হয় না বা মরিচা ধরে না।

(২) কাপড় কাচিবার সরঞ্জাম—[ক] উনুন—কয়লার বড় উনুন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উহা বড় জলপাত্র অথবা কাপড় সিদ্ধের পাত্রের ভার সহিতে পারে। [খ] বয়লার (boiler) বা কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র। এই পাত্রটি যথেষ্ট মজবুত এবং তাপসহ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য ধাতব বয়লারই সর্বত্র ব্যবহার হয়। তাহার মধ্যে তামার বয়লারই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ উহা শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং দ্রুত জলে তাপ সঞ্চালিত করে। বাহিরে কালো পলেস্তারা লাগানো থাকিলে তাপবিচ্ছুরণ কম হয়, ফলে বহুক্ষণ তাপ ধরিয়া রাখিতে পারে; তাপের অপচয় হয় না। অবশ্য ভিতরের অংশ উজ্জ্বল থাকিবে; তাহাতে জলে দ্রুত তাপ সঞ্চালিত হইবে এবং জলটি তাড়াতাড়ি গরম হইবে। পিতল এবং লৌহপাত্রও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। তবে লৌহপাত্রের ভিতরে জিঙ্ক-এর পলেস্তারা থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে মরিচা ধরিবার ভয় থাকে না। বয়লারের নিম্নাংশে একটি ট্যাপ লাগানো থাকিবে। [গ] পাটা—কাপড় কাচিবার পাটা পাথর অথবা কাঠেরই হয়। ইহা দুই হইতে আড়াই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া, ঢেউখেলানো কাঠ বা পাথরের টুকরা। ইহার উপরিভাগ অসম বা উঁচু-নীচু হওয়ার জন্য ইহার উপর থুপিয়া অথবা আছড়াইয়া কাপড় কাচিলে কাপড়ের সকল অংশে সাবান-জল প্রবেশ করে। কাঁচের পাটাও পাওয়া যায়, তবে এগুলি হালকা সূক্ষ্ম পোশাক কাচার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাটার উপর দিক একটু উঁচুতে এবং তলার দিক অপেক্ষাকৃত নীচুতে (slanting way) রাখিয়া কাপড় কাচিতে সুবিধা হয়। [ঘ] বালতি, মগ, গামলা—কাপড় ভিজাইবার জন্য, সাবানের জলে কাপড় ডুবাইবার জন্য, জল লইবার জন্য এবং নীল মাড় দিবার জন্য এইগুলি প্রয়োজন হয়। [ঙ] কাঠের দণ্ড—দুইপ্রকার দণ্ড কাপড় কাচিবার জন্য প্রয়োজন হয়। বয়লারের মধ্যে যেগুলি ডোবানো থাকে সেইগুলি দেখিতে ইংরাজী T অক্ষরের মতো। এইগুলি হাণ্ডার ভিতর দেওয়া থাকিলে সাবান-জল উপচাইয়া পড়ে না। কাপড় পিটাইয়া কাচার জন্য একহাত লম্বা ও মাথার দিকটি চওড়া একপ্রকার কাঠের দণ্ড পাওয়া যায়। এ ছাড়া চিমটা এবং

কাঠের চামচ প্রয়োজন হয়। বেতের বা বাঁশের ঝুড়িও লাগে। বালতির উপর ঝুড়ি বসাইয়া চিমটা দিয়া বয়লার হইতে সিদ্ধ-করা কাপড় তোলা হয়। [চ] কাপড় কাচার সিঙ্ক—কলের মুখে বড় সিঙ্ক থাকিলে দাঁড়াইয়া কাপড় কাচার সুবিধা হয়। চীনামাটি অথবা সিমেন্টের সিঙ্কই উপযোগী। সিঙ্কের পরিবর্তে কোমর-সমান উঁচু সিমেন্টের গাঁথা চাতাল প্রস্তুত করিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। [ছ] রিঙ্গার (wringer) বা নিংড়াইবার যন্ত্র—কাচিবার পর চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া দিবার জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ইহা ওয়াশিং মেশিনের (washing machine) উপর লাগানো থাকে। একটি ১০ হইতে ১২·৫ সে. মি. চওড়া পাতের উপরে ২·৫ হইতে ৫ সে. মি. একটি মোটা গোল রোলার লাগানো থাকে। রোলারটি হাণ্ডেলের সাহায্যে ঘোরানো যায়। পাত ও রোলারের মাঝখান দিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া কাপড়টি টানিয়া লইলে জল চাপিয়া বাহির হইয়া যায়। পাত ও রোলারের মাঝের ফাঁকটি কমানো ও বাড়ানো যায় ; কাপড়টির মোটা বা পাতলা অনুযায়ী ইহা কমানো বা বাড়ানো হয়।

(৩) পরিশেষ-ক্রিয়ার (finishing) যন্ত্রপাতি—তিনটি কাজ এই স্তরে করা হয় : (ক) নীল মাড় দেওয়া, (খ) শুকানো, (গ) ইস্ত্রি করা। নীল মাড় দেওয়ার জন্য বালতি, গামলা, ছাঁকনি এবং সস্‌প্যান লাগে। শেষোক্তটিতে মাড় জ্বাল দেওয়া হয়।

শুকাইবার জন্য দুই প্রকার সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। ঘরের বাহিরে শুকাইবার জন্য তার, দড়ি বা বাঁশ ব্যবহার করা হয়। তার অথবা নারিকেল দড়ি অপেক্ষা প্লাস্টিকের দড়ি ভাল। ইহাতে মরিচা ধরে না। বাঁশ অপেক্ষা 'non-rusting metal'-এর মসৃণ বড় রড (rod) ভাল। ঘরের ভিতর শুকানোর জন্য দড়ি ছাড়াও আজকাল অন্যান্য বহু প্রকার জিনিস ব্যবহার হয় ; যেমন—চোঙ্গাকৃতি উঁচু ঝুড়ি উনুনের উপর উপুড় করিয়া কাপড় শুকানো হয়, কড়ি হইতে ঝুলানো বাঁশ, কাঠ বা দড়ির আলনাও পাওয়া যায়। এইগুলিতে অনেক কাপড় একসঙ্গে দিয়া শুকানো যায়।

ইস্ত্রি করার সরঞ্জাম—ইস্ত্রির টেবিল, ইস্ত্রি প্রভৃতি ইস্ত্রি করার জন্য প্রয়োজন হয়।

ইস্ত্রির টেবিল—লম্বা কাঠের টেবিলের উপর তুলার প্যাড লাগানো বিশেষ ধরনের টেবিল ইস্ত্রি করিবার জন্য পাওয়া যায়। সকল প্রকার পোশাক ইহার উপর ইস্ত্রি করিতে সুবিধা হয়। ইস্ত্রি-টেবিল না থাকিলে সাধারণ কাঠের টেবিলের উপর কম্বল বা চাদর পাতিয়াও ইস্ত্রি করা যায়।

ইস্ত্রি প্রধানতঃ দুইপ্রকারের হয়—(১) উনুনে গরম করা লোহার ইস্ত্রি এবং (২) ইলেকট্রিক ইস্ত্রি। উনুনে গরম করা ইস্ত্রি ছাড়াও আর-একপ্রকার লোহার ইস্ত্রি হয়। ঐ ইস্ত্রির ভিতর কাঠ-কয়লার জলন্ত আগুন রাখিয়া গরম করা হয়। উনুনে বার বার উহা গরম করিতে হয় না। এইগুলিকে বক্স ইস্ত্রি বলা হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে গরম করিয়া যাহার দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ ইস্ত্রি করা হয় তাহাই ইলেকট্রিক ইস্ত্রি।

বস্ত্রধৌতির আধুনিক যন্ত্রপাতি

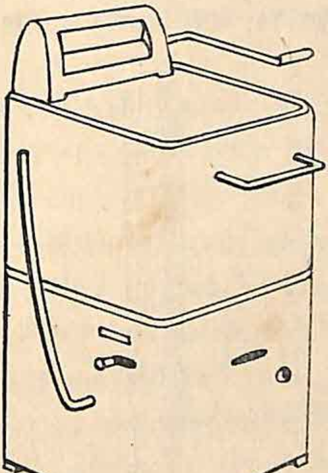
(Modern Laundry Equipments)

আজকাল অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গৃহকর্মের ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতির প্রচলন হইয়াছে। কাপড় কাচিবার জন্যও নানারূপ বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির ব্যবহার জানিলে গৃহিণীর অনেক শ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়।

বৈদ্যুতিক ধৌতি-যন্ত্র

ইলেকট্রিক ওয়াশিং মেশিন—কাপড় কাচার মেশিনের সাহায্যে অল্প সময় ও শ্রমে অনেকগুলি কাপড় একসঙ্গে কাচা যায়। কাপড় কাচার মেশিন বিদ্যুৎ-চালিত অথবা হস্ত-চালিত হইতে পারে। তবে হস্ত-চালিত অপেক্ষা বিদ্যুৎ-চালিত মেশিনই অধিক শ্রম ও সময় সংক্ষেপকারী। মরিচা পড়ে না এমন ধাতু দ্বারা মেশিনের আবরণটি প্রস্তুত। তা ছাড়া বাহিরের অংশ এনামেল করা থাকে বলিয়া উহা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কোনরূপ ময়লা বা মরিচা ধরে না। ভিতরের দিকে একটি গোলাকৃতি রবারের চাকতি বা ঘুরুন্তি থাকে। সেইটি ঘুরিলে সাবান-জল মথিত হয়। বিদ্যুৎ দ্বারা উহা চালিত হয়। মেশিনের মুখে একটি ঢাকনা থাকে এবং উপরে একটি নিঙড়াইবার যন্ত্র (wringer) লাগানো থাকে। যন্ত্রটির তলায় একটি ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে একটি রবারের নল লাগানো থাকে। ঐ ছিদ্রপথে নলের ভিতর দিয়া ময়লা জল বাহির হইয়া যায়। যন্ত্রটির ভিতর বৈদ্যুতিক উপাদান

(element) লাগানো থাকে। উহার সাহায্যেই জল গরম হয় এবং যন্ত্রটির রবারের ঘুরুন্তিটি ঘোরে। গায়ে একটি সুইচ থাকে, তাহা খুলিলে যন্ত্রটি চালু হয়।

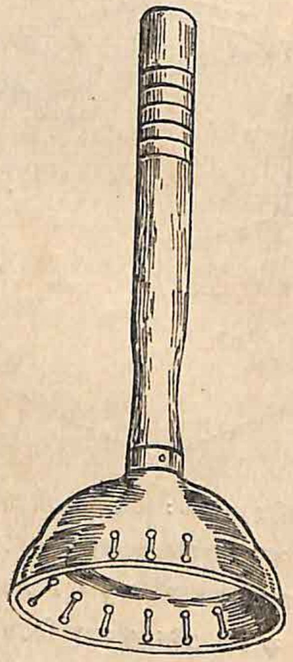


চিত্র নং—৫৪ : বৈদ্যুতিক ধৌতি-যন্ত্র

কাপড় কাচিবার সময় সাবান ও জল ভিতরে দিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ করিয়া প্রথমে সাবান-জল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তারপর ময়লা কাপড় দিয়া মুখের ঢাকা বন্ধ করিয়া সুইচ খুলিয়া দিতে হয়। চাকতিটি ঘুরিলে সাবান-জলের সহিত ময়লা কাপড়গুলি মাখামাখি হইয়া ঘুরিতে থাকে। ইহাতে কাপড়গুলি কাচা হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে ময়লা জল বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার জলে একই ভাবে কাপড়গুলি ধুইয়া নিঙরাইবার যন্ত্রের ভিতর দিয়া টানিয়া লইতে হয়। ধৌতি যন্ত্রের উপর ক্যালেণ্ডার লাগানো থাকিলে ইস্ত্রির কাজও হইয়া যায়। অবশ্য উহার প্লাগ স্বতন্ত্র থাকে। ঐ প্লাগে বিদ্যুৎ সংযোগ করিলে ক্যালেণ্ডারের লৌহ-পাত গরম হইয়া উঠে।

ভ্যাকুয়াম কোন্ ও বড় টব—কাপড় কাচার জন্য এই দুইটি যন্ত্রও ব্যবহার হয়। মরিচা ধরে না এমন ধাতু দ্বারা প্রস্তুত বিশেষ গঠনের একপ্রকার কাপড় কাচিবার টব প্রস্তুত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয়

'dolly tub'। সাবান-জলে ইহার মধ্যে কাপড়গুলি ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ভ্যাকুয়াম কোন্ (Vacuum Cone) চালাইয়া কাপড়গুলি কাচা হয়। 'ভ্যাকুয়াম কোন্' হইল কাপড় কাচিবার বায়ুশূন্য যন্ত্রটির নাম। ইহার নিম্নাংশ দেখিতে একটি বৃহৎ উপুড়-করা বাটির মতো। বাটিটির উপর একটি মোটা



চিত্র নং—৫৬ : বায়ুশূন্য যন্ত্র

ফাঁপা নল লাগানো থাকে। ঐ নলটির উপরের দিক বা মাথার দিক বন্ধ থাকে। বাটির সহিত নলটির যে অংশ যুক্ত থাকে সেই অংশ খোলা থাকে। বাটিটির ভিতরে চারিধার দিয়া কতকগুলি ভোঁতা হুক লাগানো থাকে। ফাঁপা নলটি বায়ুশূন্য করা থাকে বলিয়া ইহাকে 'ভ্যাকুয়াম কোন্' বলা হয়। টবের মধ্যে কাপড় দিয়া ইহার সাহায্যে থোপা হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা একসঙ্গে অনেকগুলি কাপড় কাচা যায়। তাহা ছাড়া ভ্যাকুয়াম কোন্-এর সাহায্যে যে কোন কাপড় কাচিলে কাপড় জখম হয় না।

বিদ্যুৎ-চালিত বয়লার—একসঙ্গে অধিক কাপড় ফুটাইবার জন্য বড় বিদ্যুৎ-চালিত বয়লার ব্যবহৃত হয়। ইহা মজবুত দুইটি ধাতব পাত দ্বারা

প্রস্তুত করা হয়। বাহিরের অংশ মোটা স্টিলের চাদর দিয়া তৈয়ারী আর ভিতরের বস্ত্রাধারটি তাম্রনির্মিত। বস্ত্রাধার আর উহার স্টিলের বহিরাবরণের মাঝখানে বয়লারের তলদেশে গ্যাস রিঙ অথবা ইলেকট্রিক এলিমেণ্ট থাকে। তাই উহা বাহির হইতে দেখা যায় না। বিদ্যুৎশক্তি বা গ্যাস পাইপের সহিত সংযুক্ত করিলে উহারা জ্বলিয়া উঠে। সেই উত্তাপে বয়লার গরম হয়।

আরও একপ্রকার বয়লার পাওয়া যায়। উহাতে গ্যাস রিঙ বা ইলেকট্রিক এলিমেণ্টের পরিবর্তে বয়লারের ভিতরে ঠিক মধ্যস্থলে একটি ধাতব-ফলক গ্রথিত থাকে। ইহাই 'হিটিং এলিমেণ্ট' (Heating element)। ইহা মোটা মজবুত লৌহজালিকা দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া পোশাকাদি উহার সংস্পর্শে আসিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ঐ এলিমেণ্টের তলদেশে বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করা থাকে। সুইচ খুলিয়া দিলেই বয়লার গরম হইতে আরম্ভ করে।

উভয় প্রকার বয়লারেই মাপ অনুযায়ী এলিমেণ্টের ওয়াটেজ স্থির হয়। যেমন—১০ গ্যালন জল ধরিবে এমন বয়লারে তিন কিলোওয়াটের হিটার লাগানো থাকে। উত্তাপ ইচ্ছামতো বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য বয়লারের গায়ে উত্তাপ-নিয়ন্ত্রক চাবি লাগানো থাকে। স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও এইগুলিতে করা থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার মধ্যে জল ঢালা না হইতেছে ততক্ষণ উহা চালু হয় না। সুইচের সহিত সংকেত-আলোরও ব্যবস্থা থাকে। বয়লার উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হইলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। আবার গরম হইয়া গেলে নিভিয়া যায়। সুইচ বন্ধ করিয়া তবেই বয়লার স্পর্শ করা উচিত। নচেৎ তড়িতাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বয়লারের গায়ে নিম্নাংশে জল বাহির করিবার জন্য ট্যাপ (tap) লাগানো থাকে।

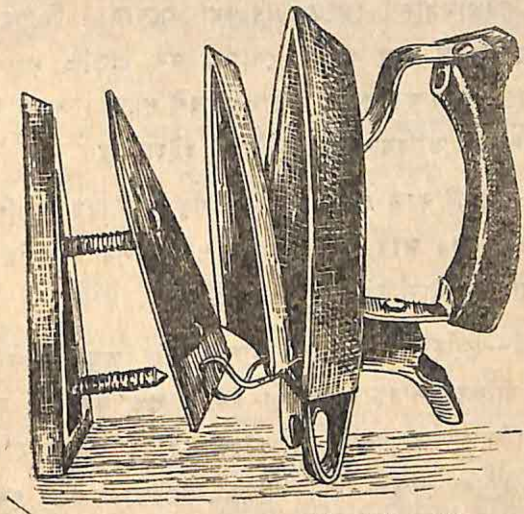
কাপড় শুকাইবার আলমারি বা Drying Cabinet—কাপড় শুকাইবার আলমারিটি স্টিলের প্রস্তুত একটি মজবুত ক্যাবিনেট বিশেষ। আলমারিটির বহিরাংশ অত্যন্ত মসৃণ। তাই উহা পরিষ্কার রাখা সহজ। আলমারিটির ভিতরের অংশ ইনসুলেটিং পদার্থ দ্বারা আবৃত। কাঠ, রবার, অভ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হইতে পারে না। তাই এই-গুলিকে ইনসুলেটর (insulator) বলে। এইরূপ কোন একটি পদার্থ

দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া সমগ্র আলমারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয় না। নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আলমারিটির তলদেশে ইলেকট্রিক হিটার থাকে। আলমারির মাপ অনুযায়ী হিটারের ওয়াটেজ স্থিরীকৃত হয়। সাধারণতঃ মাঝারি মাপের আলমারিতে ৬ কিলোওয়াটের হিটার থাকে। সকল আলমারিতেই দুইটি হিটার থাকে। উহার একটি সকল সময় জ্বলে। ইহা মাত্র ২৫০ ওয়াট-এর মতো। যন্ত্রের ভিতর বায়ু সঞ্চালনের জন্য ইহা সকল সময় চালু রাখিতে হয়। কাপড় শুকাইবার জন্য ন্যূনপক্ষে ৬০০ বা ততোধিক ওয়াটেজ প্রয়োজন হয়। ভিজা কাপড় ভিতরে দিয়া ঐ হিটার চালু করিতে হয়। ঐ হিটারটি এমনভাবে প্রস্তুত যে কাপড় শুকাইবার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময়ই মাত্র জ্বলে। কাপড় শুকাইয়া যাওয়ামাত্র উহা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আলমারিটির ভিতর ঝোলানো আলনা বা র‍্যাকের ব্যবস্থা থাকে। ভিজা কাপড়-জামা ভাঁজ করিয়া উহাতে ঝুলাইয়া আলমারির কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তারপর সুইচ খুলিয়া হিটার চালাইয়া দিতে হয়।

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি—পোশাক-পরিচ্ছদ ইস্ত্রি করিবার জন্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রিই সুবিধাজনক। ইহাতে মরিচা ধরে না; লোহার ইস্ত্রির মতো ইহা পরিষ্কার করিতে হয় না। তাছাড়া এইগুলিতে উত্তাপ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থাকে বলিয়া কাপড়-জামা পুড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না। এই সকল সুবিধার জন্যই আজকাল অধিকাংশ গৃহে স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ-চালিত ইস্ত্রির প্রচলন দেখা যায়।

ইলেকট্রিক ইস্ত্রির বহিরাংশে ক্রোমিয়াম বা নিকেল প্লেটিং করা থাকে। তাই ইহাতে মরিচা ধরে না। ইস্ত্রির সর্বনিম্নাংশ মোটা নিরেট স্টিলের পাত দিয়া প্রস্তুত। ইহাকে 'প্রেস প্লেট' বলা হয়। এই অংশের উপর চাপ দিয়াই ইস্ত্রি করা হয়। ইহার তলদেশ ক্রোমিয়াম প্লেটিং করা থাকে বলিয়া ইহা অত্যন্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল। ইস্ত্রিটির ভিতরে ঠিক স্টিল পাতটির উপরে প্রায় মধ্যস্থলে বৈদ্যুতিক এলিমেন্টটি (element) অবস্থিত। ইহা উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন দীর্ঘ সরু তার। সাধারণতঃ ইহা নাইক্রোম নামক মিশ্র ধাতু দ্বারা প্রস্তুত। নাইক্রোম নিকেল, ক্রোমিয়াম, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ধাতু হইতে প্রস্তুত। ইহা জড়াইয়া ত্রিকোণাকৃতি একটি অভ্রের ঢাকনার

মধ্যে রাখা হয়। নীচে এবং উপরে অভ্রের চাদর থাকে। এই ক্ষেত্রে অভ্র ইনসুলেটিং পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থা না করিলে সমস্ত ইস্ত্রির মধ্যেই তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হইত। কেহ উহা স্পর্শ করিলেই তড়িতাহত হইবার ভয় থাকিত। এলিমেণ্টের উপর আর-একখানি ভারী মোটা ধাতব পাত থাকে। ইহা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে—(১) এলিমেণ্টটিকে ইহা ঢাকিয়া রাখে এবং (২) ইস্ত্রিটির ওজন বৃদ্ধি করে। অনেক ইস্ত্রিতে ঐ



চিত্র নং—৫৭ : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির বিভিন্ন অংশ

পাতের উপর একখানি এসবেসটজের টুকরা লাগানো থাকে। ইহা থাকিলে ইস্ত্রির উপরের অংশ তাতিয়া উঠে না। দুইটি ছিদ্রপথে এলিমেণ্টের সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত থাকে। হাণ্ডেলের পশ্চাতে প্লাগ লাগাইবার যে স্ক্রু-আকৃতির গজাল দুইটি থাকে তাহার ভিতর ঐ তার দুইটি অবস্থিত। উপরে থাকে ইস্ত্রির ঢাকনা, ঢাকনার উপর একটি কাঠের হাণ্ডেল লাগানো থাকে। ঢাকনা বা কভারের উপর উত্তাপ-নির্দেশক মিটার লাগানো থাকে। হাণ্ডেলের নীচের দিকে সংকেত-আলোরও ব্যবস্থা থাকে। হ্যাণ্ডেলের পাশে বুড়ো আঙ্গুল রাখিবার জায়গা থাকে।

প্লাগ লাগাইয়া সুইচ খুলিয়া দিলে এলিমেণ্টের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চলিতে শুরু করে। আলোটি জ্বলিয়া উঠে। তাপ-নির্দেশক কাঁটাটি যতটুকু তাপ

নির্দেশ করে ততটুকু গরম হইবার পর আলো নিভিয়া যায়। তখন সুইচ বন্ধ করিয়া তবে ইস্ত্রি ব্যবহার করিতে হয়।

বস্ত্রধৌতির সাজ-সরঞ্জামগুলির যত্ন লওয়া
(Care of Laundry Equipments)

যে কোন জিনিসের প্রতি যত্ন না লইলে তাহা তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রধৌতির সরঞ্জামগুলির ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। বিশেষ করিয়া এই জিনিসগুলিতে সকল সময় সাবান, সোডা, জল প্রভৃতি লাগে, আগুনের সংস্পর্শে আসে, তাই ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকে। সতর্ক না হইলে বা যত্ন না লইলে দ্রুত ভাঙিয়া-চুরিয়া অকেজো হইয়া যায়।

উনুন—উনুনটি কাজ হইয়া যাইবার পর মাটি দিয়া লেপিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। ক্ষার জল উথলাইয়া পড়ে বলিয়া দাগ হয়। মাটি দিলে বা ঝিঁকে মাটি ধরাইলে উনুনটি বেশীদিন টিকে।

বয়লার—লৌহনির্মিত হইলে কাপড় সিদ্ধ অথবা জল গরম হইয়া যাওয়ামাত্র মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, শুষ্ক কাপড়ে মুছিয়া তেল মাখাইয়া রাখিতে হয়। তাহা না হইলে উহাতে মরিচা ধরিতে পারে। তামার পাত্র হইলে তেঁতুল দিয়া মাজিয়া, পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া রাখা উচিত। তাহা না হইলে কলঙ্ক পড়ে। বয়লার অথবা যে কোন হাঁড়ি বা কেটলিতে গরম জল ফুটাইলে পাত্রের তলায় কার্বনেট থিতাইয়া যায়। কাজ হইয়া যাওয়ামাত্র পাত্রটি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিলে পাত্রের তলায় কার্বনেটের স্তর জমিতে পারে না। কার্বনেটের স্তর জমিয়া কঠিন হইয়া গেলে বয়লার ফাটিয়া যাইতে পারে।

বালতি, গামলা, টব প্রভৃতি—ব্যবহারের পর এইগুলি সকল সময় ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। সাবানের বা সোডার সংস্পর্শে বহুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে পাত্রের ধাতু আক্রান্ত হইতে পারে। এই সকল কারণেই এনামেল বা আস্তরণ চটিয়া যায়। তাই কাজ হওয়ামাত্র ধুইয়া মুছিয়া উপুড় করিয়া রাখা উচিত। একমাত্র কাঠের টব শুকাইয়া রাখিলে ফাটিয়া বা বাঁকিয়া যাইতে পারে। এই জন্য কাঠের পাত্র ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া শীতল জল

ঢালিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। ব্যবহারের পূর্বে জল ফেলিয়া সাবান-জলে ধুইয়া লইলেই চলে। কাঠ বা প্লাস্টিক অথবা পলিথিনের পাত্র কখনও রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিতে নাই, তাহা হইলে ফাটিয়া যাইতে পারে।

ঝুড়ি, দড়ি, বাঁশ, কাপড়-আটকানো ক্লিপ—এইগুলির ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে ঝাড়িয়া-মুছিয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। ছোটখাটো চিমটা, চামচ প্রভৃতি সবগুলির ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। একমাত্র কাঠের জিনিসগুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়, আর লোহার জিনিসগুলি কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হয়।

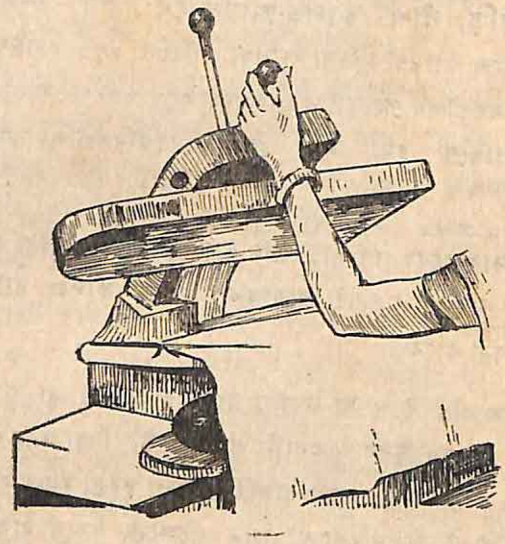
পাটা—ব্যবহারের পর পাটাখানি ছায়াতে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। অবশ্য তাহার পূর্বে ধুইয়া লওয়া প্রয়োজন। রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইস্ত্রি—লোহার ইস্ত্রি অতি যত্নে ব্যবহার করিতে না পারিলে মরিচা ধরিয়া যায়। উনুনের উপর একখানি পাতলা টিন দিয়া তবে ইস্ত্রি বসাইতে হয়। তাহা না হইলে ইস্ত্রির মসৃণ পাতটি আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই নষ্ট হয়। ইস্ত্রি করিবার পর সম্পূর্ণ শীতল হইলে কোন তৈলাক্ত পদার্থ মাখাইয়া বাক্সের (ইস্ত্রির বাক্স) ভিতর অথবা কাগজ জড়াইয়া রাখিতে হয়। গরম ইস্ত্রি রাখিলে ঘামিয়া মরিচা ধরে এবং খুলিয়া রাখিলে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা লোহ আক্রান্ত হয়। ইস্ত্রি করিবার পূর্বে মিহি ইঁটের গুঁড়া দিয়া ঘষিয়া অথবা ঘাসের উপর ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া লইয়া তবে ইস্ত্রি করা উচিত।

ইস্ত্রির টেবিল—ইস্ত্রি হইয়া যাইবার পর ঢাকিয়া রাখিতে হয়, টেবিল খোলা থাকিলে ময়লা হইয়া যায়।

শিশি-বোতল—দাগ তুলিবার জন্য যে সমস্ত রি-এজেন্ট (re-agent) শিশি-বোতলে ভরিয়া রাখা হয় সেগুলির গায়ে লেবেল লাগাইয়া নাম লিখিয়া রাখিতে হয়। কখনও ভিজা চামচ ডুবাইয়া কোন জিনিস তুলিতে নাই। ব্যবহারের পর ছিপি বা ঢাকনাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ করিতে হয়।

রিঙ্গার এবং ম্যাঙ্‌লার—ব্যবহারের পর ইহার স্ক্রুগুলি আলগা করিয়া ভেস্‌লিন দিয়া রাখিতে হয়। রোলারটি শুকনা করিয়া মুছিয়া কাপড় জড়াইয়া রাখিতে হয়।



চিত্র নং—৫৫ : ম্যাঙ্‌লার

ওয়াশিং মেশিন—ব্যবহারের পর ধুইয়া, শুকনা কাপড়ে মুছিয়া, কলকব্জায় ভেস্‌লিন দিয়া রাখিতে হয়।

ড্রাইং ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হয় যে বায়ুসঞ্চালনের জন্য ছোট হিটারটি জ্বলিতেছে কিনা।

অনুশীলনী

বস্ত্রধৌতির ঘর

Possible questions—বস্ত্রধৌতির ঘরের কি প্রয়োজন ? নকশার সাহায্যে একটি আদর্শ ধৌতাগারের সরঞ্জাম-বিন্যাস দেখাও।

উঃ সং—(১) ধৌতাগারের প্রয়োজন। (২) ধৌতাগারের বর্ণনা ও নকশা।

বস্ত্রধৌতির সরঞ্জাম ও তাহাদের যত্ন

E. ১৯৬০ (৬) বস্ত্রধৌতির জন্য যে সকল সরঞ্জাম প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। কেমন করিয়া উহাদের যত্ন লইবে?

উঃ সং—(১) বস্ত্রধৌতির সরঞ্জামের তালিকা। (২) উহাদের যত্ন।

E. ১৯৬৩ (৮) বস্ত্রধৌতির সরঞ্জামগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর। বল কেমন করিয়া উহাদের যত্ন লইবে। বস্ত্রধৌতির ক্ষেত্রে কেমন করিয়া শ্রম সংক্ষেপ করা যায়?

উঃ সং—(১) সরঞ্জাম তালিকা। (২) সরঞ্জামের যত্ন লওয়া। (৩) আধুনিক বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা।

E. ১৯৬৫ (৭) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—(গ) সাকশান ওয়াশার বা বায়ুশূন্য যন্ত্র।

উঃ সং—(১) গঠন, (২) ব্যবহার, (৩) সুবিধা।

E. ১৯৬৮ (৬) বস্ত্রধৌতির জন্য ধৌতাগারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির তালিকা দাও। কিভাবে ধৌতাগারে সরঞ্জাম সংরক্ষণ করিবে? ধৌতাগারের কাজে কি করিয়া শ্রম লাঘব করিবে?

উঃ সং—(১) সরঞ্জাম তালিকা। (২) ধৌতাগারে সরঞ্জাম বিন্যাসের বর্ণনা। (৩) আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

Nundy : ELEMENTS OF HOME SCIENCE — Bengali

(For Class IX)